প্রাচীন জরীপের ইতিহাস

এই লেখকের অন্য বই

ছোটদের জরীপ ও ভূমিরাজস্বের কাহিনী

আমিন পিয়ারীলাল (উপন্যাস)

প্রাচীন জরীপের ইতিহাস

অরুণকুমার মজুমদার

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

PUBLIC LIBRARY
SL/R.R.R.L.F. NO
MR. NO. (R.R.R.L.F./GEN) 16196

Prachin Jariper Itihas
by Arunkumar Majumdar

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : সত্যব্রত অধিকারী

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স । ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলিকাতা ৬

মূল্য : একশ টাকা

পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশে

প্রবন্ধসূচি

সেটেলমেণ্টের উৎস সন্ধানে : ১
বাংলায় মোগল জরীপের প্রথম কানুনগো এবং
পরবর্তী কানুনগোদের ইতিহাস : ১২
হিন্দু পুরাণে কলকাতা : ২৫
তুর্কী-আফগান যুগের জরীপ ও খারাজ ব্যবস্থা : ৩১
সম্রাট শেরশাহের আমলে জমি জরীপ ও
খারাজ ব্যবস্থা : ৫১
সম্রাট আকবরের যুগে জরীপ ও ভূমিব্যবস্থা : ৫৯
মুঘল আমলের তিন মজুমদার : ৭৩
সেই আশ্চর্য দলিলটি : ৭৯
ভারতবর্ষের প্রথম নদী জরীপ : ৮৭
লর্ড ক্লাইভের জমিদারি : ৯৫
খাড়ি : ১০২

প্রবন্ধসূচি

পঞ্চাননগ্রাম : ১০৮
সুন্দরবন : জরীপ প্রসঙ্গ : ১১২
কলকাতার প্রথম জরীপ : ১২২
আদিগঙ্গার আদিপথ : ১২৮
চৌরঙ্গী : ১৩৫
ভারতবর্ষে প্রথম বিমান-জরীপ : ১৪০
২৪ পরগনা জেলা জরীপ : ১৪৬
টালি সাহেবের নাম থেকে টালিগঞ্জ : ১৫৭
২৪ পরগনার পরগনা পরিচয় : ১৬২
কলকাতার অনেক নাম : ১৭৩
রাজা বানানো রাস্তা : ১৭৮
জরীপের শতবর্ষ : ১৮১
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভাঙাগড়ার ইতিহাস : ১৮৪

সেটেলমেণ্টের উৎস সন্ধানে

আজকাল যাত্রাগানের তেমন আর চল নেই, বিশেষ করে কলকাতার মতন শহরে। ছোটবেলায় আমরা দেশে যাত্রা শুনতাম, তখন মনে আছে, মুকুন্দ দাসের গান শুনেছি, সেটেলমেণ্টের গান…

'সেটেলমেণ্টের জরীপে
লোহার শিকলে মাপে,
দেশে দেশে আমিন আইল ভাই।
বাড়ীঘর, জমি যত
লেখে তারা অবিরত,
ছাগল ভেড়া তারও নিস্তার নাই॥' ইত্যাদি।

সে সময়ে গ্রাম্য জীবনে সেটেলমেণ্টের মতন এমন আলোড়ন আর কেউ আনতে পারত কিনা সন্দেহ। গ্রামে জরীপের তাঁবু পড়লেই গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা সাড়া পড়ে যেত।

জমিদার, তালুকদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ত। রায়ত, কোর্ফা প্রভৃতি প্রজারা ঘরের চালের মধ্যে গোঁজা বিবর্ণ দাখিলা-পরচা বার করে মুহুরীদের সন্ধান শুরু করত।

আর যারা চাকরিতে বিদেশে থাকত, ছুটি নিয়ে তারা এই সময়ে দেশে চলে আসত, যাতে করে তাদের জমিজমা ঠিকমতন রেকর্ড করা হয়।

এদিকে কানুনগোর তাঁবুর সামনে দেখা যেত তাঁর ঘোড়াটাকে ঘিরে আলোচনারত শিশুরা, অদূরে চিড়ে মুড়ি-মুড়কির দোকান, আর একটু দূরে জমিদারের বৈঠকখানায় টাকওয়ালা পেশকার, গুটকো যাঁচমুহুরিরা কর্মরত।

মাঠে মাঠে আমিনরা ব্যস্ত তাদের জমি মাপার কাজে। হাতে তাদের ম্যাপের চোঙা, পিওনের কাঁধে তিন পায়া টেবিল, দুদিকে

পেতলের হাতল দেয়া ২২ গজ লোহার গাণ্টার চেন, লোহার পিন এবং বাঁশ।

তবে এসব দৃশ্য এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। যেমন, কানুনগোর ঘোড়ার পরিবর্তে এসেছে সাইকেল। সেটেলমেণ্ট বিভাগে জীপগাড়ীর আমদানি হয়েছে। হাতি চড়ে শিশুচিত্তে আলোড়ন তুলে আর বড় বড় অফিসাররা আসেন না। বৈচিত্র্য অনেক কমে গেছে।

আধুনিক জরীপের জন্মকথা বলতে হলেই প্রথমেই মনে আসে পাঠান সম্রাট শেরশাহকে (১৫৪০—১৫৪৫ খ্রীঃ)। যিনি প্রথম জমির মাপের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর মাপের একক ছিল সিকন্দার লোদির গজ (এক গজ সমান ৩২ আঙ্গুল [digit] চওড়া)। জমি মাপা হত একটি দড়ির সাহায্যে, ৬০ গজ সমান ছিল এক জরিব (jarib) এবং ৩৬০০ বর্গগজে এক বিঘা হত।

তাছাড়া শেরশাহ প্রজাদের সুবিধার জন্য পাট্টা কবুলতি প্রথার সৃষ্টি করেছিলেন।

জমির উৎপন্ন ফসলের তিনি মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ফসল নিতেন। মাত্র পাঁচ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন, কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় তিনি যদি বারুদের আগুনে পুড়ে মারা না যেতেন, তাহলে ভারতবর্ষ হয়ত জরীপের আরো উন্নত নতুন নতুন পদ্ধতি পেতে পারত।

বঙ্গে পাঠান সাম্রাজ্যও একদিন শেষ হয়ে গেল। পাঠান সম্রাট দায়ুদ খাঁর ছিন্নমুণ্ডের উপর সম্রাট আকবর মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটালেন বাংলায় (১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে)। তাঁরই আদেশে হিন্দু সেনাপতি তোডরমল্ল বাংলা সুবাতে প্রথম রাজস্ব জরীপ করলেন ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে। এই জরীপের নাম হল 'আস্‌লি-জমা তুমহার' (Your original Rent roll.)। এই জরীপের বর্ণনা দিয়েছেন সম্রাটের মন্ত্রী আবুল ফজল তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীতে।

এই বইতে লেখা অনুসারে দেখা যায় তোডরমল্ল বাংলা সুবার

সমগ্র খালসা জমিকে (খালসা অর্থাৎ **Rent paying land as opposed to Jaigir or rent free land**) উনিশটি সরকারে এবং ৬৮২টি পরগনায় ভাগ করেছিলেন। আকবরশাহী মুদ্রায় বাংলায় খাজনা ধার্য হয়েছিল এক কোটি ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার উনসত্তর টাকা মাত্র।

'আইন-ই আকবরী' তখন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছে, তা সঠিক আজ বোঝার উপায় নেই। সে সময়ে মোগল যুগে মানচিত্র বা ম্যাপও তৈরি হোতনা।

আমাদের ২৪-পরগনা বলে কোন জেলার অস্তিত্বও ছিলনা তখন। তবে এই বইতে ১৮নং সাতগাঁও সরকারের (**Satgaon Sirkar**) যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে ইংরেজ আমলের ২৪-পরগনার ও কলকাতার কতকগুলি পরগনার হুবহু মিল আছে।

এই সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম সরকারের দেয় খাজনা ছিল তখন একচল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার একশত আঠারো আকবরশাহী মুদ্রা।

তোডরমল্লের বর্ণনা অনুসারে তখনকার দিনের পরগনা ও বর্তমান পরগনার তালিকা নিম্নরূপ :

তখনকার পরগনার নাম	বর্তমান পরগনার নাম
(১) মুকোওরা	মাগুরা।
(২) বালেয়া	বালিয়া।
(৩) বারমুধুট্টি	বারিদাহাটি।
(৪) হাভেলিশের	হাভেলি শহর।
(৫) কলিকাতা, মেকলে, বারবুকপুর ৩ মহল।	কলিকাতা।
(৬) আনোয়ারপুর	আনোয়ারপুর বা আমিরপুর।
(৭) আকবরপুর	আকবরপুর।
(৮) বালিগুা	বালগুা।

তখনকার পরগনার নাম	বর্তমান পরগনার নাম
(৯) খারের	খাড়ি।
(১০) মিছুইমুল	মেদনমল্ল।
(১১) মুদগাচা	মুড়াগাছা।
(১২) হায়াগুড়	হাতিয়াগড়।
(১৩) বাটুরিয়া	বুরন।
(১৪) পুরা	পুঁড়া [বসিরহাটের মহকুমার বর্তমানে একটি গ্রাম, বাদুড়িয়ার নিকট।]
(১৫) ঢালিপুর	ঢালিয়াপুর।
(১৬) মায়হাট্টি	মাইহাটি।

ইতিহাস থেমে থাকে না। আকবরশাহ চোখ বুজলেন, জাহাঙ্গীর এলেন। আগ্রাফোর্টের জাঁকজমকের মধ্যে জাহাঙ্গীর রাজত্ব করে গেলেন।

তারপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন শাহজাহান। তাঁর বিলাস-ব্যসনের কাহিনী সবাই জানেন। দিল্লিতে লালকেল্লা তৈরি হল, জগৎ-বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন সৃষ্টি হল, মমতাজের স্মৃতিতে গড়ে উঠল তাজমহল। রাজকোষ তখন শূন্যপ্রায়, অর্থ চাই।

সে সময়ে বাংলার সুবাদার হলেন শাহসুলতান সুজা, দিল্লীশ্বরের মধ্যম পুত্র। তিনি নতুন করে জরীপ করলেন বাংলাকে। বাংলা ভাগ হল চৌত্রিশটি সরকারে। রাজস্ব বৃদ্ধি হল চব্বিশ লক্ষ টাকার মতন।

মোগল আমলের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য জরীপ হয় বাংলায় মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে, ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে। তখন দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন মুহম্মদশাহ। সম্রাট নবাব নাজিমের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন কারণ তিনি অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নতুন করে বাংলা সুবার জরীপ হল, মাঠে আমিন ছুটল, কানুনগোরা রাজস্ব বিচার করল।

বাংলা সুবা ১৩টি চাকলায় (সরকার থেকে বড় এলাকা) এবং ১৬৬০টি পরগনায় (পরগনার আয়তন ছোট করা হল) ভাগ হল।

বাংলার দিল্লিতে দেয় খাজানা স্থির হল, এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টাশি হাজার একশত ছিয়াশি টাকা, অর্থাৎ ১২ লক্ষ টাকা বেশি। এই জরীপের নাম ছিল 'জমাই কামিল তুমহার' (Jamai kamil Tumhar)।

এর পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। নদীয়ায় পলাশীর যুদ্ধে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের এক সন্ধি হয়। মীরজাফর অহিফেনমুগ্ধ নেত্রে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সন্ধির তারিখ হল ঐ বৎসরেই ১৫ই জুলাই।*

সন্ধির ৯ ধারা মতে কলকাতার দক্ষিণে খাসপুর থেকে কুলপী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জঙ্গলময় ভূভাগ ইংরেজদের ভূভাগ বলে গণ্য হবে। ২০শে ডিসেম্বর ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে নবাবের ৩নং পরোয়ানা বের হল সন্ধিকে সমর্থন করে।†

---

* পলাশী যুদ্ধের পূর্বেই মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের এক গোপন সন্ধি হয়েছিল। গোপন সন্ধির তারিখ হল ৩রা জুন ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ। ঐ চুক্তিতে ইংরেজরা কলকাতার দক্ষিণের এক বিশাল এলাকা দাবি করেছিল।

† সন্ধির ভাষা নিম্নরূপ ছিল :

All the lands lying to the south of Calcutta, as far as Calpee, shall be under the Zamindary of the English Compony and all the officers of these parts shall be under their jurisdiction. The revenue to be paid by them in the same manner as the other Zemindars.

পরোয়ানায় লেখা হল ইংরেজদের ২৪টি মহাল দান করা হল, যেমন :

মুগরা (মাগুরা), খাসপুর, মদনমল্ল, এক্তিয়ারপুর, বুরজুটি, ঘুর (অংশ), করিজুড়ি (খাড়ি), দক্ষিণসাগর, কলিকাতা (অংশ) পাইকান (অংশ), মানপুর (অংশ), আমিরাবাদ (অংশ), আজিমাবাদ, মুরাগাছা, পেচাখালি, শাহপুর (অংশ), শাহনগর (অংশ), মহম্মদ—আমিরপুর, মেলাং মহল, হাতিঘর, মেদিয়া বা ময়দা, আকবরপুর (অংশ), বালিয়া (অংশ), বাসুন্দি (অংশ)।

প্রকৃতপক্ষে এই ২৪টি মহাল বা পরগনা থেকেই ২৪ পরগনা নামের উৎপত্তি।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে সন্ধির শর্ত অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে পরগনাগুলি জমিদারী হিসেবে পেলেন, তার সবগুলি পূর্ণ পরগনা নয়। কতগুলি পরগনার অংশ, কতগুলি মহাল। (যেমন মেলাং মহল হল মুন মহাল।* আর একটি জিনিস বলা দরকার যে ১৯৪৭'র বঙ্গ বিভাগের আগে ও পরে এই জেলার মোট পরগনার সংখ্যা ঐ সনদে উল্লিখিত পরগনার সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি।

হাণ্টার সাহেবের হিসেব মতে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে পাওয়া যায় ২৪-পরগনার নাম, যা থেকে ২৪-পরগনার নামকরণ হয়েছে. যেমন :

কলিকাতা / আকবরপুর / আমিরপুর / আজিমাবাদ / বালিয়া / বারিদাহাটি / বসনডহরি / দক্ষিণ সাগর / ঘোর / হাতিঘর / ইক্তিয়ারপুর / খেরিজুড়ি / খাসপুর / মেদনমল্ল / মাগুরা / মানপুর / মায়দা / মুরাগাছা / পাইকান / পিকুলি / সাতাল / শাহনগর / শাহপুর / উত্তর পরগনা।

১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের মাত্র দু' বছর পরে, দিল্লির

---

* পরগনার সঙ্গে মহালের তফাৎ হল, পরগনা হল রাজ্যশাসনের ক্ষুদ্র একক (administrative unit)। আর মহাল হল, খাজনা আদায়ের একক এলাকা (Revenue unit).

সম্রাট ক্লাইভকে ওমরাহ বা আমির বলে ঘোষণা করলেন। কারণ, তিনি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহআলমের বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করেছিলেন। ক্লাইভকে উপাধি দেয়া হল ছয়হাজারী পাঁচহাজারী মনসবদার এবং সেইসঙ্গে তিনি লাভ করেন এক জায়গীর। ইংরেজদের বিতাড়িত ছেলের জোর বরাত তখন।

এরপর ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহ শাহ-আলমের নিকট হতে দেওয়ানি লাভ করল। এরপর থেকেই ইংরেজ কোম্পানি জমি বিস্তারের দিকে মন দিল এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার কর্তৃত্ব তাদের হাতে চলে এলো।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রথমে ৫ বছর হিসেবে জমি বন্দোবস্ত দেয়া চলতে থাকল, পরে কোন কোন ক্ষেত্রে এক থেকে তিন বছরের মেয়াদেও বন্দোবস্ত দেয়া হল।

এই ব্যবস্থায় অসুবিধে হতে থাকায় ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত দশ-শালা বন্দোবস্তের সৃষ্টি হয় (**Decennial Settlement of 1789**)।

এ ব্যবস্থাও মনঃপূত না হওয়ায় কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (**Permanent Settlement**) প্রথার প্রবর্তন করলেন। ইংরেজ রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে এদেশের ভূমিব্যবস্থা চলেছিল। এর ফলে দেশে নতুন নতুন জমিদারের সৃষ্টি হল; প্রজাদের কাছ থেকে সরকার দূরে সরে গেলেন। ইংরেজ জমিদার ও দিশি জমিদারদের রমরমা হল কিন্তু প্রজারা উচ্ছন্নে যেতে বসল। ১৭৬৪—৬৬ খ্রীস্টাব্দে রেনেল সাহেব (**James Rennel**) নদীপথসমূহের গতিপথ সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে অনেকগুলি মানচিত্র তৈরি করেন। এতে করে ইংরেজদের গমনাগমনের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধে হয় কিন্তু একে রাজস্ব জরীপ (**Revenue Survey**) বলা চলে না।

এ সময়ে কালেক্টররা একটা রাজস্ব জরীপের প্রয়োজন তীব্রভাবে

অনুভব করতে থাকেন, কারণ তৌজীর (estate) সীমানা সম্পর্কে যে তথ্য কোম্পানির কাছে ছিল তা অত্যন্ত অশুদ্ধ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমির মানচিত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল দেশে। কারণ, রায়তরা সমানে জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষ করে চলেছে, আর জমিদাররা (ওটা তাদের তৌজী বলে) প্রজাদের কাছ হতে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করে নিচ্ছে, অথচ ঐ জমি হয়ত সেই জমিদারের তৌজীর মধ্যেই পড়ে না।

আরও একটা অসুবিধে হতে থাকল বাকি রাজস্বের দায়ে যে তৌজী নিলামে উঠল এবং সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন তার দখল নিলেন, তখন সরজমিনে গিয়ে তারা ঠিকমতন ঐ তৌজী চিনতে পারেন না। কারণ, মানচিত্র তো নেই।

সুতরাং রাজস্ব জরীপ করা স্থির হল তাতে গ্রামের ও তৌজীর মানচিত্র থাকবে।

অবিভক্ত বাংলাদেশে প্রথম রাজস্ব জরীপ করেন লেফটেনান্ট মরিসন সাহেব মেদিনীপুর জেলার হিজলীতে, ১৮৩৮—১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। ২৪-পরগনার রাজস্ব জরীপ হয়েছিল ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে। কর্নেল স্মিথ ছিলেন রেভিনু সার্ভেয়ার। তাঁর রাজস্ব জরীপ শেষ হয়েছিল ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে।

সমস্ত জেলাগুলির রাজস্ব জরীপ পর পর করা হয়। এই রাজস্ব জরীপ শেষ হল হাওড়া হুগলি জেলায় ১৮৬৯—১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে, রেভিনু সার্ভেয়ার ছিলেন W. T. Stewart এবং N. T Davey. মেদিনীপুরে রাজস্ব জরীপের কাজ করেন উইলকিনসন সাহেব ১৮৭২—১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এ মানচিত্রের স্কেল ছিল মানচিত্রের ১ ইঞ্চি, সমান জমির ৪ মাইল।

২৪-পরগনার কথাই আবার শুরু করা যাক। এই জরীপে কর্নেল স্মিথ মানচিত্রে তৌজীগুলির সীমানা এবং মৌজার সীমানা অঙ্কন

করলেন কিন্তু প্রতি গ্রামের প্লটের চেহারা সে মানচিত্রে উঠল না।

২৪-পরগনা জেলায় এর কিছু পূর্বে একটি জরীপ হয়েছিল (সব জেলাতেই হয়েছিল), তার নাম হল 'থাক্ সার্ভে' (Thak Survey)। এই জরীপের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতি গ্রাম এবং তৌজীর সীমানা চিহ্নিত কবা, যাতে রাজস্ব জরীপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

এজন্য প্রতি গ্রামের সীমানার বাঁকে এবং কোণে মাটির স্তূপ বা থাক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল বলেই এইরকম নামকরণ করা হয়। এই সময়ে জমির যে বিবরণ প্রস্তুত হয়েছিল তার নাম হয় 'রোয়েদাদ'। পরবর্তীকালে রাজস্ব জরীপে এগুলি খুব কাজে লাগে। কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়াল ইংরেজদের ৩ কোটি টাকা।

জমিদাররা আবার এই জমি বিলি করে দেন পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মধ্যে—অজস্র মধ্যস্বত্বাধিকারীর মাধ্যমে, বাংলার চাষীদের ঘাড়ে খাজনা চাপে ১৬ কোটি টাকা। জমিদারদের এই নির্মম শোষণ, তার উপর নায়েব গোমস্তাদের অকথ্য অত্যাচারে বাংলার রায়ত শ্রেণীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলল।

এই সময় দেশে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীদের আন্দোলন শুরু হতে থাকে এবং ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে সরকার রেণ্ট অ্যাক্ট (Rent Act) নামক একটি আইন প্রজাদের অনুকূলে পাশ করেন।

কিন্তু এই আইনেও খুব সুবিধে না হওয়ায় অবশেষে সরকার বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে (Bengal Tenancy Act 1885) পাশ করলেন।

এই সময় সেটলমেণ্ট বিভাগ স্থাপিত হয় বাংলাদেশে; প্রথম ডিরেক্টর হন মিঃ এম্ ফিনুকেন (M. Finucane) ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। এই সময়কার অফিসের ঠিকানা রাইটার্স বিল্ডিংস এবং অফিসের নাম

ছিল Directorate of Land Records and Agriculture। এই সময় থেকেই বাংলার জরীপ বিভাগের জন্মবর্ষ ধরা হয়ে থাকে।

বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে (B. T. Act) স্থির করা হল প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হলে তাদের হাতে তাদের জমির পরচা এবং তাদের জমি-জমার একটি ম্যাপ দেয়া খুব প্রয়োজন আছে।* এই চিন্তাধারার ফলে একের পর এক শুরু হল জেলাজরীপ (District Settlements) সমূহ।

প্রায় সব জেলা-জরীপেই সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন ইংরেজ।

এই জরীপ শুরু হয় চট্টগ্রাম জেলা দিয়ে (১৮৮৮—১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে)। সার্ভেয়ার ছিলেন (O' Sullivan) ও' সুলিভন্। শেষ হয়েছিল হাওড়া ও হুগলির জেলা জরীপ দিয়ে (১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে)।

এই জরীপগুলি প্রধানত ইংরেজদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এবং এর মানচিত্র ও খতিয়ান খুব বিশুদ্ধ মানের হওয়ায় অবিভক্ত বাংলার প্রজাদের এর তথ্যাদি খুব উপকারে এসেছিল।

এরপর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে ডিরেক্টর সাকচীর (F. A. Sachse) বদলির পরে জেমসন সাহেবের (A. K. Jameson) অধীনে ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডসের অফিস মহাকরণ থেকে আলিপুর নবনির্মিত সার্ভে বিল্ডিং-এ স্থানান্তরিত হয় (Vide Annual report of Survey and Settlement dept. 1922-23)।

চব্বিশ পরগনায় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে যে জেলা জরীপ হয়েছিল, সেই জরীপই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জরীপ।

এ অপারেশান শুরু করেন খুলনার তদানীন্তন সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এল. আর. ফকাস (L. R. Fawcus) আর শেষ করেন মিঃ বি. ই. জে. বার্জ সাহেব (B. E. J. Burge)।

---

* প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ আকারে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে শুরু হয় বাখরগঞ্জ জেলায় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে।

এই বার্জ সাহেবই পরে মেদিনীপুরে জেলাশাসক থাকাকালীন স্বদেশীদের হাতে নিহত হন।

বঙ্গ বিভাগের দৌলতে ২৪-পরগনার আয়তন কিছু বেড়েছে—যশোর জেলার বনগাঁ, গাইঘাটা থানা যুক্ত হওয়ায়। আবার ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে বনগাঁ থেকে বাগদা নামে একটি পৃথক থানা গঠিত হয়েছিল।* বঙ্গ বিভাগের পরে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে যে জরীপ চলেছিল তাতে জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদ সাধিত হয়েছে (**West Bengal Estate Acquisition Act 1953, [Act I of 1954]**)। সরকারের সঙ্গে আবার রায়ত ও অন্যান্য প্রজাদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটেছে।

কালক্রমে পরগনার মতন তৌজীরও হয়ত আর অস্তিত্ব থাকছে না।

সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ২৪-পরগনা জেলার বিশেষ একটা গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এখানকার জমিদারী লাভই হল ইংরেজদের ভারতে প্রথম লক্ষ্মী লাভ। এখান থেকেই তারা ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষের মানচিত্রকে লাল করে ফেলে।

এই জেলার জরীপের কথা বলতে হলে সুন্দরবন জরীপের কথাও মনে আসে। মনে আসে, লেফটেনাণ্ট মরিসন সাহেব আর প্রিন্সেপ্ সাহেবের গল্প ; কেমন করে একদা তাঁরা বাঘ আর সর্পসংকুল সুন্দরবন জরীপ করেছিলেন।

---

* Vide Notification no. 9486 Jur dt. 27. 9. 47 Published in Calcutta Gazette dt. 9. 10. 1947. Part I, Page 219. Inclusion of area comprised in the P. S. Gaighata & Bangaon.

And Notification no. 568 PL/P-4-P-18/48 dt. 18/2/52 a seperate Police station was form be namely Bagdah out of Bangaon Ps.

বাংলায় মোগল জরীপের প্রথম কানুনগো এবং পরবর্তী কানুনগোদের ইতিহাস

ইতিহাস বলে, মোগল সম্রাট আকবর তাঁর পিতা হুমায়ুনের পাঠান শত্রুদের কবল থেকে ভারত সাম্রাজ্য উদ্ধার করে মোগল সাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আকবর অভ্যন্তরীণ উন্নতির কাজেও মনোনিবেশ করেছিলেন।

পাঠান সম্রাট শেরশাহ প্রবর্তিত জমি জরীপ পদ্ধতি তিনি ব্যাপক অনুসরণ করে ভারতবর্ষের সমস্ত জমিকে ১২টি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। সুবাগুলি আবার অনেকগুলি সরকার ও পরগনায় বিভক্ত করে যান।

সম্রাটের রাজস্ব মন্ত্রী (দেওয়ান) ছিলেন তাঁর নবরত্নের এক রতন, মহারাজ তোডরমল্ল।

তোডরমল্ল বাংলাকে ১৯টি সরকারে ভাগ করেছিলেন। সরকার অনেকটা বর্তমান জেলার মতন ভূভাগ। এই উনিশটি সরকার আবার ৬৮২টি পরগনায় বিভক্ত করা হয়েছিল। এটি হয়েছিল ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে। আগের অধ্যায়ে লেখা হয়েছে, বাংলা দিল্লীকে রাজস্ব দিত ১,০৬,৯৩,০৬৯ সিক্কা টাকা, সিক্কা অর্থ বাদশাহের নামাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা।

এই জরীপের নাম ছিল, 'আস্‌লি-জমা তুমহার' (Your original Rent roll)। এর পরবর্তীকালে যতগুলি জরীপ হয়েছিল, এই আস্‌লি-জমা তুমহার-কে Standard ভিত্তি হিসেবে ধরেই ভাঙা-চোরা পরিবর্তন ইত্যাদি করা হয়েছে। এ সময়ে, মোগল সাম্রাজ্যের ভূমিব্যবস্থা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল। যেমন :

(১) সম্রাটের অধীন খালসা জমি বা খাসমহল (Crown land)।

(২) জমিদারদের অধীনস্থ জমি (Territory under Zeminder)।

(৩) জায়গীরদারদের অধীন জমি (Area held under Jaigirdars)।

খালসা জমির মালিকরা খালসা সেরিস্তা বা ট্রেজারিতে সরাসরি সরকারী খাজনা জমা দিতেন।

জায়গীরদাররা তাদের জমিদারী ভোগ করতেন পরিবর্তে তারা সম্রাটের প্রয়োজনে সৈন্যসামন্ত প্রভৃতি দিয়ে সম্রাটকে সাহায্য করতেন।

বাংলায় খালসা জমির খাজনার পরিমাণ ছিল, ফার্মিঙ্গারের পঞ্চম রিপোর্ট অনুযায়ী ৬৩,৪৪,২৬০ সিক্কা টাকা। ফার্মিঙ্গার বলেছেন, জায়গীরের খাজানা ছিল ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা।

দিল্লিকে মোট বাংলার দেয় রাজস্ব হল :

	টাকা
খালসা জমি	৬৩,৪৪.২৬০
জায়গীর জমি	৪৩,৪৮,৮৯২
	১,০৬,৯৩,১৫২

আমাদের পূর্বতন হিসাব থেকে ৮৩ টাকা বেশী।

সাধারণত পরগনাগুলির রাজস্ব বিষয়ক শাসনকার্য চালাতেন 'চৌধুরী' বা জমিদাররা।

জমিদারদের নিয়ামক (controller) ছিলেন কানুনগো। কানুনগো প্রত্যেক গ্রামে একজন করে পাটোয়ারীর (village accountant) সাহায্যে পরগনার হিসেব, খাজনা ধার্যর বিঘা প্রতি হার, পরগনার জরীব পরিচালনা করতেন। তাছাড়া কানুনগো রায়ত বা চাষীদের অধিকারের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন, যাতে করে জমিদাররা অধিক শোষণ করে রায়তদের ধ্বংসের পথে না ঠেলে দেয়।

এর ফলে চাষীদের অবস্থা বিষয়ে সম্রাটের সরাসরি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেত।*

সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু রাজস্ব আদায়ের জন্য তোডরমল্ল সমস্ত সাম্রাজ্যে ১২টি সুবাতে মোট ১০জন কানুনগো নিযুক্ত করেছিলেন।

এখানে বলা হয়তো প্রয়োজন, 'কানুনগো' কথাটি আরবী 'কানুন' অর্থাৎ আইন এবং ফার্সী 'গোয়' অর্থাৎ 'কহনে-আলা' এই দুটি কথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

এক কথায় এর অর্থ হল, আইনকানুনে অভিজ্ঞ রাজস্ব কর্মচারী।

সম্রাট আকবর বাংলা সুবাতে যে কানুনগোকে প্রথম নিযুক্ত করেছিলেন, তার নাম হল ভগবান মিত্র। তাঁর বাড়ি ছিল গৌড়ে

---

* এই নিয়ম চলত যেখানে সম্রাট রাজস্ব গল্লাবক্স (উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ আদায় হত) বা জাবতি (জরিবী প্রথায় বিঘা প্রতি ফসলের ফলনের হার বার করে তার নগদ মূল্যে রাজস্ব নেয়া হত) নিয়ম চালু ছিল। এই সমস্ত প্রদেশের প্রত্যেক পরগনাতে একজন করে কানুনগো থাকতেন, তাঁরা তাদের কাজের জন্য পরগনায় রাজস্বের এক শতাংশ কমিশন পেতেন। কানুনগোরা ছিলেন পাটোয়ারীদের অফিসার। সম্রাট আকবর পরে তাদের বেতন মাসিক ২০—২৫ টাকা হারে করে দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে সংসার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাদের কিছু জমিজমাও দেয়া হত।

এই সমস্ত এলাকায় জমি বিলি হত রায়তি প্রথায়, (Ryotary System) কিন্তু বাংলায় যে নিয়মে সম্রাট রাজস্ব আদায় করতেন, তার নাম ছিল 'নসক্' নিয়মে।

এখানে জমি মাপা হত না, মুকোদ্দম প্রয়োজন ছিল না, পাটোয়ারীও লাগত না, বারো বছরের জমির খাজনাকে গড় করে অর্থাৎ ১২ দিয়ে ভাগ করে জমির খাজনা স্থির হত। বাংলায় চালু ছিল জমিদারি প্রথায় জমি বন্দোবস্ত (Zemindary system of land settlement)।

অর্থাৎ বর্তমান মালদা জেলার রোকনপুর পরগনায়। এই রোকনপুর পরগণাতেই ছিল কানুনগোর জমিদারী। ভগবান মিত্ররা ছিলেন উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ।

তিনিই ছিলেন বাংলা সুবার প্রথম ভাগ্যবান কানুনগো, ক্ষমতায় তিনি ছিলেন বর্তমান ডাইরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডসের সমতুল্য। তিনিই ছিলেন সুবাতে মোগল সম্রাটের রাজস্ব হিসেবের প্রতিনিধি।

বাৎসরিক খাজনা হিসেবের কাগজে প্রাদেশিক শাসনকর্তার দস্তখতের সঙ্গে কানুনগোর সই না থাকলে রাজস্ব দিল্লীতে গৃহীত হত না। সুতরাং কানুনগোকে খুশি রাখতে সুবাদার বা নবাব নাজিমরা নানাভাবে চেষ্টা করতেন।

কানুনগোকে নিয়োগ করতেন বাদশাহ স্বয়ং এক ফার্মানের সাহায্যে, অবশ্য রাজস্বমন্ত্রীর বা দেওয়ানের পরামর্শক্রমে।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তিনি ভগবান মিত্রকে বঙ্গাধিকারী উপাধি দিয়ে বাংলা সুবার কানুনগোর পদে নিযুক্ত করেন।

ফার্মানে একটি কথা লেখা ছিল যে ভগবান মিত্রের মৃত্যু হলে তার ছোট ভাই বঙ্গবিনোদ মিত্র পরবর্তী কানুনগো নিযুক্ত হবেন।

ভগবান মিত্রের মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই বঙ্গবিনোদ সমগ্র বাংলা সুবার কানুনগো নির্বাচিত হলেন। বঙ্গবিনোদ বহুবছর কানুনগো থাকার গৌরব অর্জন করেছিলেন। অনেকে বলেন, 'বঙ্গাধিকারী' উপাধি বঙ্গ-বিনোদের সময়েই অর্জিত।

একটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো যে, পরবর্তীকালে দিল্লীর বাদশাহর কাছ থেকে কানুনগোর নিয়োগপত্র বা ফারমান আনতে কানুনগোর উত্তরাধিকারীদের অনেক টাকা নজরানা দিতে হত বাদশাহকে।

বঙ্গবিনোদ মিত্র কানুনগো নিযুক্ত হবার পরে বাংলা সুবার আয় তিনি বৃদ্ধি করেছিলেন, ফলে দিল্লিশ্বরের রাজস্বও অনেক বেড়ে যায়।

বাদশাহ এতে খুশি হয়ে বঙ্গবিনোদকে 'রায়' উপাধি এবং 'বঙ্গাধিকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন। শোনা যায়, বঙ্গবিনোদ কানুনগো সেরেস্তা এবং প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন মালদা জেলার শিবগঞ্জের কাছে পুখুরিয়া গ্রামে। সেখানে তিনি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবিনোদ রায়ের বাড়ি ভিটা ও মন্দিরের ভগ্নস্তূপ পুখুরিয়া গ্রামে এখনও আছে। তবে সিদ্ধেশ্বরী মূর্তিটি নাকি বর্তমানে কাশীতে অবস্থান করছে।

বঙ্গবিনোদ রায় বহু বছর বেঁচে ছিলেন এবং বাংলার রাজস্ব ব্যাপারে তিনি খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৬১২ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫—১৬২৭ খ্রীস্টাব্দ) বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কারণ, সেই সময় মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত ঐ সব অঞ্চলে এবং সুন্দরবনে খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঢাকা থেকে ঐ সকল বিদ্রোহ দমন করা খুবই সুবিধেজনক ছিল।

সে সময়ে বাংলার সুবাদার ছিলেন ইসলাম খাঁ (১৬০৮—১৬১৩)। বলাবাহুল্য রাজধানী ঢাকাতে স্থানান্তরিত হওয়াতে বঙ্গবিনোদও তাঁর দপ্তর ঢাকাতে স্থানান্তরিত করেন। ঢাকায় কানুনগো যে এলাকায় থাকতেন সে মৌজার নাম ছিল গেদা-হাভেলি।

সম্রাট শাহজাহানের সময় (১৬২৭—১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দ) বাংলার যে জরীপ হয়েছিল বাংলার শাসনকর্তা তখন ছিলেন শাহ সুজা।

সে সময়ে বাংলা ভাগ হয়েছিল ৩৪ সরকারে এবং রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছিল ২৪ লক্ষ টাকার মতন। এই জরীপের সময় সম্ভবত বঙ্গবিনোদ বেঁচে ছিলেন। বঙ্গবিনোদের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো (মতান্তরে ভাগনে) হরিনারায়ণ মিত্র হয়েছিলেন বাংলার কানুনগো।

১০৯০ হিজরী বা ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আওরংজীব (১৬৫৮—১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ) এক ফারমানে তাকে বঙ্গাধিকারী এবং বাংলার

কানুনগো নিযুক্ত করেন। হরিনারায়ণ সম্ভবত ছিলেন ভগবান মিত্রের পুত্র এবং বঙ্গবিনোদ অপুত্রক থাকায় তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন। কিন্তু হরিনারায়ণ কানুনগো অফিসের ষোলো আনা মালিকানা পাননি। তিনি পেয়েছিলেন অর্ধেক (আট আনা) অংশের মালিকানা।

মালদার ডিসট্রিক্ট সেটলমেণ্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বাকি অর্ধেকের মালিক হয়েছিলেন কানুনগো দর্পনারায়ণ। কিন্তু আসলে বাকি অর্ধেক পেয়েছিলেন ভট্টবাটি (মুর্শিদাবাদ) কানুনগো বংশের দৈবকীনন্দন।

ইনি ছিলেন কান্দীর (মুর্শিদাবাদ) সিংহ বংশের লোক এবং রাজা রঘুনাথ রায় কানুনগোর দৌহিত্র। কানুনগো বঙ্গবিনোদ মারা যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার ছোটভাই রঘুনাথ দিল্লিতে এক আর্জি (Arz-dasht) পাঠিয়ে কানুনগোর ফার্মান আনিয়েছিলেন।

কিন্তু হরিনারায়ণ দিল্লিতে তার দাবি জানালে হরিনারায়ণ কানুনগো অফিসের আট আনা অংশের মালিক হন। রঘুনাথের স্থলে তার দৌহিত্র দৈবকীনন্দন বাকি আট আনা অংশের মালিক হয়েছিলেন।

এরপর কানুনগো অফিসের ভাগাভাগি (**Jurisdiction**) নিয়ে বিবাদ বাধলে বাংলার তৎকালীন সুবাদার মধ্যস্থতা করে ঠিক করে দেন কানুনগো অফিসের দশ আনা অংশের মালিক হবেন রাজা হরিনারায়ণ আর বাকি ছ' আনা অংশের মালিক হবেন দৈবকীনন্দনের পুত্র রামজীবন।

দৈবকীনন্দন কানুনগোগিরি করেননি বলে তার পুত্র রামজীবনকে সকলে ছ'আনি তরফের প্রথম কানুনগো হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর বাদশা আওরংজীব (১৬৫৮—১৭০৭ খ্রীঃ) হরিনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণকে কানুনগো নিযুক্ত করে বাদশাহী ফার্মান পাঠান।

বাদশা দর্পনারায়ণকে মহারাজা উপাধিও দিয়েছিলেন। তিনি

ছিলেন বাংলার বড় কানুনগো।

বঙ্গাধিকারী কানুনগোদের দুই ধারার কথা বলার পূর্বে একটা কথা বলার হয়তো প্রয়োজন আছে, সেটি হল কানুনগোদের আয় কি ছিল এবং কিভাবে তাঁরা তাঁদের সেরেস্তা বা অফিস চালাতেন?

কিভাবেই বা তাঁরা তাঁদের অধীন কর্মচারীদের যেমন আমিন, মুহুরি. পেস্কার প্রভৃতিদের মাইনেপত্তর দিতেন।

এ ব্যাপারে তথ্য হল, বঙ্গাধিকারী কানুনগোদের বাদশা ফার্মানের সঙ্গে একটি জমিদারী দিতেন, তার থেকে তাদের সংসার চলত। তাছাড়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার তিন সুবার মোট রাজস্বের উপর শতকরা আট আনা পরিমাণ অর্থ নবাব কানুনগোকে দিতেন অফিস চালানোর জন্য। একে বলা হত 'রসুম' বা 'দস্তুর' অথবা 'নানকর'। এই রসুম ছিল কানুনগোদের মস্ত আয়। আগেই বলা হয়েছে কানুনগোর কাজ ছিল জমিদারীর খাজনা ধার্য করা, নতুন জমি বিলি বন্দোবস্তে সাহায্য করা এবং বিবাদ ইত্যাদিতে ফয়সালা করা ইত্যাদি। সব কিছুই করা হত সম্রাট আকবরের জরীপ আসলি জমা তুমারের ভিত্তিতে।

বাদশাহ আওরংজীবের রাজত্বের সময় মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং পরে তিনি ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নাজিম (Nazim) হন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী নবাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। আজিমুশ্বানই ছিলেন বাংলার শেষ রাজপ্রতিনিধি (Viceroy)।

এই সময় থেকে দিল্লির বাদশাহর ক্ষমতা কমতে থাকে এবং বাংলার নবাব নাজিমরা অনেকটা স্বাধীনভাবেই দেশ চালনা করতে থাকেন। তাঁদের বংশধররা নবাবের ওয়ারিশ হবেন এটাও একরকম ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু দিল্লিতে রাজস্ব ঠিকমতন পাঠাতেই হতো এবং নবাব নিয়োগে বাদশাহর ফরমানেরও প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর সময়ে রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদে

নিয়ে এলেন। রাজধানী বুড়িগঙ্গার তীর থেকে গঙ্গার তীরে স্থাপিত হল।

বলা বাহুল্য, এই সময়ে দুই কানুনগো দর্পনারায়ণ এবং জয়নারায়ণও নবাবের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। দর্পনারায়ণ মুর্শিদাবাদের নদীর অপর পাড়ে ডাহাপাড়ায় (ঢাকা পাড়া) তাদের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। অপর তরফ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন ডাহাপাড়ার দক্ষিণ-পুবে ভট্টবাটিতে।

আমরা আগেই বলেছি, মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে যে জরীপটি হয়েছিল তার নাম হল 'জমাই কামিল তুমার'। এ সময়ে কানুনগোদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সরকার বা জেলাগুলির নাম হল চাকলা (Chakla)। বাংলাকে তিনি ১৩টি চাকলা এবং ১৬৬০টি পরগনাতে ভাগ করেছিলেন। হুগলি বা সপ্তগ্রাম হল ৫নং চাকলা।*

* জমাই কামিল তুমহার জরীপের চিত্র (১৭২২ খ্রীস্টাব্দ)।

সুবা	চাকলা	পরগণা	রাজস্ব
উড়িষ্যা	বালেশ্বর	১৭	১০৮৮৭৬
"	হিজলী	৩৫	৪১৮৫৮৯
বাঙ্গলা	মুর্শিদাবাদ	১১৮	২৯৯৯১২৬
	বর্ধমান	৬১	২২৪৪৮১২
	সপ্তগ্রাম/হুগলি	১১৩	১৫৩৯০০৩
	ভূষণা	১১৫	৬৭৮৫৭৮
	যশোহর	৭৯	৩৫৩২৬৬
	আকবরনগর	১১৮	৯২৬২৬৬
	ঘোড়াঘাট	৪৫১	২১৮০৪১৫
	কড়াই বাড়ী	২৫	২০২৭০৫
	জাহাঙ্গীরনগর	২৩৬	১৯২৮২৯৪
	শ্রীহট্ট	১৪৮	৫৩১৪৫৫
	ইসলামাবাদ	১৪৪	১৭৬৭২৫
	মোট ১৬৬০ পরগণা		১,৪২,৮৮,১৮০ টাকা

বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বাদশাহ কানুনগো দর্পনারায়ণের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তাছাড়া যেহেতু কানুনগোকে নিয়োগপত্র ('ফরমান') দিতেন বাদশাহ, সেজন্য দর্পনারায়ণ বাংলার নবাবকে খুব একটা পরোয়াও করতেন না।

আর একটা কথা মুর্শিদকুলী খাঁ তার জরীপের সময় জমিদারদের উপর অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ায় দর্পনারায়ণ নবাবের উপর প্রীত ছিলেন না।

তাছাড়া নবাব ঠিকমতন 'রসুমের' টাকা বড় কানুনগোকে না দেওয়ায় বিরোধ ঘনীভূত হল।

মুর্শিদকুলী খাঁ যখন দিল্লিতে রাজস্ব প্রেরণের জন্য নিকাশী কাগজে দর্পনারায়ণের সই চাইলেন, এতে দর্পনারায়ণ সই করলেন না। এই বিবাদের ফল শেষপর্যন্ত দর্পনারায়ণের পক্ষে ভাল হয়নি, পরিণতিতে তিনি কূটবুদ্ধিতে নবাবের কাছে হেরে যান এবং কারারুদ্ধ হয়ে মারা যান। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ নিকাশী কাগজে ছোট তরফের কানুনগো জয়নারায়ণের দস্তখত দিয়ে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন এবং তা গৃহীতও হয়েছিল।

এইরকম মর্মান্তিক অবস্থায় দর্পনারায়ণের গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটে।

দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তার ছেলে শিবনারায়ণ ১১৩৭ হিজরী বা ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ মুহম্মদ শাহর রাজত্বকালে বাংলার কানুনগোর পদ পান এবং তিনি রসুমের দশ আনা অংশের মালিক হয়েছিলেন। তাঁর জমিদারী ছিল রুকুনপুর, ভুলুয়া, সরসাবাদ, সন্দ্বীপ প্রভৃতি পরগনায়। তাঁর জমিদারীতে তিনি কালীপুজার প্রবর্তন করেন এবং এজন্য প্রচুর খরচও করতেন।

সম্রাট আলীবর্দীর রাজত্বকালে (১৭৪[illegible] খ্রীস্টাব্দ) শিবনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ বঙ্গাধিকা[illegible] উপাধি বাদশা[illegible] দ্বিতীয়

90759
25.8.99

আলমগীরের কাছ থেকে পান (১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ) এবং বড় কানুনগোর পদের জন্য ফরমান লাভ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণও বৃহৎ এক জমিদারীর মালিক ছিলেন। শোনা যায়, তিনি তাঁর জমিদারীর প্রত্যেক মৌজা থেকে দশজন করে ব্রাহ্মণকে ডাহাপাড়া প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে এনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়েছিলেন। পলাশী যুদ্ধের আগে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার যে সন্ধি হয়েছিল সেই সন্ধির তারিখ ছিল জুন ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ। সেই সন্ধিপত্রে প্রথম কানুনগো লক্ষ্মীনারায়ণ ও দ্বিতীয় কানুনগো মহেন্দ্রনারায়ণের স্বাক্ষর ছিল। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পলাশী যুদ্ধের সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লিতে ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এবং মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ই মুঘল যুগে বাংলার দুই শেষ কানুনগো।

এর পর থেকেই ইংরেজ রাজত্বের শুরু, সেইসঙ্গে বঙ্গাধিকারী মহারাজ উপাধিধারী কানুনগোদের গৌরব রবি অস্তমিত হতে শুরু করল।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কান্দীর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে তাঁর ডাহাপাড়ার কানুনগো সেরেস্তায় কানুনগোর কাজ শেখান। শুধু তাই নয় তিনি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে তাঁর নাবালক ছেলে সূর্যনারায়ণের ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের চেষ্টায় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ডেপুটি কানুনগো বা নায়েব কানুনগো পর্যন্ত হয়েছিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ খুবই অসৎপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পরে তিনি বঙ্গাধিকারীদের সেরেস্তার বহু দলিলপত্র সরিয়ে ফেলেন। তাছাড়া বঙ্গাধিকারীদের অনেকগুলি জমিদারী নিজের নামে বন্দোবস্ত করে নেন।

গঙ্গাগোবিন্দ অনুরূপভাবে তার জেঠা গৌরাঙ্গ সিংহের সাহায্যে ছোট তরফের সেরেস্তা থেকে বহু দলিলপত্র নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ সিংহ ছিল ছোট কানুনগোদের ভট্টবাটির সেরেস্তার একজন পূজারি। এই দলিলপত্র সরানোর জন্য গঙ্গাগোবিন্দ বাংলার জমিদারী এবং জমিজমা প্রভৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

এতে করে পরবর্তীকালে তিনি ইংরেজদের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ক্ষমতা হাতে পেয়ে বঙ্গাধিকারী বংশের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিলেন। সূর্যনারায়ণ সাবালক হয়ে বুঝতে পারলেন যে তাঁর কোন ক্ষমতা নেই এবং অধিকাংশ জমিদারী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হস্তগত করায় আয়ও তেমন নেই। তিনি তখন উপায় না দেখে ইংরেজদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন।

ইংরেজ কোম্পানি তাঁকে মাসিক ১৪০০ টাকা পেনশন মঞ্জুর করে দেন।

সূর্যনারায়ণের পুত্র চন্দ্রনারায়ণের কালে এই কানুনগো বংশের চরম অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। এক বিবাদকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর শেষ পর্যন্ত চন্দ্রনারায়ণের পেনশন বন্ধ করে দেন।

চন্দ্রনারায়ণ রায় নিজেও খুব বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। শোনা যায়, তিনি নাকি ৬ বার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর দুই ছেলে ছিল—ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ও যোগেন্দ্রনারায়ণ। এরপর দুই পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা বাধলে বড় তরফ কানুনগো বংশের সবটুকু গৌরব ও বিত্ত নিঃশেষ হয়ে যায়।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণের ছেলে প্রতাপনারায়ণকে ইংরেজ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার সাবরেজিস্ট্রার করে দিয়েছিলেন। নিয়তির কি করুণ পরিহাস!

প্রতাপের ছেলে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের কোন সন্তান ছিল না, তাই তাঁর মৃত্যুর পর ভগবান মিত্রের কানুনগো বংশের অবসান ঘটল॥

ছোট তরফের কানুনগোদের বিষয়েও এখানে কিছু আলোচনা করার আছে।

সম্রাট আওরংজীবের রাজত্বের সময় থেকে ছোট তরফ বাংলার জরীপে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তাঁরা ছিলেন ছ'-আনা অংশের মালিক।

তাঁরাও রাজা উপাধি পেয়েছিলেন এবং বৃহৎ জমিদারীর মালিক ছিলেন। ভট্টবাটিতে আজও অনেকে তাঁদের বাড়ির ভিতে অতুল ঐশ্বর্য পোঁতা আছে মনে করে বাড়ির ভিত খুঁজে দেখেন মোহর বা সিক্কা রজতমুদ্রার খোঁজ পাওয়া যায় কিনা।

আগেই বলা হয়েছে, এই সেরেস্তার ছ'আনার মালিক প্রথম হয়েছিলেন রামজীবন। তাঁর মৃত্যুর পরে ছোট কানুনগো হয়েছিলেন তাঁর ছোট ভাই বঙ্গনাথ ভগবান রায়। ভগবান রায়ের প্রপৌত্র ছিলেন ছোট কানুনগো জয়নারায়ণ রায়। তিনিই মুর্শিদকুলী খাঁর সময় ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ চলে আসেন এবং ভট্টবাটিতে তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। 'রসুমের' তিনি পেতেন ছ'আনা অংশ। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হল, মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর উপর খুবই প্রসন্ন ছিলেন।

জয়নারায়ণ মারা যাবার পর তাঁর ছেলে মহেন্দ্রনারায়ণ ছোট কানুনগোর পদ লাভ করেন। নবাব আলিবর্দীর আমলে তিনি কানুনগো হন, এবং লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েও তিনি কাজ করেছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ভট্টবাটি কানুনগো সেরেস্তার কাগজপত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁর জেঠা গৌরাঙ্গ সিংহের সাহায্যে সরিয়ে ফেলেছিলেন।

মহেন্দ্রনারায়ণের পরে তাঁর ভাই ধর্মনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ কানুনগোর পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে কানুনগো বঙ্গাধিকারীদের সর্বময় কর্তৃত্বের অবসান ঘটল।

এই হোল বাংলার কানুনগোদের বংশ-ইতিহাস। ইংরেজ রাজত্বের পরবর্তীকালে রেভিন্যু সার্ভে বা জেলা জরীপ অথবা রিভিশনাল জরীপে যে সমস্ত কানুনগো নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা সাধারণ বেতনভুক, সাধারণ সরকারি কর্মচারী মাত্র ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁদের মাইনে-পত্র খুবই শোচনীয় ছিল।

শোনা যায়, গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কানুনগো সাহেবদের বেতন ছিল মাসিক ৮ টাকা থেকে ১২ টাকার মধ্যে। এ নিয়ে নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর আইনসভায় তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, যেখানে আমার কোচওয়ানের মাসিক মাইনে ১৪ টাকা, সেখানে একজন কানুনগোর মাইনে ৮ টাকা হলে দেশে দুর্নীতিই বাড়বে মাত্র। ঘটনাটি অত্যন্ত মজার এবং কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই।

পরে অবশ্য যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মাইনে অনেক বেড়েছে, জমি জরীপের প্রথা, নিয়মকানুন সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। অনেক কানুনগো বাংলাদেশে (অখণ্ড) নিযুক্ত হয়েছেন সত্য, কিন্তু প্রথম কানুনগো হিসেবে ভগবান মিত্র যে সম্মান পেয়েছিলেন তা আর কেউই হয়তো পাবেন না।

হিন্দু পুরাণে কলকাতা

আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, হিন্দু পুরাণে কলকাতার জন্ম-ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে। আমরা কলকাতার ইতিহাস খুঁজতে আড়াই শ কি বড়জোর তিনশ বছরের ওপারে যেতে রাজি নই। অথচ কলকাতার এর চেয়েও প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। যেদিন কলকাতা সমুদ্র থেকে জন্ম নিল, সেদিন কোথায় ছিল মোগল-পাঠান, কোথায় ছিল ইংরেজ-পর্তুগীজ, আর কোথায়ই-বা ছিল আজকের আলোকোজ্জ্বল সৌধমালা।

অথচ পুরাণের কাহিনী বলে একদম আজগুবি ভেবে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই, কারণ এর পেছনে বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থন রয়েছে। হিন্দু পুরাণের অন্যান্য কাহিনীর মত এর রূপককে আমরা গল্প বলে ধরে নিয়ে অবিশ্বাসী চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছি, কারণ ইংরেজি শিক্ষার শুরু থেকে পুরাণকে আমরা পুরাণের বেশি মর্যাদা দিতে রাজি নই। এর মধ্যে যে আমাদের ইতিহাস লুকিয়ে থাকতে পারে এটাও ভাবিনি।

হিন্দু পুরাণে মিলিত দেবদৈত্যের সমুদ্রমন্থনের কাহিনী আমরা পড়েছি, পড়েছি দেবতাদের অমৃত লাভের গল্প আর শিবের বিষপান। ব্যস, ঐ পর্যন্তই, ওর ভিতরে কি আছে তা জানবার সময় আমাদের নেই। অথচ ষোড়শ শতাব্দীতেও বাংলা দেশে প্রচলিত প্রবাদ ছিল, সমুদ্রমন্থন ও কলকাতার জন্মগ্রহণের ইতিহাস। সেই শতকের কবি, কবিরামের 'দিগ্বিজয় প্রকাশে' কলকাতার সমুদ্রগর্ভ থেকে সৃষ্টি সুন্দর-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই বইতে বলা হয়েছে: "দেবদৈত্যদের সমুদ্র-মন্থনের মহাদিনে কূর্মের (কচ্ছপ) পিঠে মন্দার পর্বত ও অনন্ত কর্তৃক ভয়ানকভাবে চাপ দেওয়াতে কূর্ম দৈত্যদের বিমূঢ় করবার উদ্দেশ্যে বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এর ফলে 'কিলকিলা' নামে বিশাল এক

দেশের সৃষ্টি হল। যতদূর কূর্মের শ্বাস প্রবাহিত হল, ততদূর হল এই দেশের বিস্তৃতি।"

পৌরাণিক গল্পের তাৎপর্য হয়ত এই, সে যুগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির স্থান পরিবর্তনের ফলে বিরাট ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। তার ফলে সমুদ্রমধ্যস্থ কতকগুলি পর্বতমালা সমুদ্রে ডুবে যায়, আবার কোন কোন স্থান সমুদ্র থেকে দিয়ারা হয়ে জেগে ওঠে। এই মহা আলোড়নের দিনে সমুদ্রগর্ভ ফেটে যায় এবং তার মধ্য দিয়ে প্রবল বেগে গ্যাস উদ্গীর্ণ হয়ে সমুদ্রের জল মহাপ্লাবনের রূপ নেয়। এই বর্ণনায় সে সময়কার ভূমিকম্পে দৈত্য বা অনার্যরা কেমন হতবাক হয়ে যায় এবং এ এলাকায় আর্যদের বসতি স্থাপন শুরু হয়, তারও সুন্দর ইঙ্গিতটুকু পাওয়া যায়। বর্ণনায় বলা হয়েছে এই মন্থনে যে ভূমি আত্মপ্রকাশ করল, তার নাম 'কিলকিলা' প্রদেশ এবং এর আয়তন হল একুশ যোজন বা ১৬০ বর্গমাইল। কিলকিলা দেশের সীমানা হল পশ্চিমে সরস্বতী নদী, পূর্বে যমুনা। এই এলাকার মধ্যেই কালক্রমে জন্ম হল হুগলী, বাঁশবেড়িয়া ভাটপাড়া, খড়দা, শিবাদহ, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম। অর্থাৎ আইন-ই-আকবরী বর্ণিত প্রায় সাঁতগাঁও সরকার।

কবিরাম তখনকার জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করে এ কাহিনী লিখলেও এ কাহিনী প্রচলিত, আসলে বহু যুগের ওপার থেকে। কিন্তু সে সময়টা বা সনটা কবে? তখনকার দিনের পুরাণ বা ভূগোলবেত্তারা কোন রচনায় সে কথার নজির রেখে যাননি। কিন্তু গত শতকে ১৮৩৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে একটি অনুসন্ধান কমিটি ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকায় অনেকগুলি গর্ত করে মাটির ধরন ধারণ পরীক্ষা করেন। এ সমস্ত খননকার্যের মধ্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের ৪৬০ ফুট গভীর খননের পরীক্ষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে দেখা গেছে (১) সমস্ত গর্তটির মধ্যে কোনখানে পলিমাটির কোন চিহ্ন নেই; (২) ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০—৩৫ ফুট, আবার ৩৮২—৩৯৫ ফুট নিম্নে গলিত উদ্ভিদের অংশ

দেখা গেছে ; (৩) আবার ১৭০—১৮০ ফুট এবং ৩২০—৩২৫ ফুট নিম্নে সমুদ্রকূলের ন্যায় বালি এবং উপল পাওয়া গেছে। এ সমস্ত পাথরের অধিকাংশই হল সমুদ্রজাত পাথর।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল ব্ল্যানফোর্ডের ম্যানুয়েলের ৩৯৭—৪০০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে। যাই হোক, এই পরীক্ষার ফলে আমরা জানতে পারি 'কিলকিলা' প্রদেশ ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে মাটির উপর ছিল না, আমরা পরিস্কার কল্পনাচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, মহা-সমুদ্রের বুকে একদল পর্বতশ্রেণী বিরাট ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেল ! নতুন স্থান সূর্যালোকে মাথা তুলে উঠল। তারপর এই এলাকার উপর দিয়ে ক্রমাগত পলি পড়ে চলল, গাছ জন্মাল, পাখিরা এল, কালক্রমে মানুষের বসতি স্থাপিত হল।

পৌরাণিক কাহিনী এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মধ্যে যে ফারাকটুকু আছে, সেটুকু দূর করেছে মিঃ ফার্গুসানের বিবরণে। সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করে এইটুকু বললে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ফার্গু-সান সাহেব বললেন, "চার হাজার বছর পূর্বে রাজমহল পর্যন্ত সমুদ্র ছিল। সমুদ্রের ঢেউ, সুন্দরবনের কাছাকাছি কোন নিমজ্জিত শৈলমালায় বাধা-প্রাপ্ত হয়ে দিয়ারা সৃষ্টি শুরু করল। কলকাতার কাছাকাছি সমুদ্রের কোন কোন তলদেশ মাটি হয়ে আকাশ দেখল আবার কেউ ডুবে গেল। শুধু সুন্দরবন এবং কলকাতা নয়, খুলনা, যশোহর পর্যন্ত এই মাটি আর সমুদ্রের খেলায় মাত্র সপ্তম শতাব্দীতে জেগে উঠেছে। ফার্গুসান সাহেব স্থানের নাম থেকে প্রমাণ করেছেন যে, এ স্থানগুলি পূর্বে সমুদ্র থেকে দ্বীপ হয়ে উঠেছে। যেমন নদীয়া বা নবদ্বীপ, চতুর্দিকে সমুদ্রের মধ্যে এ এলাকায় প্রথম দ্বীপ। নদীয়ার একটু আগে অগ্রদ্বীপ, শুক সাগর বা শুকিয়ে যাওয়া সাগর। আরও নীচে চাকদা বা চক্রদ্বীপ (চাকার মতন), খড়দা বা খড়গদ্বীপ ইত্যাদি। তেমনি গঙ্গার তীরেও সমস্ত স্থানগুলি সমুদ্রগর্ভ থেকে দ্বীপের মতন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জেগে উঠেছিল, যেমন

প্রাচীন জরীপের ইতিহাস

আড়িয়াদহ বা আর্যদ্বীপ, হালিশহর (নতুন শহর), বরানগর বা বরাহ পরিপূর্ণ স্থান, শিয়ালদহ বা শৃগাল দ্বীপ। এই সমস্ত স্থানগুলিই মহা-সাগরের বুকে প্রথম জেগে ওঠা দ্বীপ এবং এই দ্বীপগুলিতে সভ্য মানুষ বসবাস শুরু করে।

বিজ্ঞানের রায় মানতে হলে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান কলকাতা সমুদ্রের মধ্যে ছিল এবং এখানে ভাসমান কতকগুলি পাহাড় ছিল। এ পাহাড়গুলিতে প্রতিহত হয়ে সমুদ্রের ঢেউ পলি ফেলে চলল। কোন স্থান নেমে গেল, কোন স্থান ডুবল, তার সঙ্গে ভূমিকম্পের ক্রিয়া চলল। মাত্র সপ্তম শতাব্দীতে যশোহর, খুলনা সহ কলকাতা এবং সুন্দরবন দ্বীপ হিসেবে জেগে উঠতে শুরু করেছিল। চার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে রাজমহল পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল।

হিউয়েনসাঙ যখন ভারতে পরিভ্রমণ করেন, তখন বাংলাকে তিনি চার ভাগে বিভক্ত দেখেন। উত্তরে পুণ্ড্র, উত্তরপূর্বে কামরূপ, পূর্বে সমতট এবং দক্ষিণপূর্বে তাম্রলিপ্ত। এই ভাগগুলি থেকে দেখা যায় যে, সমতট এবং তাম্রলিপ্তের মধ্যে কোন ভূভাগের নামই তিনি করেননি। এটাই ছিল তখনকার সভ্য মানুষশূন্য সুন্দরবন এবং 'কিলকিলা' প্রদেশ। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরও যাঁরা চান, তাঁরা ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘাঁটতে পারেন।

পুরাণের আর একটি বিয়োগান্ত নাটকের মধ্য দিয়ে কলকাতার খ্যাতির কারণ আমরা জেনেছি। দক্ষের যজ্ঞে সকল দেবতারই নিমন্ত্রণ হল, হল না শুধু জামাতা মহাদেবের। এ অপমান সহ্য করতে না পেরে সতী করলেন দেহত্যাগ। সতীর মৃত্যু শ্রবণে ক্রুদ্ধ মহাদেব উন্মাদ হয়ে যজ্ঞ পণ্ড করলেন। তারপর প্রিয়তমার মৃতদেহ নিয়ে প্রলয় নৃত্য শুরু করলেন। সৃষ্টি যায় যায়। তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে মৃতদেহ একান্নটি খণ্ডে ভাগ করে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে দিলেন। যেখানে যেখানে তারা পড়ল, সেইখানেই একটি পীঠস্থানে পরিণত হল।

পীঠমালা নামে সংস্কৃত কবিতায় এই স্থানগুলির বর্ণনা আছে। এই পীঠ-স্থানগুলির মধ্যে কলকাতা একটি। কলকাতায় পড়েছিল সতীর ডান পায়ের অংশ। এখানকার প্রাচীন নাম ছিল কালীক্ষেত্র, এই কালীক্ষেত্র থেকেই কলকাতার নামের রূপান্তর।

নিগমকল্প পীঠমালায় কালীক্ষেত্রের আয়তন বলা হয়েছে দুই যোজন বা ১৬ বর্গমাইল, বহুলা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পবিত্র ভূভাগ। গঙ্গার তীরে একটি ত্রিভুজাকৃতি পরিমাপ। অনেকে বলেন, কলকাতার চেহারা —সতীর পায়ের পাতার মতনই দেখতে। কারণ, সতীর ডান পায়ের অংশ এখানে পড়েছিল। সেকথা এখন থাক। এই ত্রিভুজ কালীক্ষেত্রের তিন শীর্ষবিন্দুতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেবতার মন্দির ছিল। কালী মন্দির এর অভ্যন্তরে থাকলেও কালিকাদেবীর খ্যাতি কিন্তু ইতিহাসের মতে খুব বেশীদিনের নয়। নবম শতকে আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে আমদানী করেছিলেন তাঁদের ছাপ্পান্নটি সন্তানকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে জমি দিয়ে বসান হয়েছিল। সে সমস্ত স্থানের মধ্যে কলকাতার বর্ণনা নেই। মনে হয়, কলকাতা তখন পর্যন্ত মনুষ্যবাসের অযোগ্য ছিল। দ্বাদশ শতকে বল্লালসেনের যুগের পূর্বে নিম্নবঙ্গে তান্ত্রিক মতের প্রসার হয়নি। তান্ত্রিক মত পরে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও প্রচলিত হয়। সে যুগের মন্ত্রী হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' গ্রন্থ থেকে কালী-পূজার জনপ্রিয়তার বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। কালীঘাটের প্রাচীন সনদ এবং কাগজপত্র থেকেও এমন কিছু প্রমাণিত হয় না যে, কালীঘাট হিন্দু যুগে সৃষ্টি হয়েছিল। এর থেকে মনে হয় কালীঘাটের জনপ্রিয়তা শুরু হয়েছিল মুসলমান যুগে।

ইতিহাসের নির্মম রায়ে কলকাতা দ্বাদশ শতকের কিছু পূর্বে মনুষ্য-বাসযোগ্য হয়েছে এবং অনার্য দেবতা কালী থেকে কালীক্ষেত্র বা কলকাতা নামের উৎপত্তি। বল্লালসেনের সময় পর্যন্ত কালী সাধারণ-ভাবে পূজিত হননি, কালী ছিলেন অনার্য দেবতা। তাই এখানে সাপ,

বাঘ, শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম পরিবেশে কলকাতার ঘনদুর্গম অরণ্যে সল্ট লেক, আদি গঙ্গা এবং হুগলীর ত্রিভুজ বেষ্টনীর মধ্যে আদিবাসী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, জেলে, দুলিয়া, বাগদি, কাঠুরে প্রভৃতি দ্বারা আহূত হয়ে কালী নবাগত এক অতিথির মত এসে উপস্থিত হন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, রক্তলোভাতুরা, নরমুণ্ডমালিনী, বিকশিতজিহ্বা হয়ে রণরঙ্গে, শ্বেত আর্য সভ্যতাকে পদদলিত করে উন্মাদিনীর মত হাসছেন। এর পূর্বে ভারতবর্ষের কোথাও কালীপূজা প্রচলিত হয়েছিল বলে কেউ দেখাতে পারেন কিনা সন্দেহ। মনে হয়, এই কলকাতাই কালীর প্রথম আবির্ভাবস্থান এবং এখান থেকেই কালী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং আর্য সভ্যতায় স্থান পেয়েছেন। কলকাতার গৌরব তাই শুধু ভারতের বৃহত্তম নগরী বলে এবং ইংরেজদের ভাগ্য সহায়ক বলে নয়, কলকাতার মহিমা কালীর গৌরব প্রচারে, কালীর আর্য সভ্যতা কর্তৃক স্বীকৃতির পীঠস্থান বলে।

তুর্কী-আফগান যুগের জরীপ ও খারাজ ব্যবস্থা

[১২০৬—১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ]

সুজলা সুফলা ভারতবর্ষের ধন ঐশ্বর্য বা সম্রাট বাদশাহদের রাজত্বের জৌলুসের পিছনে রয়েছে ভারতীয় রায়ত বা কৃষকদের অকুণ্ঠ অবদান। কারণ, হিন্দু বা মুসলমান যুগে রাজ্যের প্রধান আয়ই ছিল খারাজ বা ভূমিরাজস্ব।

কৃষকরা গ্রামের নিভৃত অঞ্চলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যে ফসল ভূমিতে ফলিয়েছে, তার অংশ থেকে গ্রামের পাটোয়ারী, মুকোদ্দম, কানুনগো থেকে শুরু করে দিল্লির সম্রাট বা বাদশাহরা ঐশ্বর্যবান হয়েছেন, শুধু চাষীরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও জরীপের ইতিহাসও তাই বহু-বিচিত্র এবং আলোচনার যোগ্য।

১১৯৯ খ্রীস্টাব্দের তঁরাইয়ের দ্বিতীয় যুদ্ধে তুর্কী সেনাপতি মুহম্মদ ঘুরির পরাজয়ের পরে হিন্দুস্তানে মুসলমান যুগের সূচনা হয়। ঐতি-হাসিকরা বলেন, এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে মধ্যযুগের আরম্ভ অর্থাৎ মুসলমান যুগই হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগ (Mediaeval Period)।

তঁরাইয়ের যুদ্ধের কিছুদিন পরেই মুহম্মদ ঘুরি একজন উপজাতীয় যুবকের ছুরিকাঘাতে নিহত হলে, মুহম্মদ ঘুরির সেনাপতি তুর্কী বীর কুতুবুদ্দিন আইবক্ দিল্লির প্রথম মুসলমান সম্রাট হয়ে বসলেন।

বন্যার সময়ে বাঁধভাঙা জল যেমন সহজেই মাঠঘাট, গ্রাম, রাস্তা ইত্যাদি প্লাবিত করে ফেলে, তেমনি পৃথ্বীরাজের পতনের পরে মুসলমান শক্তির প্লাবন ভারতবর্ষের বিরাট এক অংশ সহজেই দখল করে নিল।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে শাসকশ্রেণীর পরিবর্তন হলেও,

অসংখ্য গ্রামে-গঞ্জে ভারতবর্ষের দুর্গম থেকে দুর্গমতম পল্লীঅঞ্চলে হিন্দু-যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো বা রীতিনীতির তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটেনি, অথবা ঘটা সম্ভব ছিল না।

সে যুগের গ্রামগুলি ছিল সাধারণত স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি গ্রামে বিচারব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা এবং ভূমিরাজস্ব ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত ছিল। গ্রামে গ্রামে জমি জরীপ ও বন্দোবস্তেরও (**Survey & Settlement**) যুগোপযোগী ভাল ব্যবস্থাই ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, গুপ্তযুগে গ্রামে মানুষদের জমিজমা, ঘরবাড়ির খতিয়ান তৈরি করতেন প্রতি গ্রামে কর্মরত একজন রাজস্ব-কর্মচারী। তাঁকে বলা হত পুস্তপালস্ (**Pustapalas**), তিনি ছিলেন মুসলমান যুগের 'পাটোয়ারীর সঙ্গে তুলনীয়। সে যুগে জমি বিলি বন্দোবস্তের দলিলও তৈরি হত। আমিনদের মতন রাজস্ব কর্মচারীদের বলা হত 'প্রমাতা'। তিনি জমি জমার মাপজোক ইত্যাদি করতেন। 'ন্যায়করণিক' জমির সীমানা পরিদর্শন করতেন এবং জমিসংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের ফয়সালা করতেন।

মুসলমান শাসকরা এদেশে এসে দেখলেন, হিন্দু সম্রাটরা কৃষকদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের ⅙ অংশ খাজনা হিসেবে নিচ্ছেন। (বাংলার সেনরাজারা কিন্তু নগদ অর্থে খাজনা নিতেন।) রাজস্ব (শস্যাংশ) চাষীদের কাছ থেকে গ্রামের প্রধান ব্যক্তির মাধ্যমে আদায় হয়ে রাজ-কোষে জমা পড়ছে। কৃষক, জমিজমা ইত্যাদির হিসেবপত্রও মোটামুটি ঠিকই আছে, সুতরাং নতুন মুসলমান শাসকরা সহসা রাজস্ব আদায়ের পুরাতন কাঠামো ভাঙতে গেলেন না—হিন্দু রাজস্ব কর্মচারীদের পরি-বর্তনও করতে গেলেন না।

নতুন শাসকদের ভাষা (আরবী, ফারসী) অনুসারে যেমন দেশের শাসকদের উপাধি ইত্যাদি পাল্টাল, তেমনি গ্রামের (**Village**) স্থলে নাম হল দেহাত বা মৌজা, মণ্ডলের স্থানে নাম হল পরগণা, 'বিষয়ের'

(District) জায়গায় নাম হল সরকার এবং ভুক্তির (division) স্থলে নাম দাঁড়াল সুবা ইত্যাদি।

রাজস্ব কর্মচারীদের নামও আস্তে আস্তে পাল্টে গেল, যেমন গ্রামে হল পাটোয়ারী, মুকোদ্দম, পরগনায় কানুনগো, কারকুন প্রভৃতি। সেইসঙ্গে নতুন শাসকরা রাজস্বের আদায়-হারটি উৎপন্ন ফসলের ½ অংশ থেকে ⅓ অংশ করে দিলেন।

হিন্দু রাজস্ব কর্মচারীরাই যেমন গ্রামে-পরগনায় রাজস্ব আদায় করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন। দেশে বারবার রাজশক্তির যে পতন এবং অভ্যুদয় ঘটেছে তা নিয়ে গ্রামবাসী ও চাষীরা কোনোদিন তেমন মাথা ঘামায়নি। তারা তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকে খাজনা হাতে নিয়ে ভক্তিবিনম্র কণ্ঠে নতুন মুসলমান শাসকদের উদ্দেশ্যে বলেছে :

"রাজা গেল, রাজা এলো মোদের তাতে কি,
নতুন রাজা আসুন বসুন, খাজনা নেবেন কি ?"

এর একটা চমৎকার উদাহরণ পাই, যখন দিল্লির জবরদস্ত সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন সৈন্যসামন্ত নিয়ে গৌড়বাংলায় আসেন বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রীল খাঁর বিদ্রোহ দমন করতে।

ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন যে তুঘ্রীল খাঁ (১২৭৫ খ্রীঃ) নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং দিল্লিতে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধও করে দিয়েছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিনকে গৌড়বাংলায় প্রতি পদক্ষেপে অভ্যর্থনা করেছিল তৎকালীন গ্রামীণ হিন্দু রায়, চৌধুরী এবং মুকোদ্দমরা। এঁরা হলেন, যথাক্রমে জমিদার, ভূস্বামী ও রাজস্ব কর্মচারী।

মুসলমান যুগের সেই গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে (দক্ষিণ ভারত নয়) একদিকে বিজয়ী মুসলমান শাসকরা দেশ শাসন করেছেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন, নতুন নতুন দেশ দখল করে রাজস্ব আদায়ের

ব্যবস্থা করেছেন। আর অন্যদিকে হিন্দু রাজস্ব কর্মচারীরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে চাষী ও ফসলের হিসেব রেখেছেন এবং রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজকোষে জমা দিয়েছেন।

মুসলমান শাসনের সেই উদয়কাল থেকে শুরু করে অবসানকাল পর্যন্ত মুসলমান শাসকরা রাজস্ব কর্মচারী হিসেবে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদেরই বেশী পছন্দ করেছেন। গ্রাম থেকে ঠিকমতন রাজস্ব আদায় হলে মুসলমান আমির ওমরাহ থেকে শুরু করে সুলতান পর্যন্ত সকলেই সন্তুষ্ট থাকতেন, এবং রাজস্ব কর্মচারীদের খুব একটা বিব্রত করতেন না।

সে যুগের খাজনা আদায়ের এই ধারা একশো বছর পর্যন্ত বেশ চালু ছিল কিন্তু প্রথম এর ব্যতিক্রম ঘটল দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়ে (১২৯৬ খ্রীস্টাব্দ—১৩১৬ খ্রীস্টাব্দ)

এতদিনের মুসলমান শাসনে হিন্দু জমিদার এবং রাজস্বসংগ্রহকারীরা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন খুৎ (khut), মুকোদ্দম (গ্রামের প্রধান ব্যক্তি) ও চৌধুরী (পরগণার প্রধান ব্যক্তি) প্রভৃতি। এঁরা পুরুষানুক্রমে রাজস্ব আদায়ের কমিশন, উপঢৌকন এবং খাস নিষ্কর জমির উপস্বত্ব থেকে বেশ ধনশালী হয়ে উঠেছিলেন। এই সব রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু।

সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর রাজনীতি ছিল—কোন সরকারি কর্মচারী বা প্রজা ধনশালী হতে পারবেন না। আর্থিক অনটনে রাখলে সবাই আর বিদ্রোহী হতে পারবে না—এই কথাই তিনি ধ্রুব সত্য বলে মানতেন।

এবারে সম্রাটের কাছে এইসব হিন্দু রাজস্ব সংগ্রহকারীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনীত হল, যেমন :

(১) এইসব রাজস্ব সংগ্রহকারীরা ঠিক মতন রাজস্ব সরকারী ট্রেজারিতে জমা দেন না।

(২) রাজস্বের অনেকখানি এরা নিজেরাই আত্মসাৎ করেন এবং সরকারকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন।

(৩) এঁরা মূল্যবান বস্ত্র-অলঙ্কারাদি ব্যবহার করেন এবং খুব দামি দামি বিদেশি ঘোড়া নিজেদের ব্যবহারের জন্য ক্রয় করেন।

(৪) এঁরা ইরানে তৈরি দামি তীর ধনুক কিনে থাকেন এবং মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লড়াইও করেন। এদের স্ত্রী পরিজনরা মূল্যবান স্বর্ণ-অলঙ্কারাদি পরিধান করে থাকেন।

(৫) এইসব হিন্দু রাজস্ব সংগ্রহকারী যেমন খুত, মুকোদ্দম, চৌধুরীরা মাঝে মাঝে বিরাট-বিরাট পান-ভোজনাদির উৎসবে জলের মতন টাকা খরচ করে থাকেন। ইত্যাদি।

অভিযোগ গুরুতর সুতরাং কাজ হল। সম্রাট এই সমস্ত রাজস্ব সংগ্রহকারীদের সংযত করতে কতকগুলি আদেশ জারি করলেন, যেমন :

(১) এখন থেকে সকলকেই জমির জন্য রাজস্ব দিতে হবে এবং সেটা হবে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ।

(২) আগে রাজস্বসংগ্রহকারীরা যেসব সুযোগসুবিধাগুলি (concession) পেতেন সেগুলি বাতিল করা হল; এবং তাঁরা কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা বা রাজস্বের অতিরিক্ত কোন উপহার বা উপঢৌকন (perquisites) নিতে পারবেন না।

(৩) এইসব ব্যক্তিদেরও (খুত, মুকোদ্দম, চৌধুরী) তাদের নিজস্ব জমির জন্য এখন থেকে রাজস্ব দিতে হবে এবং তার পরিমাণও হবে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ।

এরপর থেকে সাধারণ রায়ত ও বলাহারদের মধ্যে কোন তফাৎই আর রইল না। শুধু তাই নয় সম্রাট আলাউদ্দিন তার খাজনা ধার্য শুরু করলেন জরিবি নিয়মে (by Measurement) অর্থাৎ এক বিঘে জমিতে ফসল-ফলনের নিরিখে রায়তের জমির পরিমাণ অনুসারে

খাজনা ধার্য হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজস্ব আদায় ব্যাপারে সুলতান আলাউদ্দিনই মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে প্রথম জরীবি প্রথার প্রয়োগ করেছিলেন। এ সত্য ইতিহাসে প্রায় উহ্য হয়েই আছে।

উপরি-উক্ত আদেশগুলি ছাড়াও সম্রাট আলাউদ্দিন আরও দুটি নতুন ট্যাক্স বা কর ধার্য করলেন :

(১) গরু-ভেড়া-মোষ-ছাগল ইত্যাদি চরাবার জন্য কৃষক ও গৃহস্থ সকলকে খাজনা দিতে হবে (Grazing tax)।

(২) এখন থেকে প্রত্যেক বাড়ির উপরও ট্যাক্স চাপানো হল (House tax)।

শুধু ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি বা নতুন ট্যাক্সই ধার্য হলো না, সরকার সেইসঙ্গে ঘোষণা করলেন, বকেয়া করও দিতে হবে।

সম্রাটের এমনি ধারা আদেশে সাধারণ কৃষক বা রায়তদের অবস্থা করুণ হয়ে উঠল। তারা এত দরিদ্র হয়ে পড়ল যে তাদের পক্ষে আর রাজস্বসংগ্রহকারীদের রাজস্ব বাদে অতিরিক্ত উপঢৌকন (perquisite) প্রভৃতি যোগানো সম্ভব হল না। রাজস্বসংগ্রহকারীরা এখন থেকে রায়তদের সমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল ; কারণ, তাদের জমিজমার জন্য তাদেরও সরকারকে খাজনা দিতে হল। ফলে এই সমস্ত খুত, মুকোদ্দম এবং চৌধুরীরা এত দরিদ্র হয়ে পড়লো যে তাদের ঘরের সঞ্চিত সোনাদানা এবং অর্থ বকেয়া খাজনা দিতে দিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। এতদিন যে তারা ভালো দামি দামি ঘোড়া, বস্ত্র, অলঙ্কার কিনেছেন, সেসব কেনাকাটা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক ঐতিহাসিক বারুনি বলেছেন, যে এই সমস্ত হিন্দু রাজস্ব সংগ্রহকারীদের বাড়ির অবস্থা এতদূর সঙ্কটজনক হয়ে দাঁড়াল যে তাদের স্ত্রীরা মুসলমানদের বাড়িতে কাজকর্ম করে অন্নসংস্থান করতে লাগলেন।

সম্রাট আলাউদ্দিনের এই রাজস্ববিষয়ক আদেশ তাঁর অর্থবিভাগের উপমন্ত্রী সরাফ্ কুয়াইনি (Sharaf Qaini) এবং রাজস্ব কর্মচারীরা নিখুঁতভাবে রূপায়ণ করেছিলেন।

রাজস্ব সংগ্রহকারীদের উপর খাজনা ধার্য হল, বকেয়া করের টাকা আদায় হল, সুবিধে-সুযোগগুলি তুলে নেওয়া হল কিন্তু তাদের কর্তব্য-কর্ম বন্ধ করা হল না। অর্থাৎ তাদের রাজস্ব প্রজাদের কাছ হতে আদায় করে দিতেই হবে।

যে সমস্ত স্থানে সম্রাটের রাজস্ব আদায় হয়নি সেখানে রাজস্ব কর্মচারীরা খুত, মুকোদ্দম এবং চৌধুরীদের গরু-ছাগলের মতন একটা দড়ি দিয়ে গলায় বেঁধে গ্রামের মধ্যেই সবার সামনে লাথি, চড়, ঘুঁসি মেরে লাঞ্ছনা ইত্যাদি করতে থাকল। অনেককে কারারুদ্ধ করা হল, জমিজমাও বাজেয়াপ্ত করা হল। এইরকম অবস্থায় চারদিকে হাহাকার উঠল এবং গ্রামগুলি সব শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল।

সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্ব খুব বেশি দিন চলেনি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে তুঘলক রাজত্ব আরম্ভ হল (১৩২১ খ্রীঃ)।

তুঘলক সুলতানরা ঠিকই বুঝেছিলেন, যে কৃষকরাই হল সাম্রাজ্যের সম্পদের মূল উৎস, কারণ তারাই মাটিতে ফসল উৎপাদন করে, তাছাড়া বাকি সব কর্মচারী ও আদায়কারীরা হলো সম্পদ শোষণকারীর দল।

আলাউদ্দীন খিলজী যে সমস্ত প্রজাদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, তুঘলকরা এসে সেগুলি মুক্ত করে দিলেন। ধৃত কৃষক ও হিন্দু রাজস্ব সংগ্রহকারীদেরও মুক্ত করা হল। সবাই আবার নিজ নিজ কাজে যোগ দিল। তুঘলক সম্রাটরা চাষীদের উৎসাহের সঙ্গে চাষাবাস করতে বললেন।

দেশের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে কেল্লা তৈরি হল (ধানকাটার সময় এখনকার পুলিশ ক্যাম্পের মতন) যাতে ফসল লুট না হয়।

দূরদূরান্তগামী নতুন, নতুন খাল কেটে সাম্রাজ্যের সকল স্থানের কৃষিজমিতে সেচের সুবন্দোবস্ত করা হল। ভূমিরাজস্ব বা খারাজের আদায়ের হার কমিয়ে উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{১০}$ অংশ বা $\frac{১}{১১}$ অংশ করা হল (Gross Produce)।

রাজস্ব কর্মচারী এবং সংগ্রহকারীদের উদ্দেশে কৃষি উন্নতির জন্য লিখিত ফার্মান জারি হল। তাতে বলা হল :

(১) প্রত্যেক চাষীর কাছে মাঠে গিয়ে উৎপন্ন ফসলের প্রকৃত ফলন দেখেই যেন চাষীর খাজনা ধার্য করা হয়।

(২) কোন উড়ো খবরের উপরে মোটা খাজনা ধার্য করে যেন কোন চাষীকে কষ্ট না দেওয়া হয়।

(৩) চাষীদের উপর খাজনা বা রাজস্ব ধার্যের সময় পাটোয়ারীরা যেন সদাসর্বদা মনে রাখেন যে ধার্য খাজনা যেন চাষীর সহজ পরিশোধ ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

(৪) খুত, পাটোয়ারী, মুকোদ্দম, চৌধুরী কানুনগো প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ভূমিরাজস্ব কর্মচারীরা মনে রাখবেন, যে আপনারা চাষীদের জমিটুকুতে শুধু বেশী করে খাজনা ধার্য না করে, তাদের অধিক বাড়তি পতিত জমিতে (Agricultural Waste Land) চাষ করতে উৎসাহ দেবেন এবং সেইরকম আবহাওয়াও তারা তৈরি করবেন।

এইরকম আরও সব কৃষি বিষয়ক আদেশ জারি হল ; তুঘলকদের এই মানবিক এবং উদার কৃষিনীতির ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলি আবার ফলে-ফসলে হেসে উঠল এবং দেশে ব্যাপক কৃষির সম্প্রসারণ ঘটল।

ফলত রাজস্বের হার কমানোর জন্য যে পরিমাণে খারাজ কম পাচ্ছিলেন সম্রাট, তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল।

পরবর্তী তুঘলক বংশের খেয়ালী রাজা মহম্মদ তুঘলকের (১৩২৫

—১৩৫১ খ্রীস্টাব্দ) নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা সকলেই জানেন। বড় টাকার নোট তৈরি, রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর প্রভৃতি কার্যের মধ্যে মৌলিকতা ও যৌক্তিকতার অভাব ছিল না, কিন্তু সেগুলি রূপায়ণে দক্ষতার অভাবে জনসাধারণের দুঃখকষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না।

মহম্মদ তুঘলক সম্রাট হয়ে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে একটি চমকপ্রদ আদেশ জারি করেছিলেন। তিনি তার রাজস্ব কর্মচারীদের হুকুম জারি করে বললেন, তার সাম্রাজ্যের ২৪টি ইকতার (প্রদেশ) প্রতিটি গ্রামকে নিয়ে একখানা পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান বই (Register) তৈরি করা হোক। সেই বইতে থাকবে ভারতবর্ষের সকল গ্রামের প্রজাদের নাম, ঠিকানা, জমিজমা, খাজনা, শস্য ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। সেই বই দেখে সমগ্র ভারতের কৃষিজমির একটা সমান হারে খাজনা ধার্য করা হবে। অবশ্য পরবর্তীকালের ইতিহাস গবেষকরা সেই খাজনার বই বা রেজিস্টারখানা খুঁজে পাননি।

ঐতিহাসিক বারুনি তার বর্ণনায় মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা বলেছেন।

সেটি হল মহম্মদ তুঘলক সহসা উর্বর শস্যপূর্ণ দোয়াব প্রদেশের কৃষকদের খাজনার হার ১০—২০ গুণ বৃদ্ধি করলেন। সেইসঙ্গে রাজস্ব কর্মচারীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ঐ বর্ধিত খাজনা আদায় করতে শুরু করে দিলেন। ফলে কৃষক এবং গৃহস্থরা শীঘ্র নিঃস্ব এবং দরিদ্র হয়ে পড়ল এবং জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য হয়ে সর্বসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। এইসঙ্গে পরপর কয়েকবছর অনাবৃষ্টিতে শস্যশ্যামল দোয়াব প্রদেশ একদম শ্মশান হয়ে উঠল। দোয়াব প্রদেশে এবং দিল্লিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রাজস্ব কর্মচারীদের খাজনা আদায় কিন্তু নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই চলতে থাকল। ফলে দোয়াব প্রদেশের কৃষকরা বিদ্রোহ করল এবং রাজাকে খাজনা দেয়া বন্ধ করে দিল। সম্ভবত

মুসলমান যুগে এই হোল প্রথম কৃষকবিদ্রোহ।

এদিকে দলে দলে সশস্ত্র রাজসৈন্য এসে বিদ্রোহী চাষীদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করল।

খাজনা দাও, না হয় মর।

কৃষকেরা শেষে অতিষ্ঠ হয়ে দোয়াবের বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু তাতেও কৃষকেরা রেহাই পেল না, দলে দলে সুলতানের সৈন্যরা বনের মধ্যে থেকে বর্শা দিয়ে তাদের খুঁচিয়ে বার করে এনে মারতে লাগল। সমৃদ্ধশালী দোয়াব প্রদেশের কৃষিব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল।

পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তুঘলকের (১৩৫১—১৩৮৮ খ্রীঃ) সময়ে কৃষিব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। সে যুগে সরকার যে রাজস্ব পেতেন তার সিংহভাগই আসত খারাজ বা ভূমিরাজস্ব থেকে।

আবার জমির খাজনা ধার্য হোত উৎপন্ন ফসলের একটা অংশের উপর। সুতরাং রায়ত বা চাষী যত পরিমাণ বেশি জমি চাষ করবে অথবা যত বেশি ফসল উৎপন্ন করবে, সরকার তত বেশি রাজস্ব আয় করবেন। ফিরোজ তুঘলক এ সত্য ভালোভাবেই বুঝেছিলেন।

তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করতে হলে :

প্রথমত, কৃষকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হবে, দেখতে হবে তাদের উপর যেন কোন উৎপীড়ন না হয়।

দ্বিতীয়ত, চাষের জমিতে জল সেচের প্রয়োজন আছে, এবং সে ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে।

তৃতীয়ত, চাষীদের হাতে কিছু নগদ অর্থ থাকারও প্রয়োজন আছে!

চতুর্থত, প্রাচীন কাল থেকে (হিন্দু যুগ) চাষীদের উপর যে করগুলি (cess) চাপানো আছে সেগুলি থেকে চাষীদের

রেহাই দেয়া দরকার।

পঞ্চমত, একজন কৃষকের নির্দিষ্ট জমির উপর করের গুরুভার না চাপিয়ে তাকে অতিরিক্ত পতিত জমি চাষ করতে উৎসাহ দিলে কৃষক এবং সরকার (মধ্যবর্তী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও) উভয়েই উপকৃত হবেন।

ফিরোজ তুঘলক সিংহাসনে বসেই সমগ্র রাজ্যের জন্য একজন ভূমিরাজস্ব কর্মচারী (Land Revenue Assessor) নিযুক্ত করলেন। সেই কর্মচারী পাক্কা ছ'বৎসর ধরে সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণ এবং জরীপ করে জমিজমার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তৈরি করলেন। সম্রাট সেই বিবরণ দেখে রায়ত বা কৃষকদের খাজনার হার কমিয়ে দিলেন। প্রাচীন প্রচলিত করগুলিও (হিন্দু আমলের) বাতিল করা হল। এতে সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কমে গেলেও, দেশে খাদ্যদ্রব্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়াতে সর্বসাধারণের মধ্যে আবার সুখশান্তি ফিরে এল।

সম্রাট চাষীদের মঙ্গলের জন্য অনেকগুলি কৃষি বিষয়ক আদেশ জারি করলেন।

রাজ্যে পতিত জমিতে ব্যাপক কৃষি সম্প্রসারণ ঘটল, কারণ চাষীরা দেখল অধিক ফসল ফলালে সরকার খাজনা নেন সামান্য। কূপ, খাল প্রভৃতি খননের মাধ্যমে দেশে সেচের ব্যাপক ব্যবস্থা হল, এসব ছাড়া তিনি যমুনানদী থেকে ১৫০ মাইল দীর্ঘ এক খাল কেটে শুষ্ক জলহীন সব অঞ্চলে জল পৌঁছে দিলেন। এই যুগেই বিখ্যাত হিসার নগরীর পত্তন হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ফিরোজ তুঘলক তাঁর সময়ে এক কৃষিবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।

তিনি সকলকে দেখিয়েছিলেন যে কি করে রাজস্ব এবং অন্যান্য কর হ্রাস করেও রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায় এবং দেশে কৃষিবিপ্লব ঘটানো

যেতে পারে। ঐতিহাসিকরা অবশ্য ফিরোজ তুঘলকের কৃষিব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক গন্ধী বলেছেন, তাহলেও উন্নততর কৃষিব্যবস্থার জন্য তাঁর অবদান অতুলনীয়। মুসলমান ভারতে তিনিই প্রথম 'সবুজ বিপ্লব' হাসিল করেছিলেন।

তৈমুরলঙের আক্রমণে তুর্ক-আফগান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়।

বাহলুল লোদি কতকগুলি অর্থনৈতিক সংস্কার করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি ছিল সীমাবদ্ধ, কারণ তার রাজ্যও ছিল আয়তনে খুবই ছোট।

সিকান্দার লোদিই প্রথম আয়-ব্যয়ের হিসেব ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন (মনে হয় এই সময় থেকেই 'কারকুন' নিয়োগ সুরু হয়েছিল)। সিকান্দার লোদির আর একটি অবদান ছিল, জমি পরিমাপ করার জন্য 'সিকান্দার গজ' (Sikandar Gaz) উদ্ভাবন।

তাঁর সময়ের এক গজ দড়ির দৈর্ঘ্য সমান ছিল ৩২ আঙ্গুলি (digit)। সিকান্দার লোদির এই জমি পরিমাপ একক. পরবর্তীকালে সম্রাট শেরশাহ গ্রহণ করেছিলেন।

মোগল সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বে নতুন কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শোনা যায় না। তাঁরা তাঁদের পূর্বতন সম্রাটদের ভূমিরাজস্ব প্রণালী গ্রহণ করেছিলেন।

মুসলমান যুগের ভূমিব্যবস্থা (Land system) এবং সুলতানদের অনুসৃত নীতি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। এখন ঐ সব যুগের রাজ্যবিন্যাস এবং কি প্রকারে ও পরিমাণে ভূমিরাজস্ব আদায় হত, সে প্রসঙ্গেও সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

তুর্কী-আফগান যুগে ভারতবর্ষকে কতকগুলি প্রদেশ বা ইকতায় (Ikta) ভাগ করা হত। মুঘল যুগে প্রদেশকে বলা হত সুবা (Suba)। প্রত্যেকটি ইকতা বা সুবাকে কতকগুলি 'সরকারে' ভাগ

করা হত। সরকারগুলি ছিল অনেকটা জেলার মতন আয়তনের। 'সরকার'কে আবার কতকগুলি 'পরগনায়' ভাগ করা হত। আবার কতকগুলি মৌজা বা 'গ্রাম' বা দেহাত নিয়ে গঠিত হত এক একটি পরগনা। হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ যুগে রাজ্যবিভাগের স্তরগুলি ছিল নিম্নরূপ :

বর্তমান কালে—প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা, থানা, গ্রাম।

হিন্দু যুগে—দেশ, ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, গ্রাম।

মুসলমান যুগে—ইকতা/সুবা, সরকার/চাকলা, পরগনা,* দেহাত/মৌজা।

ইংরেজ যুগে—প্রভিন্স, ডিভিশান, ডিস্ট্রিক্ট, সাবডিভিশান, পুলিস স্টেশান, ভিলেজ।

মুসলমান যুগে সমগ্র সাম্রাজ্যের জমির মালিক হলেন ভারতসম্রাট, বা বাদশা। তাঁরা সাধারণত নিম্নবর্ণিতভাবে তাঁর জমি বিলিবণ্টন এবং রাজস্ব আদায় করতেন :

(১) জায়গীরদারের মাধ্যমে (Assignees) :

সাম্রাজ্যের এক একটা বড় অঞ্চল জায়গীরদারের মধ্যে বিলি করা হত। এরা প্রায় সকলেই বড় বড় সেনাপতি হতেন। এই জায়গীর অঞ্চলগুলি ছিল একটা রাজ্যের মধ্যে আরেকটা রাজ্যের মতন (State within a state)।

এইসব জায়গীরদাররা সম্রাটকে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করতেন এবং সৈন্যদল পুষতেন। জায়গীরদারদের বেতন নগদ টাকায় দেওয়া হত না। জায়গীরের ভূসম্পত্তি থেকে আদায়ীকৃত খাজনাই ছিল তাঁদের বেতন বা আয়।

---

* রাজস্ব আদায়ের ইউনিটকে 'মহল' বলা হত। একটি বা একাধিক মহলে পরগনা হত।

এই সমস্ত জায়গীরদারদের অভ্যন্তরীণ কৃষিব্যবস্থা বা খারাজ আদায়ের ব্যাপারে সম্রাট খুব একটা বড় হস্তক্ষেপ করতেন না।

(২) আঞ্চলিক ভূস্বামীর মাধ্যমে (Chiefs) :

মুসলমান যুগে সুলতান বা বাদশারা বড় বড় এলাকায় হিন্দু-প্রধানদের স্বাধীনতা এক প্রকার স্বীকার করেই নিয়েছিলেন। বিনিময়ে হিন্দুরাজা / জমিদাররা সম্রাটকে বাৎসরিক একটা মোটা কর দিতেন। এর উদাহরণ, বিষ্ণুপুরের রাজারা বা দিনাজপুরের মহারাজা।

আবার অনেক এরকম করদ রাজ্য যুদ্ধের সময় বাদশাকে সৈন্য-সামন্ত রসদ ইত্যাদি দিয়েও সাহায্য করত। যেমন রাজপুতানার রাজ্যগুলি।

এই সমস্ত রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ কৃষিজমির বিলি-বন্দোবস্ত ও খাজনা ধার্য বা আদায় রাজা বা জমিদাররা সাবেকি নিয়মেই করতেন। এ নিয়ে বাদশারা বড় একটা মাথা ঘামাতেন না, তবে কর দেওয়া বন্ধ হলেই বাদশার সৈন্যরা এসে রাজা / জমিদারকে উৎখাত করে নতুন একজন জমিদারকে অনুরূপ শর্তে সে রাজ্যে বসিয়ে দিতেন।

(৩) খালসা জমির বন্দোবস্ত :

বাকি জমি হল সরকারের খাসজমি। একে বলা হত খালসা জমি (Khalsa land)

এই সমস্ত জমির বিলি-বন্দোবস্ত এবং খাজনা আদায় হত সরকারের রাজস্বমন্ত্রী ও কর্মচারীদের সাহায্যে।

সে সময়ে ইজারাদারের (Farmers) মাধ্যমেও অনেকসময় এক বৎসরের জন্য বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট খাজনায় জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত।

এই ইজারাদার আসলে একজন ব্যবসায়ী, যে মোটা টাকা লগ্নী করত এই আশায় যাতে করে সে চাষীদের কাছ থেকে মোটা মুনাফা আদায় করে লাভবান হতে পারে।

মুসলমান যুগের শেষ লগ্ন পর্যন্ত এই ইজারার মেয়াদ ছিল মাত্র এক বৎসর করে। পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজত্বে এই ইজারার মেয়াদ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই বন্দোবস্ত ইজারাদারের মৃত্যুর পরে তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও বর্তাত।

(৪) গ্রামের প্রধান ব্যক্তির মাধ্যমে (Headman) :

বাকি খালসা জমির খাজনা গ্রামের প্রধান ব্যক্তির মাধ্যমেও আদায় করা হত। তুর্কী-আফগান যুগে সরকার কৃষক বা রায়ত হিসেবে খাজনা ধার্য করতেন না।

খাজনা ধার্য হত গোটা গ্রামের কৃষিজমির উপর এবং মুকোদ্দমের উপর ভার থাকত সেই পরিমাণ খাজনা আদায় করে সরকারকে জমা দেওয়া।

সুতরাং সরকারী খাজনা আদায় না হলে মুকোদ্দমকেই দায়ী করা হত। মুকোদ্দম গ্রামের সমস্ত চাষের জমি কৃষকদের মধ্যে সঙ্গত খাজনায় ভাগবণ্টন করে দিতেন।

গ্রামে এবং পরগনায় খাজনা আদায়ের কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

গ্রাম পাটোয়ারী (Village Accountant) : জোতজমি জমা ফসল ইত্যাদির হিসেব রাখতেন।

মুকোদ্দম (Muqaddam) : ইনি ছিলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। এঁর মাধ্যমেই জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত হত এবং ইনিই গোটা গ্রামের উপর ধার্য খাজনা সরকারকে জমা দিতে বাধ্য থাকতেন।

পরগনা : একজন পাটোয়ারী গ্রামে যে জমিজমার হিসেব রাখতেন, পরগনায় কানুনগো তাঁর অধীন গ্রামসমূহের জমিজমা, তার ফসল, দখলদার ইত্যাদির হিসেবপত্রই রাখতেন। সেযুগে একজন পরগনাস্থিত কানুনগো আদায়ের উপর শতকরা এক টাকা হারে কমিশন পেতেন।

তিনি ছিলেন জমিজমা এবং প্রজাস্বত্বের আইনকানুন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তাঁর রিপোর্টেই সরকার থেকে গ্রামের খাজনা ধার্য করা হত।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেছেন, 'কানুনগোরাই হলেন চাষীদের ভরসা' বা আশ্রয়স্থল (Refuge of the husbandman)

চৌধুরী (Headman of the Parganas) :

সমস্ত গ্রামের খাজনা চৌধুরীদের কাছে জমা হত। এঁরা বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন না। আদায়ের উপর সাধারণত শতকরা এক টাকা কমিশন পেতেন।

আমিন : জমিজমার মাপজোক করে চাষীদের মধ্যে বিলি করতেন। বিবাদাদি মীমাংসাও করতেন।

এরপর সকল পরগনার চৌধুরীরা খাজনা জমা দিতেন জেলা বা সরকারের ট্রেজারিতে, তারপর সেখান থেকে রাজস্ব প্রদেশ বা ইকতার সরকারী কোষাগারে জমা হত।

খাজনা সাধারণত গ্রহণ করা হত 'ফসলে'। তবে নগদ টাকায় খাজনা দিলে রাজস্ব কর্মচারীরা বেশি খুশি হতেন। ফসলের মূল্য চলতি বাজার দাম অনুসারে ধরা হত।

এখন সেযুগে খাজনা আদায়ের হার কিরকম ছিল ?

হিন্দু যুগে কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ খাজনা রাজাকে দিত, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ছিল।

মুসলমান যুগে খাজনা আদায়ের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ কোন জমিতে যদি উৎপন্ন ধানের পরিমাণ হত তিন মণ তাহলে সরকারী খাজনা হবে ১ মণ ধান এবং চাষীর থাকবে ২ মণ ধান। কোন কোন ক্ষেত্রে এই রাজস্বের পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশও করা হয়েছে। যেমন সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী ও শাহজাহানের সময়ে।

উপরি-উক্ত নিয়ম ছাড়া নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন

স্থানে খাজনা বা রাজস্ব গ্রহণ করার রীতিও চালু ছিল যেমন :

(১) উৎপন্ন ফসলের অংশ (Sharing) যা পূর্বে বলা হয়েছে।

(২) জরীব পদ্ধতিতে অর্থাৎ মাপের সাহায্যে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে খাজনা ধার্য করা।

(৩) চুক্তিমত খাজনা আদায় (Contract) এবং

(৪) লাঙল হিসেবে খাজনা আদায়ও (Plough rent) চলত।

প্রথম পদ্ধতিতে, খাজনা আদায় বিষয়ে আগেই আলোচিত হয়েছে, অনেকটা বর্তমান আধি বা ভাগচাষীদের মতো অবস্থা। এই ভাগা-ভাগিতে চাষীদের একটা সুবিধে ছিল যে প্রকৃত ফলনের উপর চাষী তার দেয় খাজনা শোধ করলে, ভবিষ্যতে আর ধার বকেয়া কিছুই থাকত না।

দ্বিতীয় উপায় হল, জমি পরিমাপ করে খাজনা নির্ধারণ করা, যাকে জরীবি নিয়ম বলা হয়েছে। এই উপায়ে বিঘা প্রতি প্রতিটি ফসলের ফলনের হার সরকার আগে থাকতেই তৈরি করতেন।

পরে চাষীর বন্দোবস্ত নেওয়া জমির পরিমাপ স্থির করে, তার জমির উৎপন্ন ফসলের হিসেব বার করা হত। সেই উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ সরকার খাজনা নিতেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক কোন পরগনার আমন ধানের বিঘা প্রতি ফলনের সরকারি হার হল ২০ মণ। এখন যদি কোন কৃষকের ১০ বিঘা চাষের জমি থাকে এবং ঐ জমিতে সে যদি আমন ধান ফলিয়ে থাকে, তবে ঐ ১০ বিঘা জমিতে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ ধরে নেওয়া হবে ২০০ মণ। এক্ষেত্রে ঐ চাষী সরকারকে খাজনা দেবে ২০০ মণের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৬⅔ মণ ধান।

তৃতীয়ত একরকম নিয়ম সেযুগে ভারতবর্ষে চলত, চুক্তিমতন খাজনা নেওয়া (Contract)। কোন কোন পরগনায় সরকার কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত দেয়া জমির জন্য চুক্তিমতন বাৎসরিক খাজনা ঠিক করতেন।

যেমন স্থির হল, রায়ত তার ২০ বিঘে জমির জন্য বাৎসরিক খাজনা দেবে বিঘে প্রতি ৫ টাকা, অর্থাৎ মোট ১০০ টাকা। এই ক্ষেত্রে চাষী তার জমিতে যত খুশি ফসল তুলুক, সেটা সরকারের পাটোয়ারী বা মুকোদ্দম দেখতে যাবেন না। সরকার ১০০ টাকা খাজনা ঐ চাষীর কাছ থেকে বছরে পেলেই খুশি হবেন।

চতুর্থ নিয়ম, লাঙল হিসেবে খাজনা ধার্য (Plough rent) কোন কোন স্থানে চালু ছিল। এটি ভারতবর্ষের পুরাতন এক পদ্ধতি। এখানে এক একটি লাঙল ও তৎসংশ্লিষ্ট সরঞ্জামকে উৎপাদনের (Production Power) ক্ষমতা হিসেবে ধরা হত।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক সিন্ধুপ্রদেশের রহিম শেখের ১০ খানা লাঙল আছে এবং ৩০০ বিঘে জমি আছে।

সরকার থেকে লাঙল পিছু খাজনা ধার্য করা হয়েছে বাৎসরিক ১৭ টাকা।

এখন রহিম শেখ যে পরিমাণ জমিই চাষ করুক না কেন, সরকার থেকে 'তা' দেখতে যাবে না।

রহিম শেখ বৎসরে সরকারকে ১৭০ টাকা খাজনা দিলেই সরকার খুশি থাকবেন। সরকারি মুকোদ্দম বা পাটোয়ারী তার ফসলের পরিমাণ বা জমির পরিমাণ দেখতে যাবেন না।

মুসলমান যুগে উত্তর ভারতের খারাজ বা ভূমিব্যবস্থার (১২০৬খ্রী—১৫৩৯খ্রী) একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করা হল।

সেযুগে যে ভূমিরাজস্ব বা খারাজই ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান আয়ের উৎস একথা সকলেই জানেন।

জমি থেকে কঠোর পরিশ্রম করে ফসল উৎপন্ন করত কৃষক এবং সম্রাট অসংখ্য কর্মচারী ও আদায়কারীদের মাধ্যমে খাজনা আদায় করতেন।

সকলের অবস্থাই সচ্ছল ছিল শুধু চাষীদের অবস্থা বাদে। তাদের

অবস্থা ছিল সত্যিই করুণ। রাজার খাজনা বাদে, জমি মাপার কমিশন, ধান ওজন করার কমিশন, পরিদর্শনকারী রাজস্ব কর্মচারীদের আহার ইত্যাদির খরচ সবই যেত ঐ চাষীদের ফসলের অংশ থেকে।

তা সত্ত্বেও সেই উক্তি আবহমান কাল থেকে এদেশে চলে আসছে, 'ন চাষা সজ্জনায়তে' অর্থাৎ চাষী কখনো ভালো লোক হয় না।

উপরি-উক্ত খাজনা, কমিশন বাদেও অশিক্ষিত চাষীদের পাটোয়ারী মুকোদ্দম প্রভৃতি কর্মচারীরা ঠকাত নানা কৌশলে, জমির ভুল মাপ দেখিয়ে, ফসলের ভুল হিসেব নিয়ে ইত্যাদি। চাষী যদি তার রাজস্ব বা খাজনা ঠিকমতো দিতে না পারত, তাহলে তার শাস্তি হত।

হিন্দু আমলে, চাষীকে জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে (ejectment) নতুন কৃষক বসানো হত।

মুসলমান আমলে চাষীকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হত, কয়েদ করা হত এমনকি তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের বেচে দিয়ে খাজনার টাকা উসুল করা হত।

কিন্তু মজার কথা হল, চাষীকে কখনো তার জমি থেকে উচ্ছেদ করার কথা চিন্তা করা হত না। এর কারণ, সে যুগের রাজস্ব বিভাগের আদেশ থেকেই বোঝা যায়।

সে যুগে দেশে জমি ছিল প্রচুর কিন্তু কৃষক ছিল কম। কৃষক জমি চাষ করলেই তো রাজার রাজস্ব আদায় এবং কর্মচারীদের মুনাফা হবে। চাষী যত বেশি জমি চাষ করবে, রাজস্বও তত বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য শাসক শ্রেণী সবসময় চেষ্টা করতেন, কৃষকদের নিজ নিজ জমিতে ধরে রাখতে। যে রায়ত বা কৃষক ঠিকমতন জমি চাষ করছে এবং নিয়মমতো সরকারকে খাজনা দিচ্ছে তাকে উচ্ছেদ করে নতুন চাষীকে বসানোর কোন প্রশ্নই উঠত না। এমনকি চাষী যদি জমি চাষ নাও করত, তাহলেও বিকল্প আর একজন চাষী না পাওয়া পর্যন্ত তাকে তার জমিতে বহালই রাখা হত, কারণ সে যুগের শাসকরা ভাবতেন 'নাই মামার চেয়ে কানা

মামা ভালো।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই যে চাষীকে তার জমিতে ধরে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টা, এটা শেষে একটা নিয়মের মতন হয়ে দাঁড়াল এবং কালক্রমে এর থেকেই জমিতে চাষীদের দখলিস্বত্বের (occupancy right) সূচনা ঘটল। অর্থাৎ বছরে বছরে খাজনা দিলে চাষীর জমি চাষীরই থাকবে।

এতক্ষণ উত্তর ভারতের খারাজ বা ভূমিরাজস্ব বিষয়ে যে আলোচনা হল, তার থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে মুসলমান শাসকদের এ ব্যাপারে তিনটি লক্ষ্য ছিল, যেমন :

(১) রায়ত বা চাষীকে তাদের জমিতে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা ;

(২) নতুন নতুন পতিত জমিতে চাষীকে চাষ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া ;

(৩) জমিতে যাতে চাষী উন্নত মানের ও উন্নত জাতের ফসল চাষ করে সে দিকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা (চাষী যদি গমের জায়গায় আখের চাষ করে, তাহলে সরকার বেশি অর্থ রাজস্ব পাবেন। কারণ সমপরিমাণ গমের চেয়ে আখের দাম বেশি।)

এই খারাজ বা ভূমিব্যবস্থা উত্তর ভারতে মুসলমান যুগের প্রারম্ভ থেকে হুমায়ুনের আমল পর্যন্ত চলেছিল।

পাঠান সম্রাট শেরশাহ (১৫৪০—১৫৪৫খ্রী) তাঁর স্বল্পকালীন রাজ্যশাসনে উন্নততর জরীপ ও খারাজ আদায় বিষয়ে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে পরে আলোচিত হবে।

সম্রাট শেরশাহের আমলে জমি জরীপ ও খারাজ ব্যবস্থা
(১৫৪০—১৫৪৫ খ্রীঃ)

হিন্দুস্থানের মধ্যযুগের শাসকদের বর্বরতা এবং হৃদয়হীনতার কাহিনী-গুলির মধ্যে সম্রাট শেরশাহের হৃদয়বত্তা আমাদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অদম্য প্রাণশক্তিসম্পন্ন শেরশাহ ছিলেন অসাধারণ শৌর্যের প্রতীক। তাঁর বাল্যকালের নাম ছিল ফরিদ খাঁ।

এই পরবর্তী নাম থেকেই বোঝা যাবে কি প্রকারের দুর্ধর্ষ মানুষ ছিলেন এই পাঠান বীর।

একটি ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করে তাকে নিহত করে প্রভু বাহার খাঁ লোহানীর কাছ থেকে এই শের খাঁ বা ব্যাঘ্রহন্তা উপাধি তিনি অর্জন করেছিলেন। সম্রাট হবার পরে তাঁর নাম হল আবুল মুজফ্‌ফর শেরশাহ।

প্রথম জীবনে ফরিদ খাঁ তার বাবা হাসান খাঁর জায়গীর সাসা-রামের দুটি মাত্র পরগনায় ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ঐ দুটি পরগনাতে চাষী বা রায়তদের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। এরাই ভূমি থেকে সম্পদ উৎপন্ন করে অথচ এদেরই কিরকম অন্যায় ভাবে ঠকান হয়।

গ্রাম্য প্রধান অর্থাৎ মুকোদ্দম এবং পাটোয়ারী, চৌধুরী, আমিন প্রভৃতি রাজস্ব কর্মচারী এবং জমিদাররা এই সমস্ত নিরন্ন কৃষকদের অত্যাচার করে অধিক ফসল আদায় করে।

জমির ভুল মাপ, ভুল ওজন, বেশি কমিশন নেওয়া প্রভৃতি নানা অপ-কৌশলে মধ্যবর্তী রাজস্ব কর্মচারীরা এদের আরও নিঃস্ব করে তুলতো। অথচ সম্রাট বা জায়গীরদাররাও যে ঠিক পরিমাণে খাজনা পেতেন তাও নয়।

চাষীদের কাছ থেকে বেশি ফসল আদায় করে তারা খাতাপত্রে সরকারকে কম ফসল উৎপন্ন দেখাতো এবং সেই হিসেবে কম খাজনা (ফসলে) সরকারকে জমা দিত।

ফরিদ খাঁ ঠিকই বুঝেছিলেন যে সম্পদ উৎপাদনকারী এই চাষীরাই হল দেশের এবং সম্রাট বা জায়গীরদারের প্রকৃত বন্ধু। আর মধ্যবর্তী রাজস্ব কর্মচারী মুকোদ্দম, পাটোয়ারী, চৌধুরী, আমিন প্রভৃতিরা হল শোষক এবং সরকারের পক্ষে বিপদজনক।

কঠোর হলেও ফরিদ খাঁর মধ্যে দরদি একটি মন ছিল। তিনি কবিতা ভালোবাসতেন এবং অনেক বড় বড় কবিতা তিনি আবৃত্তি করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিতেন।

এই দরদি মনই তাঁকে কৃষক-চাষীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছিল।

পরবর্তীকালে তিনি ভারতসম্রাট হয়ে জরীবি প্রথায় (collection of rent by actual measurement of land) প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের কথা ভাবলেন।

এতে করে রাজস্ব কর্মচারীরা জমির পরিমাণ, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বিষয়ে সরকার ও চাষীদের ধোঁকা দিতে পারতো না।

সেই সময়ে দেশে 'কিসমেৎ-ই-গল্লা' অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ খাজনা হিসেবে আদায়ের যে নিয়ম ছিল, তার সঙ্গে তিনি চালু করলেন, জরীবি প্রথায় খাজনা আদায়।

জমি বন্দোবস্ত গ্রহণকারী চাষীদের প্রথমে জিজ্ঞেস করা হত, কোন পদ্ধতিতে তারা সরকারি রাজস্ব জমা দিতে চায়। অর্থাৎ পুরানো 'কিসমৎ-ই-গল্লা' (উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ) অথবা 'জরীবি প্রথায়' (জমি জরীপ করে ফসলের উৎপন্ন পরিমাণ প্রথমে ঠিক করা হত, তারপরে তার ১/৩ অংশ)।

চাষীরা তাদের সুবিধেমতো ইচ্ছে (option) প্রকাশ করতো।

তখন জমির পরিমাণ, কি কি ফসল কৃষক চাষ করবে ইত্যাদি ঠিক করা হত।

পরবর্তী ধাপ হল, সম্রাট শেরশাহ রাজ্যের প্রতি মৌজার, পরগনার রাজস্ব কর্মচারীদের জানালেন যে তিনি অবগত আছেন কি কি উপায়ে তারা গ্রামের গরীব চাষীদের অত্যাচার ও শোষণ করে থাকেন।

এরপর তিনি প্রথমে মুকোদ্দম, চৌধুরী প্রভৃতির প্রাপ্য কমিশনের হার ঠিক করে দিলেন। কারণ এই কমিশন চাষীকেই দিতে হত।

চাষী যদি উৎপন্ন ফসলের ¼ অংশ খাজনা দেয় তাহলে সেই ফসল মাপা ও খাজনা নির্ধারণ করার জন্য রাজস্ব কর্মচারীর কমিশনের হারও তিনি ঠিক করে দিলেন।

আর চাষী যদি জরীবি প্রথায় রাজস্ব দেবে বলে স্থির করে থাকে, তাহলে সেই জমি মাপ করে খাজনার হার (টাকায় বা ফসলে) নির্দিষ্ট করার জন্য এবং ফসল ওজনের জন্য রাজস্ব কর্মচারির প্রাপ্য কমিশন পূর্বেই স্থির করে দিলেন।

এতে করে মুকোদ্দম, পাটোয়ারী, চৌধুরী প্রভৃতি রাজস্ব কর্মচারীদের অত্যাচার এবং জুলুম অনেকখানি সীমিত হয়ে গেল।

পাট্টা এবং কবুলতি প্রথায় জমি বিলিবন্দোবস্ত তিনি সরকার ও প্রজাদের মধ্যে চালু করলেন।

সম্রাট দলিল করে (পাট্টা) প্রত্যেক প্রজাকে লিখিতভাবে জানালেন, কোন্ জমি, কত পরিমাণে, কত খাজনায় তিনি বন্দোবস্ত দিলেন, পাট্টায় সবকিছু বিস্তারিত লেখা থাকত, যেমন প্রজা কোন্ প্রথায় খাজনা দিতে চায় জরীবি না 'কিসমৎ-ই-গল্লা' প্রথায়। কি কি ফসল সে চাষ করবে ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে প্রজাও সরকারকে তার জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার কথা স্বীকার করে দলিল করে দিত। তাকে বলা হত 'কবুলতি'।

এইসব সতর্কতার ফলে রাজস্ব কর্মচারীদের ধান লুঠ করার সুযোগ

অনেক কমে গেল।

সরকার লিখিতভাবে তার পাওনা খাজনা বা রাজস্বের দাবি প্রজাকে জানাতেন (Revenue Demand)। আবার খাজনা পাওয়ার পর লিখিতভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ দিতেন।

খাজনা ধার্যের সময় কর্মচারীদের বলা হত, তোমরা খাজনা ধার্যের সময় কিছুটা উদারতা দেখাবে। কিন্তু আদায় কঠোরভাবে করবে।

মাপজোক (Settlement) এবং বন্দোবস্তের জন্য সম্রাট শেরশাহের একক (unit) ছিল সিকান্দার গজ (সিকান্দার লোদির নামে)।

এক সিকান্দার গজ সমান ছিল ৩২ আঙ্গুল (digit) দৈর্ঘ। ৬০ গজ দীর্ঘ একটি দড়ির পরিমাপকে বলা হত ১ জরীব। বর্তমানে যেমন সেটলমেণ্টে গাণ্টার চেন। এক গাণ্টার চেন সমান ১০০ লিঙ্ক বা ২২ গজ।

শেরশাহের সময় ৩৬০০ বর্গগজ সমান ছিল ১ বিঘা। জরীবি প্রথায় খাজনা ধার্য তিনি নিম্নলিখিত নিয়মে চালু করেছিলেন।

সকল জমির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা এক প্রকার নয়। সেজন্য তিনি তাঁর রাজ্যের জমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। যথা, উত্তম, মধ্যম এবং সাধারণ।

প্রত্যেক মরসুমী ফসলের (Staple) ফলনের বিঘাপ্রতি হার ঐ তিন প্রকার জমিতে সরজমিনের ফসল-ফলন থেকে নির্ণয় করা হত।

তারপর ঐ তিন প্রকার ফলনের বিঘাপ্রতি গড় (average) নির্ণয় করা হত। ঐ গড় অঙ্কই হত ঐ ফসলের বিঘাপ্রতি ফলন।

তাহলে সরকারের প্রাপ্য হত ঐ পরিমাণ ফসলের ⅓ অংশ। বিভিন্ন শস্যের এই বিঘাপ্রতি ফলনের উপর নগদ অর্থে রাজস্বের দাবির একটা তালিকা প্রকাশিত হত, তাকেই বলা হত দস্তুর (Dastur)।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক আগ্রা সুবাতে গমের ফলন বিঘাপ্রতি তিন শ্রেণীর জমিতে নিম্নরূপ :

উত্তম জমিতে ২০ মণ
মধ্যম জমিতে ১৫ মণ
সাধারণ জমিতে ১০ মণ।

ঐ তিন প্রকার জমির গড় নিলে গমের বিঘাপ্রতি ফলন দাঁড়ায় $\frac{২০+১৫+১০}{৩}$ মণ = ১৫ মণ।

সুতরাং সরকারি মতে (জরীবি নিয়মে) আগ্রা সুবার গমের ফলন বিঘাপ্রতি ১৫ মণ ধরা হবে।

এখন কোন চাষীর যদি ৬ বিঘা জমি থাকে, তাহলে তার জমিতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ধরা হবে, ৬ × ১৫ মণ অর্থাৎ ৯০ মণ।

সেই চাষী তাহলে জরীবি প্রথায় সরকারকে খাজনা দেবে ৯০ মণের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৩০ মণ গম।

এমনি করে জরীবি নিয়মে অন্যান্য ফসলের নির্ধারিত খাজনা চাষী সরকারনির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে অথবা সরাসরি সরকারি ট্রেজারিতে জমা দেবে। কিসমৎ-ই-গল্লা ও জরীবি, এই দুই নিয়মেই যে খাজনা নেওয়া হত তা নয়।

সম্রাটের একটা বড় অংশই ছিল জায়গীরদারদের কাছে বন্দোবস্ত দেওয়া। এঁরা সকলেই শেরশাহের বড় বড় সেনাপতি ছিলেন। যেমন, সেনাপতি খাঁওয়াজ খান, হাঁজি খান, সুজাত খান প্রভৃতি। এই সমস্ত জায়গীর এলাকায় কিসমৎ-ই-গল্লা সেই প্রাচীন নিয়মই চালু ছিল; জরীবি প্রায় চালুই হয়নি।

সুবা বাংলায় ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহের জন্য জরীবি নিয়মে খাজনা আদায় করা চালু করা যায়নি।

সুতরাং শেরশাহর এই জরীবি নিয়মে রাজস্ব আদায় শুধু তাঁর খাস

জমিতে (Crown land) চালু ছিল বলে মনে হয়। এখানে একটা কথা বলা দরকার, সম্রাট শেরশাহ তাঁর গোটা সাম্রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন :

১। কিল্লা বা সামরিক শাসনকর্তা শাসিত অঞ্চল। যেমন—লাহোর, পঞ্জাব, আজমীর, মালব, প্রভৃতি অঞ্চল। এখানে শাসনকর্তা ছিলেন কিল্লাদাররা।

২। ইকতা বা প্রদেশ। এই অঞ্চলকে মুঘল যুগে সুবা বলা হত। অনেকটা বর্তমান প্রদেশের মতন। শাসনকর্তাকে বলা হত ইকতাদার।

৩। বাংলা প্রদেশের জন্য বিশেষ এক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল।

১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের পরে শেরশাহ বাংলায় আর কোন ইকতাদার নিয়োগ করেননি। ৪৭টি সরকারে (জেলা) বাংলাকে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে একজন করে শিকদার নিযুক্ত করেছিলেন। সরকার গুলি ছিল অনেকটা স্বাধীন রাজ্যের মতন, কেন্দ্রের অধীনে। সরকারের শাসক শিকদারদের উর্ধতন কর্মচারি হলেন কাজী ফজিলত। তাঁর কাছেই শিকদাররা খাজনা জমা দিতেন। কাজী ফজিলত সমস্ত খাজনা একত্র করে দিল্লীতে পাঠাতেন।

প্রদেশ বা ইকতায় রাজস্ব আদায়ের কৌশল আলোচনা করতে হলে অন্যসব ইকতার কাঠামো এবং সরকারি কর্মচারীদের পরিচয় জানার প্রয়োজন আছে।

ইকতা / প্রদেশ—শাসনকর্তা বা ইকতাদার।

↓

সরকার / জেলা—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা শিকদার-ই-শিকদারান (শাসনকর্তা)। মুনসীফ-ই-মুনসীফান (বিচার কর্তা)।

↓

পরগনা—(থানার মতন)। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা শিকদার—শাসন। মুনসীফ—বিচার।

আমিন—জমি পরিমাপ বিশেষজ্ঞ এবং জমি-সংক্রান্ত বিচারক।

ফোতেদার—ট্রেজারী অফিসার।

কানুনগো—জমিজমার আইনকানুন বিশেষজ্ঞ।

কারকুন—জমিজমা ও ফসল ইত্যাদির বা রাজস্ব আদায়ের হিসেব রাখতেন। দুজন কারকুন থাকতেন। একজন হিন্দি ভাষায় অপরজন ফার্সী ভাষায় হিসেব রাখতেন।

মৌজা/দেহাত/গ্রাম—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা পাটোয়ারী, এঁরা গ্রামের জমিজমা, ফলন ইত্যাদির হিসাব রাখতেন।

মুকোদ্দম—গ্রামের প্রধান ব্যক্তি / মোড়ল, এঁর উপরই সাধারণত কৃষকদের কাছে খাজনা আদায়ের ভার থাকত।

চৌকিদার—গ্রামের পাহারাদার।

গ্রামপঞ্চায়েত—গ্রাম্য বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালনা করতেন।

শেরশাহের আবির্ভাবের আগে গোটা গ্রাম হিসেবে রাজস্ব ধার্য হত, অর্থাৎ গ্রামের যিনি মোড়ল বা মুকোদ্দম তিনিই দায়ী থাকতেন সরকারের ধার্য খাজনা আদায়ের জন্য। তিনি আবার চাষীদের মধ্যে সেই খাজনা জমি হিসেবে ভাগ করে দিতেন। বলা বাহুল্য, তিনি অধিক আদায়েরই চেষ্টা করতেন। সম্রাট শেরশাহ প্রথমে নিয়ম করলেন খাজনা ধার্য হবে চাষী হিসেবে, গ্রাম হিসেবে নয়।

অবশ্য গ্রামের মুকোদ্দম রাজস্ব আদায় করতে পারবেন, তবে তাঁকে একটি মুচলেকা (**Bond**) এবং নগদ অর্থে জামিন (**Security**) জমা দিতে হবে। কৃষক প্রজারা খাজনা সোজাসুজি ট্রেজারিতে ফোতেদারের কাছে জমা দিতে পারবেন, আবার বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে মোড়লের কাছেও জমা দিতে পারেন।

গ্রামে পাটোয়ারী সরকারে কারকুন সেই হিসেব রাখছেন।

সেখান থেকে সমস্ত রাজস্ব গিয়ে জমা হচ্ছে পরগনায়। সরকারে সমস্ত পরগণার খাজনা জমা হয়ে ইকতাদারের কাছে চলে যাচ্ছে। তারপর ইকাতাদাররা তাদের ইকতা বা প্রদেশের রাজস্ব দিল্লিতে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

রাজস্ব শস্যেই নেওয়া হত। তবে, নগদ অর্থে রাজস্ব জমা দিলে রাজস্ব কর্মচারীরা খুশি থাকতেন।

খাজনা আদায় করা, ধান মাপা ইত্যাদির জন্য কর্মচারীরা একটা কমিশন পেতেন, একথা বলা হয়েছে।

তাছাড়া রাজস্ব কর্মচারীরা যখন কোন জমিজমার বিবাদ ইত্যাদির জন্য জমি পরিদর্শন করতেন, তাঁদের আহার ইত্যাদির ব্যবস্থা কৃষককেই করতে হত।

এটাই হল সম্রাট শেরশাহর ভূমিব্যবস্থা বা খারাজের একটি রূপ-রেখা মাত্র।

মাত্র পাঁচ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন কিন্তু ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে উন্নত ভূমিব্যবস্থার বন্দোবস্ত করেছিলেন পরবর্তী-কালে মোগল সম্রাট আকবর তা অনুসরণ করেন এবং ভূমিব্যবস্থাকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান। সে ইতিহাসও কম আশ্চর্যজনক নয়।

সম্রাট আকবরের যুগে জরীপ ও ভূমিব্যবস্থা
(১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ)

সম্রাট আকবরের জনপ্রিয়তার বড় একটা কারণ হল তাঁর ভূমি-ব্যবস্থা। তাঁর উদার ভূমিনীতির ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের ছোট-বড় সকল শ্রেণীর প্রজারা অশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল।

১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে যখন আকবর দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন, তখন তাঁর সাম্রাজ্য ছিল খুবই ছোট এবং তাঁর ক্ষমতাও ছিল সীমাবদ্ধ।

তার উদার রাষ্ট্রনীতি, অপূর্ব রণকৌশল, গুণীর গুণগ্রাহিতার জন্য তিনি ক্রমে এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করে যান। বিশাল এই সাম্রাজ্যের প্রজাদের মন তিনি জয় করেছিলেন তাঁর উদার ভূমি-রাজস্বের সুচারু বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে।

আকবর তার গোটা সাম্রাজ্যকে ১২টি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করে-ছিলেন। সেগুলি হল :

(১) কাবুল, (২) লাহোর, (৩) মুলতান, (৪) দিল্লি, (৫) আগ্রা, (৬) অযোধ্যা, (৭) এলাহাবাদ, (৮) বিহার, (৯) বাঙলা, (১০) আজমীর, (১১) মালব, (১২) আহম্মদাবাদ।

শেষ জীবনে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে আরও তিনটি সুবা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যেমন :

(১) আহম্মদনগর, (২) খান্দেশ এবং (৩) বেরার।

সম্রাটের তৎকালীন ভারত সাম্রাজ্যের ভূমিব্যবস্থা ও জরীপ নিয়ে আলোচনার পূর্বে তৎকালীন দেওয়ানী বিভাগের কাজকর্ম বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

আকবরের সাম্রাজ্যের প্রথম দেওয়ান (**Revenue Minister**) ছিলেন খাজা আবদুল মজিদ্।

পরবর্তী দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন মুজাফর তুরমতি খান। তাঁর

সহকারী ছিলেন টোডরমল (১৫৭০-৮১ খ্রীস্টাব্দ)।

খাজা আবদুল মজিদ্ চেষ্টা করেছিলেন সমগ্র দেশের রাজস্বব্যবস্থা সংস্কার এবং নতুন করে রাজস্ব নির্ধারণ করতে। কিন্তু তিনি সফলকাম হননি।

পরবর্তী দেওয়ান মুজাফর তুরমতি খান চেষ্টা করেছিলেন প্রাদেশিক কানুনগোদের সাহায্যে বিভিন্ন প্রদেশের জমির বার্ষিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে রাজস্ব নির্ধারণ করতে। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টাও সফল হয়নি।

সহকারী দেওয়ান টোডরমল ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটে ভূমিজরীপ করে, জমির উৎপাদনশক্তি অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এই নীতিও সম্রাট আকবর গ্রহণ করলেন না।

সম্রাট তাঁর গোটা সাম্রাজ্যের জমিকে ১৮২ পরগনায় ভাগ করলেন (বাঙলা এবং বিহার সুবা বাদ দেওয়া হয়েছিল)।

প্রত্যেক পরগনাতে একজন করে রাজস্ব কর্মচারী (**Revenue officer**) নিযুক্ত করলেন। তাঁদের বলা হত 'ক্রোরী'। এঁদের উপর বাদশাহের হুকুম হল প্রত্যেক পরগনা থেকে তাঁরা এককোটি মুদ্রা রাজস্ব হিসেবে আদায় দেবেন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত এই নিয়মও চলেনি। কারণ দেখা গেল ক্রোরীরা কৃষকদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করার জন্য তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। ফলে, এই ব্যবস্থাও বাদশাহ বাতিল করে দিলেন।

১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের দেওয়ান হলেন টোডরমল। এই সময়ে আকবরের সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ল, ফলে রাজস্বব্যবস্থায় সংস্কার অনিবার্য হয়ে উঠল। টোডরমল রাজ্যের সমস্ত জমি জরীপ করে জমির উর্বরতা (উৎপাদনশক্তি) অনুসারে জমিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন।

যেমন : (১) পোলজ (Polaj)। যে জমি সারা বছর চাষের উপযোগী থাকে।

(২) পারৌতি (Parauti)। যে জমি উর্বরতাবৃদ্ধির জন্য কিছু-কাল পতিত রাখতে হয়।

(৩) চাচর (Chachar)। এই শ্রেণীর জমিকে ৩।৪ বছর পতিত রাখতে হয়।

(৪) বানজর (Banjar)। এই চতুর্থ শ্রেণীর জমি খুবই অনুর্বর এবং ৫।৬ বছর অনাবাদি রেখে একবার চাষ করা চলত।

টোডরমল রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি চালু করেছিলেন। যেমন :

(১) গল্লাবক্স (Gallabox)

(২) জাবতি (Zabti)

(৩) নসক্ (Nasaq)।

গল্লাবক্স

গল্লাবক্স হল সাবেকী ভারতীয় প্রথা, অর্থাৎ প্রজার জমিতে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ সরকারের প্রাপ্য।

এই নিয়ম সাধারণত চালু ছিল কাবুল, কাশ্মীর (অংশ), খাট্টাতে। এই নিয়মে জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ মেপে দেখা হত না। অনুমানে (Estimation) উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ স্থির করা হত। তারপর নগদ অর্থে ঐ পরিমাণ শস্যের মূল্য বিবেচিত হত। এবং ঐ মূল্যের ⅓ অংশ সরকার খাজনা বা রাজস্ব হিসেবে নিতেন।

জাবতি

প্রায় সব সুবাতেই এই নিয়ম চালু ছিল। কেবলমাত্র বাঙলা, বেরার, খান্দেশ এবং কুমায়ুনে জাবতি প্রথার চল ছিল না।

জাবতি নিয়ম আসলে জরীবি ব্যবস্থা। এই নিয়ম হল রায়তওয়ারি এবং চাষী বা রায়তের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ খাজনা আদায় বিষয়ে

যোগাযোগ রাখা।

জাবতি নিয়মে গ্রামের যে সকল জমিতে ফসল চাষ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে খাজনা ধার্য করা হত নগদ টাকায়।

এই নিয়মে প্রত্যেক চাষের মরশুমে রাজস্ব কর্মচারী প্রতিটি জমির (Plot) একটি খসড়া তালিকা তৈরি করত। তাতে দখলকারের নাম, ফসলের নাম, জমির পরিমাণ ইত্যাদি লেখা হত।

তারপর ঐ জমির পরিমাণের সঙ্গে, সরকারি 'দস্তুরে' প্রকাশিত বিভিন্ন শস্যের নগদ অর্থে বিঘাপ্রতি প্রদেয় রাজস্বের হার গুণ করে কৃষকের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে, তাকে ফসল কাটার আগেই তার প্রদেয় রাজস্বের পরিমাণ জানিয়ে দেওয়া হত।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক পঞ্জাবে একজন চাষী তিন বিঘা জমিতে আখ চাষ করেছে।

এখন 'দস্তুর' মিলিয়ে দেখা গেল, একবিঘা আখের চাষের জন্য ঐ অঞ্চলের রাজস্ব প্রদানের হার হল বিঘাপ্রতি ২২ দাম (Dam)। তাহলে ঐ চাষী তিন বিঘা জমির জন্য সরকারি খাজনা দেবে, ৩ × ২২ দাম = ৬৬ দাম অর্থাৎ ১ টাকা ২৬ দাম (৪০ দামে ১ টাকা)।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে এই জাবতি নিয়মে খাজনা ধার্য দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করত।

(১) 'দস্তুর' (Schedule of revenue demand in cash levied upon one bigha under different crops)।

(২) দ্বিতীয়টি হল, গ্রামের বিভিন্ন জমির পরিমাণের একটি খসড়া তালিকা তৈরি করা হত। এটি করা হত জরীপ পদ্ধতিতে।

'দস্তুর' তালিকা কি করে তৈরি হত

এলাকার 'দস্তুর' নির্ণয় করতে হলে 'পোলজ' এবং 'পারৌতি' প্রত্যেক শ্রেণীর জমির উত্তম / মধ্যম / এবং নিকৃষ্ট মানের তিন শ্রেণীর জমির বিঘাপ্রতি গড় শস্যফলন বার করে নিতে হত (Crop Rate)।

এই গড়ফলনের ⅓ অংশ হল শস্যে সরকারি প্রাপ্য রাজস্ব বা খাজনা (Produce rate)।

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : ধরে নেওয়া যাক এলাহাবাদ সুবায়, উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর জমির বিঘাপ্রতি গমের ফলন, যথাক্রমে ১৪ মণ, ১০ মণ এবং ৬ মণ।

তাহলে ঐ অঞ্চলের গড়ফলন ধরে নেয়া হবে $\frac{১৪+১০+৬}{৩}$ মণ গম $= \frac{৩০}{৩}$ মণ (Crop rate), অর্থাৎ ১০ মণ গম।

বিঘাপ্রতি গড়ফলনের ⅓ অংশ হল (Produce rate) $\frac{১০}{৩}$ মণ $=৩\frac{১}{৩}$ মণ গম সরকারি প্রাপ্য।

এই ৩⅓ মণ গমকে নগদ টাকায় (Cash rate) পরিবর্তিত করে সরকারি রাজস্ব নির্ণয় করা হত।

প্রথম দিকে এই Cash rate বা খাজনার হার দিল্লি থেকে তৈরি হত, কিন্তু তাতে রাজস্ব আদায়ে খুব বিলম্ব হত।

সেজন্য আকবর ১৫৭১—১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ এই দশ বৎসরের বিভিন্ন ফসলের মূল্যের গড় নিয়ে দস্তুর তৈরি করতে আদেশ দিলেন ফলে দস্তুর তালিকা প্রতি বছর আর তৈরি করতে হত না।

বিভিন্ন অঞ্চল বা সুবায় বিভিন্ন শ্রেণীর শস্যের ফলনের জন্য বিশদ 'দস্তুর' থাকত।

গ্রামের কর্ষিত জমির তালিকা তৈরীর পদ্ধতি

প্রতিবছর চাষের মরশুমে রাজস্ব কর্মচারীরা আগের বছরের রেকর্ড নিয়ে মিলিয়ে দেখতেন, নতুন কোন্ কোন্ জমি চাষ করা হল সেগুলি নেপে পরিমাণ নির্ণয় করা হত।

কোন গ্রামের সম্পূর্ণ জমি মাপা (কিস্তোয়ার) হলে মুকোদ্দ তা 'মুনতাখাব' বা তালিকায় (Abstract) লিখতেন, এবং দু কপি

আমলগুজারের কাছে প্রতি সপ্তাহে পাঠিয়ে দিতেন।

তাতে লেখা থাকত গ্রামের নাম, মুকোদ্দমের নাম, কৃষকের নাম, শস্যের নাম এবং জমির পরিমাণ ইত্যাদি।

তাতে চাষীর মোট জমার (Holding) থেকে পতিত জমির (নাবুদ্) পরিমাণ বাদ দিয়ে কর্ষিত জমির (বুদ্) পরিমাণ নির্ণয় করা হত।

তারপর 'বিতিকিচি' (Bitikichi) ঐ তালিকা দেখে, দস্তুর মিলিয়ে রাজস্ব নির্ণয় করতেন।

তারপর ফসল কাটার আগেই গ্রামের প্রত্যেক চাষীকে তার দেয় রাজস্বের অঙ্ক (Revenue Demand) জানিয়ে দেওয়া হত।

জাবতি বা জরীপ পদ্ধতিতে মাপজোক করা হত একটা বাঁশ দিয়ে। বাঁশের দুদিকে হাতল থাকত।

যেসব জরীপ কর্মী কাজ করতেন তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত বিঘাপ্রতি ১ দাম।

কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হত। তাছাড়া তারা আহারের খরচও (diet allowance) পেতেন। আকবরের সময় মাপার একক ছিল 'এলাহি গজ'। এবং ৩৬০০ বর্গগজে এক বিঘা হত।

এই জাবতি পদ্ধতি ভারতবর্ষের সর্বত্র চালু ছিল। মুলতান থেকে লাহোর, মালব থেকে আজমীরে এই নিয়মের ব্যাপক চল ছিল।

এই 'জাবতি' নিয়ম পোলজ জমির ক্ষেত্রে সর্বদা প্রযোজ্য হত, কারণ পোলজ জমি সারা বছর চাষযোগ্য থাকত। পারৌতি জমি যখন ৩।৪ বৎসর পরে চাষ করা হত, তখন পুরোপুরি খাজনা ধার্য করা হত।

চাঁচর এবং বানজর জমির ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র রাজস্ব নেয়া হত।

এ ছাড়াও একটা কথা বলার হয়তো প্রয়োজন আছে, যে জাবতি প্রথায় খাজনা ধার্যের পরে যদি দেখা যেত, প্রাকৃতিক কোন কারণে শস্যহানি ঘটেছে, তাহলে খাজনা কমানো বা রেহাই দেবার ব্যবস্থা ছিল।

নসক্ (Nasaq)

এই নিয়মে জমির খাজনা সরাসরি চুক্তির (Contract) মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা হত।

একই জমিতে কি ফসল কতটা পরিমাণ হয়েছে তা সরকারি কর্মচারীরা দেখতে যেত না।

এই নিয়ম অনেকটা জমিদারী প্রথায় খাজনা আদায়ের মতো ছিল। বাঙলা, বেরার, কাশ্মীর (অংশ) এবং গুজরাটের কোন কোন অংশে এই নিয়মে খাজনা আদায় হত।

'নসক্' প্রথায় জমি মাপার দরকার হত না, 'দস্তুর' তৈরি হত না। গ্রাম্যপ্রধান বা মুকোদ্দমের দরকার হত না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধান ইত্যাদি নষ্ট হলে, খাজনা মকুবের ব্যবস্থাও ছিল। পতিত জমির জন্য কোন খাজনা নেওয়া হত না।

আকবরের সময়ে জমির মাপ ছিল নিম্নরূপ :

৩৬০০ বর্গগজে এক বিঘে হত।

এই সময়কার এক গজ ছিল ৪১ আঙ্গুল অর্থাৎ বর্তমান হিসেবে ৪১ × $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি অর্থাৎ ৩০$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি বা বর্তমান ২$\frac{১}{২}$ ফুটের কিছু বেশি (digit) [১ আঙ্গুল=$\frac{৩}{৪}$″]। এই গজকে বলা হত 'এলাহি গজ'।

আকবরের ১ বিঘার ২০ ভাগের ১ ভাগকে বলা হত এক 'বিশওঁয়া' বা ১৮০ বর্গগজ।

আবার ১ বিশওঁয়ার ২০ ভাগের ১ ভাগকে বলা হত ১ 'বিশ্-ওয়ানশা', অর্থাৎ ৯ বর্গগজের সমান।

বাদশাহ আকবরের সময়ে ৯ বিশ্‌ওয়ানশা অর্থাৎ ৮১ বর্গগজ জমির জন্য কোন প্রজাকে খাজনা দিতে হত না।

কিন্তু কোন প্রজা ১০ বিশ্‌ওয়ানশা জমি বন্দোবস্ত নিলে তার উপর ১ বিশ্‌ওয়ানশা জমির জন্য খাজনা ধার্য করা হত।

আকবরের রাজত্বে জমি মাপা হত একটা লম্বা বাঁশের সাহায্যে। বাঁশটির দুদিকে দুটি হাতল লাগান থাকত। এর পূর্বে জমি মাপা হত 'দড়ি'র সাহায্যে। একে বলা হত ১ জরীব। দড়ি টানলে বেড়ে যেত বলে আকবর দড়ির সাহায্যে মাপা বন্ধ করে দেন।

আকবরের ভূমিরাজস্ব আদায় হত নিম্নলিখিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাহায্যে। প্রত্যেকটি সুবা বিভক্ত ছিল অনেকগুলি 'সরকারে'।

সরকার আবার কতকগুলি পরগনাতে বিভক্ত ছিল। পরগনাগুলি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য 'মহলে' বিভক্ত ছিল। পরগনাতে এক বা একাধিক মহল থাকত।

আবার কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম নিয়ে তৈরি হত এক একটি মহল বা পরগনা।

সে সময়ে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

সুবা বা প্রদেশ

সিপাহীসালার বা সুবাদার (Governor)

ইনি হতেন একজন ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা এবং মনসবদার।

দেওয়ান (Revenue minister)

ইনি অর্থ এবং রাজস্ব সংগ্রহ দেখাশুনা করতেন। প্রাদেশিক কর্মচারীদের বেতন দিতেন, দেওয়ানী বিচারাদি করতেন। তাছাড়া ট্রেজারী দেখাশুনা করতেন।

সুবার কাজকর্ম বিষয়ে সুবাদার এবং দেওয়ান পৃথক পৃথক ভাবে দিল্লিতে বাদশাহের কাছে রিপোর্ট পাঠাতেন।

সদর (Sadar)

উপযুক্ত মানুষকে বৃত্তি এবং জমি দেবার জন্য সুপারিশ করতেন।

কাজি (Kazi)

বিচার বিভাগের প্রধান। ইনি 'সরকার' এবং পরগনার কাজিদের বিচার ইত্যাদি পরিদর্শন করতেন।

বকশী (Bakshi)

সৈন্যদলে লোক নিয়োগ করতেন। তাছাড়া প্রাদেশিক সৈন্যরা যাতে কর্মক্ষম থাকে সেদিকেও নজর রাখতেন।

ওয়াকিয়া নবীশ্ (Wakia Nabish)

প্রদেশ বা সুবার সংবাদলেখক ছিলেন। প্রদেশের গুপ্তচর নিয়োগ করতেন।

কোতোয়াল (Kotwal)

কোতোয়াল, সুবার রাজধানীর আইনকানুন, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতেন।

মীরবহর (Mirbahar)

কাস্টমস্, নৌকা, ফেরি ইত্যাদির শুল্ক আদায়ের দায়িত্বে থাকতেন।

সরকার বা জেলার শাসনকাঠামো

ফৌজদার (Fouzdar)

সৈন্যদলের সাহায্যে—'সরকারের' আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেন।

আমলগুজার (Amal Gujar)

ইনি একজন রাজস্ব কর্মচারী। কৃষক বা প্রজারা যে জমির বন্দোবস্ত নিতেন তার খাজনা ধার্য, খাজনা আদায় এবং কৃষকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতেন। কৃষকদের চাষ এবং পতিত জমি উদ্ধার ইত্যাদির জন্য অগ্রিম অর্থঋণ দানেরও ব্যবস্থা করতেন।

কাজি (Kazi)

সরকার বা জেলার মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদির বিচারাদি করতেন।

কোতোয়াল (Kotwal)

ইনি ছিলেন 'সরকারের' নগররক্ষক।

বিতিকিচি (Bitikichi)

একজন রাজস্ব কর্মচারি। প্রকৃতপক্ষে ইনি ছিলেন 'কানুনগোদের' উপরিওয়ালা। 'পরগনাস্থিত' কানুনগোরা জমির খাজনা ইত্যাদি ব্যাপারে যে রিপোর্ট পাঠাতেন, বিতিকিচি সেই রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখতেন এবং খাজনা ধার্যের ব্যবস্থা নিতেন।

খাজনাদার (Khajnadar)

খাজনাদার ছিলেন জেলা বা সরকারের কোষাধ্যক্ষ। গ্রাম বা পরগনার আদায়ীকৃত সমস্ত খাজনা এরই মাধ্যমে ট্রেজারীতে জমা পড়ত।

পরগনার শাসন কাঠামো

শিকদার (Sikdar)

ইনি হলেন পরগনার শাসনকর্তা। আবার কৃষক বা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনার টাকা আদায় করে জেলার ট্রেজারীতে খাজনা-দারের কাছে জমা দিতেন।

আমিল (Aumil)

চাষীর সঙ্গে এঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকত। খাজনা ধার্য ও আদায় করতেন।

ফোতেদার (Fotedar)

ইনি ছিলেন পরগনার ট্রেজারী অফিসার।

কারকুন (Karkun)

ইনি ছিলেন পরগনার হিসাবলেখক। কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব বা খাজনা আদায়ের হিসাব রাখতেন।

কানুনগো (Kanungo)

পরগনার কানুনগোরা ছিলেন জমিজমার আইন বিশারদ। এঁরা

সাধারণতঃ গ্রামস্থ পাটোয়ারীদের প্রধান ছিলেন এবং তাদের কাজকর্ম দেখতেন।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেছেন, কানুনগোরা ছিলেন চাষীদের ভরসাস্থল (**Kanungos are the Refuge of the husbandman—Abul Fazal**)।

সবরকম ভূমিসংক্রান্ত আইন, বিভিন্নপ্রকার জমি বন্দোবস্তের স্বরূপ, পরগনার বিভিন্ন শ্রেণীর জমির বৈচিত্র্য, খাজনা ধার্যের হিসাব এবং খাজনা আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অবগত থাকতেন।

সম্রাট আকবরের সময় এঁরা ছিলেন আধা সরকারি কর্মচারী। রাজস্ব বা খাজনা আদায়ের উপর শতকরা ১ টাকা হারে কমিশন পেতেন।

পরে সম্রাট আকবর তাদের সংসার খরচ নির্বাহের জন্য কিছু জমি-জমার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন এবং বেতন করে দিলেন মাসিক ২০ থেকে ২৫ টাকা।

চৌধুরী (Choudhury)

এঁরা ছিলেন পরগনার জমিদার এবং সরকারি খাজনা আদায়ে সাহায্য করতেন।

মৌজা বা গ্রামস্তরে শাসনব্যবস্থা

মুকোদ্দম (Mukoddam)

মৌজা বা গ্রামের শাসনকর্তা এবং প্রধান ব্যক্তি।

ইনি আইনশৃঙ্খলা দেখতেন এবং মামলা-মোকদ্দমার বিচার করতেন এবং খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করতেন।

পাটোয়ারী (Patwari)

প্রজাদের বন্দোবস্ত নেওয়া জমির খাজনা ধার্য করতেন (**assessment**) এবং আদায়ে সাহায্য করতেন।

উপরোক্ত কর্মচারী ছাড়াও সুবা এবং সরকার ও পরগনাতে আরও

অনেক সরকারি কর্মচারী ছিল। যেমন—আমিন প্রভৃতি যাদের কঠিন পরিশ্রমের ফলে রাজস্ব আদায় হত এবং রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকত।

ভূমিরাজস্ব ছিল সরকারের প্রধান আয়ের উৎস। সেজন্য প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী মনসবদার থেকে পাটোয়ারী পর্যন্ত এই ব্যাপারে সাহায্য এবং সহযোগিতা করতেন।

বাঙলায় আসলি জমা তুমহার

সম্রাট আকবর বাঙলা দেশ জয় করেন ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর রাজত্বকালে বাঙলাদেশে মোট ছয়জন সুবাদার বা গভর্নর রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁরা হলেন—

(১) খান্‌ই জাহান (হুসেনকুলী খাঁ),	১৫৭৬-১৫৭৯ খ্রীঃ
(২) মুজাফরখান তুরমতি	১৫৭৯-১৫৮০ খ্রীঃ
(৩) রাজা তোডরমল্ল	১৫৮০-১৫৮২ খ্রীঃ
(৪) খানই আজম (কোকা)	১৫৮২-১৫৮৪ খ্রীঃ
(৫) শাহবাজ খান্‌ „	১৫৮৪-১৫৮৭ খ্রীঃ
(৬) রাজা মানসিংহ	১৫৮৭-১৬০৬ খ্রীঃ

বাঙলাদেশ জয় করার পরেও সেদেশের ভূমিব্যবস্থা কায়েম করতে মুঘল সুবাদারদের প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়েছিল। এর কারণ হল বাঙলাদেশ ক্রমাগত বিদ্রোহ করার ফলে, পূর্বতন পাঠান সম্রাট শেরশাহ এখানে সুবার জন্য কোন সুবাদার বা ইকতাদার নিযুক্ত করেননি।

পরন্তু, তিনি গোটা বাঙলাদেশকে কতকগুলি জায়গীরদারদের মধ্যে ভাগ করে দেন। উদ্দেশ্য হল এই সমস্ত জায়গীরদাররা নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ নিয়ে মেতে থাকবেন, কখনো এক হয়ে দিল্লির সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠতে পারবে না।

সম্রাট আকবরের বঙ্গবিজয়ের পরে এই সমস্ত আফগান ও হিন্দু-জায়গীরদাররা সহজে মুঘল শাসনব্যবস্থা মেনে নিতে চাননি এবং

দিল্লিকে রাজস্বও পাঠাতে চাননি। বাঙলার সুবাদারদের মধ্যে দিল্লিতে প্রথম রাজস্ব প্রেরণ করেন মুজাঃফার খান তুরমতি, ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে। তিনি দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন ৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, হস্তি ইত্যাদি।

সম্রাট সব শ্রেণীর রাজস্ব কর্মচারী এখানে পাঠালেও গল্লাবক্স বা জাবাতি নিয়ম এখানে চালু করা যায়নি।

১৫৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন তোডরমল্ল। তিনি বাঙলা থেকে ফিরে এসেই ভারতসাম্রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হন। বাঙলার হালচাল তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলেন।

ঐ বছরই তিনি তাঁর জরীপ পদ্ধতি 'আসলি জমা তুমহার' বাঙলায়ও চালু করেন।

এই জরীপ অনুসারে তিনি বাঙলা সুবাকে ১৯টি সরকার বা জেলাতে ভাগ করেন। সরকার বা জেলাগুলি হল :

১। উদমবর (তান্দা), ২। জন্নতাবাদ (গৌড়) লক্ষ্মণাবতী, ৩। ফতাবাদ, ৪। মহম্মদাবাদ, ৫। খলিফাতাবাদ, ৬। বাকলা (বাখরগঞ্জ, বরিশাল), ৭। পূর্ণিয়া, ৮। তাজপুর, ৯। ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর-হিলি রঙ্গপুর), ১০। বিজারা/পিজ্জারহা, ১১। বরবকাবাদ (দিনাজপুরের মাহিসন্তোষ ও বগুড়া অঞ্চল), ১২। বাজুহা, ১৩। সোনার গাঁ, ১৪। সিলেট, ১৫। চট্টগ্রাম, ১৬। সরিফাবাদ, ১৭। সুলেইমান আবাদ, ১৮। সাতগাঁও (হুগলি-নদীয়া, ২৪ পরগনা), ১৯। মান্দারণ (বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর), আর মোট পরগনা হয়েছিল ৬৮২টি।

'আসলি জমা তুমহার' জরীপে সরকার জন্নতাবাদ (গৌড়), তাজপুর পিঞ্জারা/ঘোড়াঘাট/বরবকাবাদ, বাজুহা নিয়ে (ক্রমিক নং ২, ৮—১২) অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী বিভাগ অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলকেই উত্তরবঙ্গ বলা হত। জেলাগুলি ছিল রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, বগুড়া এবং পাবনা। আবার এই অঞ্চলই হিন্দুযুগে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে পরিচিত ছিল।

এই সময়ে উড়িষ্যার ৫টি সরকার সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। সেগুলি হল, জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলিঙ্গ, দণ্ডপত রাজা মহেন্দ্রি।

সে সময়ে উড়িষ্যায় কোন পৃথক সুবা গঠিত না হওয়ায়, উড়িষ্যার এই ৫টি সরকার বাঙলা থেকেই শাসিত হত। এই ৫টি সরকারে ৯৯টি মহল বা পরগনা ছিল।

উড়িষ্যাসহ বাঙলা সুবার দিল্লিতে দেয় রাজস্ব ছিল ঊনষাট কোটি চুরাশী লক্ষ পাঁচ হাজার নয় শত একত্রিশ দাম, অর্থাৎ ১,৪৯,৬১,৪৮২ টাকা ৸৵০ ৭ দাম মাত্র। (এককোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ একষট্টি হাজার চারশত বিরাশী টাকা পনেরো আনা সাত দাম)। তখন ১ টাকা সমান ছিল ৪০ দাম। এক রূপার টাকা ভাঙালে ৪০টি তামার মুদ্রা 'দাম' পাওয়া যেত।

বাঙলায় নসক্ বা চুক্তি প্রথায় খাজনা আদায় করা হত। জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সুবাদারের কাছে জমা দিত।

অন্যান্য প্রদেশগুলির মতো গ্রামে পাটোয়ারি, মুকোদ্দম, বা পরগনায় কানুনগো রাখা হত না।

বাদশা আকবর সমগ্র বাঙলা সুবায় একজন কানুনগো নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর নাম হল ভগবানচন্দ্র মিত্র। তার বাড়ী ছিল মালদা জেলার রুকনপুর পরগনায়।

বর্তমান ২৪ পরগনা, কলকাতা, নদীয়া এবং হুগলি জেলার অধিকাংশ ছিল ১৮নং সাতগাঁও সরকারের অধীনে। এই সরকারের সদর দপ্তর ছিল সপ্তগ্রাম।

আকবরের জরীপের পরে মোগল যুগে আরও দুটি জরীপ বাঙলায় হয়েছিল—একটি শাহজাহানের সময়ে, অপরটি হল মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে। কিন্তু সেই জরীপের কাজকর্মও 'আসলি জমা তুমহারের' আদর্শে সম্পন্ন করা হয়েছিল।

মুঘল আমলের তিন মজুমদার

শেরশাহ তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বে জরীপ প্রথার প্রবর্তন করলেও, এদেশে রাজস্ব জরীপ প্রথম করেন সম্রাট আকবর। এ জরীপের নাম 'আসলি জমা তুমহার'। এ জরীপের কৃতিত্ব হল সম্রাটের রাজস্বমন্ত্রী তোডরমল্লের। এ উপলক্ষে, ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন বাংলা পরিদর্শন করেন তখন তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়ে যান। এতদিন আফগান শাসনকর্তাদের হাতে হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতি, বিশেষ করে তান্ত্রিক মত যে নিগ্রহ পেয়ে আসছিল, তা থেকে তার মুক্তি হল। তোডরমল্ল নতুন জরীপে হিন্দুদের জায়গীর, জমিদারী, দেবোত্তর প্রভৃতিকে স্বীকৃতি দিলেন। গৌড় বা জিন্নতাবাদে হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিল।

তোডরমল্লের পরে সুবে বাঙলায় যিনি শাসনকর্তা হয়ে এলেন, তিনি হলেন দিল্লিশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র মহারাজ। মানসিংহ। ইতিহাস বলে, এই সময় বাঙলার হিন্দুদের পক্ষে এক গৌরবের সময়। কারণ, মানসিংহ বাঙলার হিন্দুদের মধ্যে তন্ত্রমতের প্রসারের সুযোগ এনে দিলেন। কারণ, এ সময়ে সরকার সাতগাঁওতে তিনজন হিন্দুর আবির্ভাব হল, তান্ত্রিকমত প্রসারে যাঁদের দান অতুলনীয়। এঁরা হলেন বাংলার তিন মজুমদার, নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার, সাবর্ণ চৌধুরী বা সাবর্ণ মজুমদারের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এবং বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়ানন্দ মজুমদার। বাংলার ইতিহাসে বিশেষ করে তন্ত্রমত এবং জনপ্রিয়তার মূলে এঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

এঁদের ক্ষমতালাভের ইতিহাস এক অদ্ভুত কাহিনী। সে কাহিনীটি হল পাঁচু গাঙ্গুলীর একমাত্র পুত্র জিয়া গাঙ্গুলী সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতে

শক্তিখাঁন উপাধিতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। মুঘল বাঙলায় তিনি তখন রীতিমত একজন কেউ-কেটা ব্যক্তি। সন্তান হবার সময় জিয়ার স্ত্রী সূতিকাঘরেই মারা যান। সদ্যোজাত সন্তানটি মৃত মাতার পাশে কাঁদছে। জিয়া তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ভয়ানক শোকে বিমর্ষ জিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে গভীর হতাশা আর শোক, অন্যদিকে মায়া আর দায়িত্ব। নবজাতকটির কি হবে, মাতার অবর্তমানে কে একে মানুষ করে তুলবে? এই চিন্তায় তিনি আকুল হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল, যাতে করে জিয়া গাঙ্গুলীর চিন্তার গতি ভিন্নপথে ধাবিত হল। সদ্য আলোকপ্রাপ্ত একটি টিকটিকির ডিম ছাদ থেকে জিয়ার সামনে পড়ে শব্দ করে ফেটে গেল। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়ে টিকটিকি বেরিয়ে এল, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে সে তখন মৃতপ্রায়। এমন সময় ক্ষুদ্র একটি পিঁপড়ে ওর কাছে আসতেই টিকটিকি শাবক ওকে কোনমতে মুখে পুরে কিঞ্চিৎ শক্তিলাভ করল। এরপর সে আস্তে আস্তে দেওয়ালে উঠে চলে গেল। এই ঘটনাটি জিয়া একমনে লক্ষ্য করছিলেন। এর মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেখতে পেয়ে জিয়া একখণ্ড কাগজে একটি কবিতা লিখে নবজাতকের বুকের উপর রেখে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন। শ্লোকটিতে লেখা ছিল,

'কাককৃষ্ণ কৃতো যেন, হংসশ্চ ধবলী কৃতঃ।
ময়ূরিশ্চিত্রিতো যেন, তেন রক্ষা ভবিষ্যতি॥'

অর্থাৎ, কাককে কালো এবং হাঁসকে ধবল রঙে যিনি রঞ্জিত করেছেন, ময়ূরকে যিনি বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করেছেন, তিনিই একে রক্ষা করবেন।

দণ্ডিধারী হয়ে তিনি নানাস্থানে ঘুরতে লাগলেন এবং ভারতবর্ষের পথঘাটের ভৌগোলিক পরিচয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। বারাণসীতে এসে তিনি কামদেব ব্রহ্মচারী নামে খ্যাতিলাভ করলেন। এ সময় মুঘল সেনাপতি মানসিংহ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এমনও শোনা

যায়, মানসিংহকে তিনি বহু যুদ্ধে নানারকমে সাহায্য করেছেন। এমন কি, কয়েকবার শিষ্যের প্রাণও তিনি রক্ষা করেছেন। এহেন গুরুর যে শিষ্যের উপর বিরাট প্রভাব থাকবে এ কথা বিচিত্র নয়।

এদিকে বিধির বিচিত্র বিধানে জিয়ার পুত্র লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপাদিত্যর সৈন্যদলে মস্ত বড় একজন বীর বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তখন বাঙলায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়। সমস্ত সুন্দরবনের তিনি অধিপতি। দিল্লিতে তখন জাহাঙ্গীরের আমল। মানসিংহই আবার বাঙলায় প্রেরিত হলেন এঁকে দমন করবার জন্যে। মানসিংহের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল, গুরুর পুত্রকে প্রতাপের কাছ থেকে সরিয়ে আনা।

এ দুঃসাধ্য কাজ কে করবে? কার এত সাহস? নিজের জীবন বিপন্ন করে কে গুরুপুত্রকে প্রতাপের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবে? অনেক ভেবেচিন্তে মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তর প্রতিবেশী, জয়ানন্দ শূদ্রমণিকে (দত্ত) এ কাজে পাঠালেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জয়ানন্দ কালী-ঘাটের কাছে এক মাটির কেল্লায় গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তকে পেলেন এবং তাকে মুঘল সেনাপতি মানসিংহের কাছে নিয়ে এলেন।

ভবানন্দ কানুনগো প্রতাপাদিত্যের কানুনগো ছিলেন। মানসিংহের রণযাত্রায় বরাবর সঙ্গে ছিলেন, এবং প্রতাপকে পরাজিত করতে তাঁরও কৃতিত্ব অল্প নয়। সম্রাটের রাজকার্যে অতুলনীয় সাহায্যের জন্য মান-সিংহ তিনজনকে 'মজুমদার' অর্থাৎ খাজনা আদায়কারী উপাধিতে ভূষিত করলেন, সঙ্গে দিলেন প্রচুর জমিদারী।

মজমু+আনদার—ফারসী শব্দ

মজমু অর্থ খাজনা, আনদার অর্থ আদায়কারী।[১]

তিন মজুমদারের মধ্যে ভবানন্দ মজুমদার নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর উপর ভবানীর প্রসাদ ভারতচন্দ্রের কাব্যে অনুপম

১. ব্যবহারিক শব্দকোষ—কাজী আবদুল ওদুদ্।

ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এঁদের বংশের ইতিহাস বাঙলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সিরাজকে পরাজিত করবার মূলে এঁর বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন।

জয়ানন্দ মজুমদার হলেন বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন তন্ত্রাভিলাষী। স্বল্পপরিসরে তাঁর কথা বেশি বলা গেল না।

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার মাগুরা, খাসপুর, পাইকান, আনোয়ারপুর, হাবেলিশহর, হাতিয়াগড় এবং কলকাতা পরগণার জমিদার হন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুলাইতে লেখা লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসিডিংস-এ দেখা যায় যে, এ সম্পত্তি সে সময় পর্যন্ত লক্ষ্মীকান্তের বংশধরদের নামেই ছিল। সম্রাটের অনুগ্রহে বাঙালীদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি দূরবিস্তৃত হয়ে পড়ে। অতঃপর এঁরা সাবর্ণ মজুমদার থেকে সাবর্ণ চৌধুরী নামে পরিচিত হয়ে থাকেন।

উইলসনের মতে, কালীমূর্তি প্রথম প্রাপ্ত হন লক্ষ্মীকান্তর এক পূর্ব-পুরুষ, শিশা গাঙ্গুলী। কামদেব ব্রহ্মচারী (জিয়া) কলকাতার কালীকে কিছুদিন পুজো করেন। কালীদেবী সে সময়ে কালীঘাটে ছিলেন না, চৌরঙ্গী এবং ভবানীপুর হয়ে তিনি কালীঘাটে এসেছেন। আদিগঙ্গার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মূর্তিও সরে গেছে। উইলসন বলেছেন (আর্লি অ্যানালস) যে, কালিকাদেবীর মন্দিরের উত্তরে 'ফকিরের স্থান' বলে একটি জায়গায় কামদেব ব্রহ্মচারী বাস করতেন। ঐ স্থানে পাঁচটি পবিত্র গাছ ছিল, সেই গাছের নাম থেকেই দুটি স্থানের নাম হয়েছে নিমতলা এবং বটতলা।

লক্ষ্মীকান্ত, ভবানন্দ বা জয়ানন্দ মজুমদারের মতো আরও অনেক মজুমদার ছিলেন মুঘল যুগে। তাঁদের খাজনা আদায়ের কঠোরতার আভাস আজও শিশুছড়ায় মেলে, এই যুগেও শিশুরা দু' হাতের দশ আঙুল মেলে ধরে আবৃত্তি করে :

ইকির-মিকির চামচিকির

চামেকাটা মজুমদার।
ধেয়ে এল দামোদর ॥ ইত্যাদি

কিন্তু এদের মধ্যে এই তিন জমিদারের নাম সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল। এই তিনের মধ্যে আবার লক্ষ্মীকান্তর বংশ প্রাধান্যলাভ করে। কলকাতার আশেপাশের প্রায় সমস্ত স্থানই সাবর্ণ মজুমদারদের বংশের কোন না কোন ঘটনা থেকে এসেছে। যেমন চিত্রেশ্বরীর (কালীর ভিন্ন নাম) মন্দির থেকে নাম হল চিৎপুর। এর ঠিক দক্ষিণে গোবিন্দপুরের নামকরণ হয় বিখ্যাত গোবিন্দঠাকুরের বিগ্রহের নামে। এই গোবিন্দ এখনও শ্যামরায় নাম নিয়ে কালীঘাটে পুজো নিচ্ছেন। প্রতিদিন ছত্র বা আচ্ছাদনের নিম্নে প্রসাদ বিতরণ বা লুঠ হত বলে গ্রামের নাম রূপান্তরিত হল ছত্রনাটে বা সুতানুটিতে। ডালহৌসীর (বর্তমান নাম বি বা দি বাগ) সামনের লালদিঘি, লালবাজার, রাধাবাজার নামগুলিও দেবপূজা বা মজুমদারদের বাৎসরিক দোল উৎসব থেকে আহরিত। শ্যামরায় এবং রাধাঠাকরুনের মন্দিরপ্রাঙ্গণে হোলি উৎসবে রাশি রাশি আবীর বিক্রী হত এই কাচারি দিঘির প্রাঙ্গণে এবং উৎসব উপলক্ষে অস্থায়ী বাজার বসত লালবাজার এবং রাধাবাজারে, এ থেকেই নামগুলির উৎপত্তি। চৌরঙ্গী নামটির উৎপত্তির কারণ হল, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে সতীর চেরা অঙ্গ এইখানেই পড়েছিল বলে এর নাম হল চেরাঙ্গী বা চৌরঙ্গী। অনেকে বলেন, আসলে চৌরঙ্গী নামকরণ হয় সাধক চৌরঙ্গ স্বামীর নাম থেকে। উইলসন সাহেব বলেছেন, এ মত ঠিক নয়, কারণ চৌরঙ্গ স্বামী যে এখানে এসেছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনি করে মজুমদারদের হাট থেকে হাটখোলা, বারাঠাকুরের (শিব) পুজোর জন্য বারাবাজার প্রভৃতির নাম হয়।

এর পর ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেল। জাহাঙ্গীর গেলেন, শাহজাহান গেলেন, আওরঙ্গজীব এলেন। বিদেশী বণিকেরা এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করতে ভিড় করল। আওরঙ্গজীবের সময়েই শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার

শাসনকর্তা, ইংরেজরা তখন বিতাড়িত হলেন হুগলি থেকে। ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কখনও হিজলিতে, কখনও বালেশ্বরে কখনও-বা সমুদ্রবক্ষে।

এর পর সুবে বাঙলার শাসনকর্তা হয়ে যখন ইব্রাহিম খাঁ এলেন, তিনি আহ্বান করলেন জোব চার্নককে এখানে এসে ব্যবসা করেত। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্টের এক উষ্ণ মধ্যদিনে চার্নক এসে নোঙর করলেন কলকাতায়। এই বছরই বর্তমান কলকাতার জন্ম বৎসর বলে ধরা যায়।

এর পর চার্নক সাহেব মারা গেলেন, তাঁকে সমাহিত করা হল এই কলকাতারই গঙ্গার তীরে। আজও সে সমাধি বিদ্যমান। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ আলমগীরের নাতি আজিমুশ্বান যখন বাংলার শাসনকর্তা, তখন তারই নির্দেশে সাবর্ণ মজুমদাররা ইংরেজদের কাছে কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর বিক্রি করল নামমাত্র টাকায়। এই গ্রামগুলি ছিল সম্রাটের খাস জমি এবং মজুমদাররা ছিল জিম্মাদার। সুবাদার সাহেব পেলেন ষোল হাজার টাকার উপহার। আওরঙ্গজীবের রাজত্বের ৪৪তম বৎসরেই এই গঙ্গার তীরে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। সেদিনের তারিখটি ছিল ১০ই নভেম্বর, ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ। এই দলিলে যাঁরা সই করেছিলেন লক্ষ্মীকান্তর সেইসব ওয়ারিশদের নাম হল মনোহর দেও (দত্ত), পিতা বাসদেও, পিতা রঘু; রামচাঁদ, পিতা বিদ্যাধর, পিতা জগদীশ; রামভদ্র, পিতা রামদেও, পিতা কেশু; প্রাণ, পিতা কালেশ্বর, পিতা গৌরী; এবং মনোহর পিং গন্ধর্ব পিং……।

তারপরের ইতিহাস হল কলকাতার খ্যাতিলাভ এবং কালীঘাটের পীঠস্থান বলে স্বীকৃতিলাভ এবং বাঙালীদের ধর্মের ক্ষেত্রে কালিকাদেবীর মহাপ্রবেশ। কিন্তু যে মজুমদাররা কালীর মহিমা প্রচার করলেন, তাঁদের নাম লোকে ভুলে গেল। দেবী অমর হলেন, আর ভক্তরা হারিয়ে গেল বিস্মৃতির কোন্ অতল তলে।

সেই আশ্চর্য দলিলটি

কত বিজ্ঞাপনই তো পত্রিকায় আমরা পাঠ করি, কিন্তু হঠাৎ যদি এই মর্মে কোন বিজ্ঞাপন দৈনিক পত্রিকার স্তম্ভে দেখি : ডালহৌসী স্কোয়ারে দু' বিঘে জমি কিনতে চাই, দু' হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্য দিতে রাজি আছি। নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন। তাহলে মনোভাব কি রকম দাঁড়াবে? ভদ্রলোক এত সস্তায় জমি কিনতে চাইছেন বলে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগবে। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, ডালহৌসী, ফোর্ট উইলিয়ামের মাঠ, স্ট্র্যাণ্ড রোড, চৌরঙ্গী প্রভৃতি সহ খোদ কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটী নামে তিনটি প্রকাণ্ড মৌজাই বিক্রি হয়ে গেল মাত্র তেরোশত টাকায়, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে।

বিক্রি করলেন সম্রাট আওরংজীবের নাতি আজিমুশ্বানের আদেশে কলকাতার সাবর্ণ মজুমদাররা, আর কিনলেন ইংরেজ কোম্পানি। সেইসঙ্গেই বিক্রি হয়ে গেল সমস্ত ভারত সাম্রাজ্য মাত্র এক সহস্র তিন শত মুদ্রায়। তারিখটি হল হিজরি ১১১০ জামাদি মাসের ১০ তারিখ, ইংরেজি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নবেম্বর—সম্রাট আলমগীরের 'গৌরবময় রাজত্বের' ৪৪তম বৎসর। পৃথিবীতে এমন নজির আর আছে কিনা জানা নেই, সম্ভবত নেই। মূল দলিলটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। [দলিল নং ৩৯, পাণ্ডুলিপির ক্রমিক সংখ্যা ২৪০৩৯] ডব্লু আরভিলের কল্যাণে এর অনুবাদটি ইংরেজি ভাষায় আমরা পাই এবং উইলসন তাঁর 'ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম' পুস্তকে অনুবাদটি উদ্ধৃত করেছেন। এর মোটামুটি বাংলা অনুবাদ তুলে দিলাম।

সেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করবার পথ খুব সুগম ছিল না। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় একটি কোম্পানী ভারতে

ব্যবসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশে এবং ভারতে ঝগড়া বেধে গেল। কলকাতা যেদিন কেনা হল তার মাত্র এক মাস পরে সম্রাট উইলিয়ামের আদেশে, উইলিয়াম নরিস নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজদূত হয়ে ভারতে রওনা হন। সম্রাট আওরঙ্গজীব তখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের পানহালা দুর্গ অবরোধে ব্যস্ত। সেখানে দরবার করে তিনি কোন ফরমান আদায় করতে পারলেন না, কারণ, সেদিন ইংরেজ জলদস্যু মক্কাগামী মুঘল জাহাজ লুট করত, আলমগীর চেয়েছিলেন তার প্রতিবিধান সম্পর্কে গ্যারাণ্টি, নরিস সে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। তাই এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে গেল। এরপর অবশ্য দুই কোম্পানীর ঝগড়া মিটে যায় এক হয়ে গিয়ে, তাদের ব্যবসারও উন্নতি হতে থাকে। সে কথা এখানে আলোচ্য নয়, সে আর এক ইতিহাস। ইংরেজরা এদেশে আসে সবচেয়ে শেষে। সর্বপ্রথম অতিথি হল পর্তুগীজ। কলকাতা এবং সুন্দরবনের তখনকার মালিক ছিলেন যশোরের প্রতাপাদিত্য। প্রতাপের নৌবাহিনীতে অনেক পর্তুগীজ সৈন্যছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নৌ-সেনাপতি রডা। কলকাতার কাছাকাছি এবং সুন্দরবনে নদী বরাবর প্রতাপের অনেকগুলি মাটির কেল্লা ছিল, যেমন মাতলা, রায়গড় (গার্ডেনরীচ) বেহালা, তাল্লা (শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন), শালাকয়া, চিৎপুর, আঁটপুর (মূলাজোড়ের কাছে)। এগুলি মাটির হলেও স্থানের গুরুত্বের জন্য এদের মূল্য ছিল অসাম।

ঠিক এই সময় কিংবা কিছু আগে থেকে নদীয়ার নদীগুলিতে চর পড়তে শুরু করে এবং সাতগাঁও বন্দরের কাছে, হালিশহরে নদীবক্ষে, ত্রিবেণীর বিপরীত দিকে বিরাট এক চর দেখা দেয়। এই চরের এবং নদীর ছবি তৎকালীন ডি ব্যারোস এবং ভ্যানডেন ব্রুকের (১৬৬৯ খ্রীঃ) মানচিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। ফলে যমুনা এবং সরস্বতী অপ্রশস্ত খালে পরিণত হল। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান বন্দর সাতগাঁও সামান্য

গ্রামে পরিণত হয়ে গেল। এদিকে আদিগঙ্গার মুখেও চর পড়ে আদি-গঙ্গা শুকিয়ে খাল হয়ে গেল। কালীঘাট, ভবানীপুর, আলিপুর প্রভৃতি নতুন গ্রাম চরের উপর সৃষ্টি হল। আদিগঙ্গার চর থেকে উদ্ভূত অধিকাংশ অংশ খাসপুর পরগনা নামে অভিহিত হল।

প্রতাপের পরাজয়ের পর পর্তুগীজ এবং আর্মেনিয়ান সৈন্যরা জায়গা জমি নিয়ে চাষে মন দেয়। অনেকে আবার লক্ষ্মীকান্তর জমিদারীতে এসে বসবাস শুরু করল। হালিশহর, নিমতা, যশোর থেকে ব্রাহ্মণ এসে এবং সাতগাঁও থেকে ব্যবসাবাণিজ্য সরে এসে কলকাতাকে বিশিষ্টতা দান করে।

সাতগাঁওর যৌবনে বেতোর ছিল এই বন্দরের দরজা। ১৫৩০—১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ নৌবহর এখানে ভিড় করত। ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই সাতগাঁওর অবস্থা বুঝে পর্তুগীজরা হুগলিতে আড্ডা গড়ে তোলে এবং দিল্লিশ্বরের আদেশে উনষাট বছর পরে সেখানে তারা দুর্গ এবং গির্জা নির্মাণ করে।

১৬২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্তুগীজ এবং ডাচরা চুঁচুড়ার কাছে কুঠি নির্মাণ করে জোর ব্যবসা শুরু করে দেয়, এর আট বছর পরে ইংরেজরা উড়িষ্যায় আগমন করে। হরিশপুর এবং বালেশ্বরে তাদের কুঠি নির্মিত হল। তারপর ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে গ্যাব্রিয়েল বাউটন শাজাহান কন্যাকে আরোগ্য করে বাণিজ্যিক সুবিধে আদায় করে নেন, সেকথা সর্বজন-বিদিত। ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে হুগলিতে প্রথম ইংরেজকুঠি স্থাপিত হল এবং কাশিমবাজারে, পাটনায়, বালেশ্বরে তিনটি এজেন্সি রইল। কাশিম-বাজারেই বর্তমান কলকাতার জনক জোব চার্নক একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে এলেন।

জোব চার্নক ছিলেন প্রতিভাবান ধুরন্ধর ব্যক্তি। ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাঙলায় ইংরেজদের বিপন্ন অস্তিত্বকে তিনিই কঠিন সংগ্রাম করে ঠেকিয়ে রাখেন, নইলে ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন কল্পনায়ও

আনা যেত না। ভারতে এসে তিনি স্থানীয় উকিল, ভৃত্য প্রভৃতিদের কাছ থেকে খবর নিয়ে, এদেশের মুঘল শাসনের ত্রুটিবিচ্যুতি, কেন এত ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতা, সৈন্যদের শক্তির পরিমাপ কত, এ সমস্ত লক্ষ্য করতে ভুললেন না। ঠিক এই সময় ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে শাজাহানের পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে গেল। ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৎসর এটি, কারণ এই বছরে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ এবং ইংরেজ শাসনের সূচনার বীজ একইসঙ্গে রোপিত হয়। সেদিন একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।

সত্যিকারের মুঘল বংশের পতন আওরঙজীবের সময় থেকেই শুরু হয়। যে ঘুষ প্রথার সাহায্যে আওরঙ্গজীব পিতা এবং ভাইদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন, সেই ঘুষই সমগ্র মুঘল শাসনের কাঠামোকে জরাজীর্ণ করে ফেলে। দিল্লির ফরমান এবং নিশান থাকা সত্ত্বেও সুবে বাঙলার শাসনকর্তারা যখন তখন ইংরেজদের নৌকা থামিয়ে টাকা আদায় করতেন এবং উৎকোচ দাবি করতেন অথবা না দিলে তাদের বন্দী করে ফেলতেন। সকলেই টাকা চায়, দিলে আরও দাও। ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে চার্নক হুগলি লুণ্ঠন করেন। ফল হল এই ইংরেজদের শায়েস্তা খাঁর রোষানলে পড়ে, হুগলি ত্যাগ করতে হল। তাড়া খেয়ে চার্নক সুতানুটিতে এলেন এবং বারো দফা এক ক্ষতিপূরণের খসড়া করে নবাবের কাছে প্রেরণ করলেন। আঙুলকাটা শায়েস্তা খাঁ সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইংরেজদের এ মুলুক থেকে বার করতে আদেশ দিলেন। পড়ে মার খাওয়ার জাত ইংরেজ নয়—তারা সম্রাটের নুন তৈরির কারখানা ধ্বংস করে—গঙ্গাপারের তাম্মার কেল্লা উড়িয়ে দিল। সেখান থেকে বালেশ্বর লুণ্ঠন করে হিজলি অবরোধ করে বসে রইল। নবাব-সৈন্য ইংরেজদের আক্রমণ করলেও তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। অবশেষে তিন মাস পরে সন্ধির কথা উঠল। নবাব জানালেন, যা করেছ বাপু বেশ করেছ, এরপর এরকম করলে ভাল হবে না। যাও উলুবেড়িয়া

গিয়ে ভালভাবে ব্যবসা কর। কিন্তু অত সহজে অপমান ভুলবার পাত্র চার্নক নন। শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ইংরেজদের তখন ছিল না, তাঁরা নবাবকে জানালেন যে, আগে আমাদের দাবিগুলি মেনে নাও তারপর কোথায় বসব দেখা যাবে। এসময়ে বর্ষাটা কাটাতে তিনি দ্বিতীয়বার সুতানুটি এলেন।

কিন্তু এখানে আসবার এক বছরের মধ্যেই কোম্পানির ডিরেক্টররা তাঁকে সরিয়ে ক্যাপ্টেন হিথ্‌কে কোম্পানির প্রধান করে পাঠালেন। হিথ্‌সাহেবের কার্যকাল স্বল্প হলেও তিনি খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। বাঙলা পরিত্যাগ করে তিনি চট্টগ্রাম আক্রমণ করলেন এবং কোম্পানির ব্যবসার অবস্থা সঙ্গীন করে তুললেন। সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে শায়েস্তা খাঁর পরিবর্তে নবাব হন ইব্রাহিম খাঁ (অল্প সময়ের জন্য বাহাদুর খাঁ মাঝে নবাব ছিলেন)। দিল্লি থেকে আওরঙ্গজীব জানালেন ইংরেজদের সঙ্গে আর দুর্ব্যবহার নয়। জলপথে ইংরেজ দস্যুরা মোগল জাহাজ আক্রমণ করলেও ওদের ব্যবসার ফলে রাজকোষে তো কিছু আয় হচ্ছে। ওদের শান্তিতে বসবাস করতে দাও। ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদের আহ্বান করলেন বাঙলায় আসবার জন্য। অনেক ইতস্তত করে ইংরেজরা সুতানুটিতে এলেন, এবার চার্নক তাদের প্রধান হয়ে আগমন করলেন। সেদিনটা ছিল ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্টের মধ্যাহ্ন। জঙ্গলময় কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুরে সেদিন একটাও পাকাবাড়ি ছিল না কয়েকটা কাঁচা বাড়ি আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাঁরা এসে নামলেন। বর্তমান কলকাতার জন্ম হল।

এরপর ১৬৯৩ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারি চার্নক কলকাতায় মারা যান। তাঁর সমাধিটি হেস্টিংস স্ট্রীটের সেণ্ট জন চার্চের নিভৃতে সমাহিত আছে। ঐ সমাধি মন্দিরে তিনি একক শায়িত নন—আরও কবর ওখানে পরে খনিত হয়েছে। তবে ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দের এই সমাধি মন্দিরটিই কলকাতার প্রথম ইটের ইমারত—এর গঠনে এদেশী মুঘল

কায়দাই পরিলক্ষিত হয়।

এর পর কোম্পানির কর্মকর্তা যিনি হলেন তার নাম জন গোল্ডস্‌বরো, কিন্তু ঐ বছরই নভেম্বরে তিনি কলকাতার মাটিতে চোখ বুজলেন। কোম্পানির এজেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন মিঃ আয়ার, এঁর সময়েই কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ক্রয় করে কোম্পানী নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন বাঙলার মাটিতে। এই গ্রাম তিনটি ছিল বাদশার খালসা অর্থাৎ খাসজমির মধ্যে। জিম্মাদার বা জমিদার ছিলেন সাবর্ণ মজুমদারের ওয়ারিশরা। সময়টা হল ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ। যোগাযোগ ঘটালেন হুগলির প্রাক্তন গভর্নর জৈনদ্দিন খাঁ বা জুদি খাঁ। রাজমহলে সম্রাটের নাতির কাছে ইংরেজ দলের ডেপুটেশনের নেতা হয়ে গেলেন মিঃ ওয়ালস্‌। নজরানা দেওয়া হল ষোল হাজার টাকা এবং পরিবর্তে বন্ধুস্থানীয় আর্মেনিয়ান খোঁজা সারহুদের হাত দিয়ে জমিদারি কিনবার আদেশ পেলেন ইংরেজরা। সাবর্ণ মজুমদারদের ওয়ারিশরা এ বছরেই ১০ই নভেম্বর দলিলটি সম্পাদন করে দিলেন। কাজীর সীলমোহর ও জমিদারদের সইযুক্ত দলিলের বয়ান মোটামুটি ছিল নিম্নরূপ :

"আমরা ইসলামের অনুগত হিসাবে আমাদের নাম এবং পরিচয় ঘোষণা করিতেছি, যথা মনোহর দত্ত পিতা বাসদেও পিতা রঘু, রামচাঁদ পিং বিদ্যাধর পিং জগদীশ, এবং রামভদ্র পিং রামদেও পিং কেশু এবং প্রাণ পিং কালেশ্বর পিং গৌরী এবং মনোহর পিং গন্ধর্ব পিং……, আইন অনুসারে ক্ষমতাবান থাকায় এবং আইন প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী থাকায়, প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিম্নরূপ ঘোষণা করিতেছি। আমরা যুক্তভাবে আমিরাবাদ পরগনার মধ্যে মৌজা ডিহি-কলিকাতা, সুতানুটি, পরগনা পাইকান এবং কলিকাতার মধ্যে মৌজা গোবিন্দপুর, খাজনা, পতিত জমি, পুকুর, বাগান, মাছ ধরিবার স্বত্ব, বন, স্থানীয় কারিগরদের বকেয়া খাজানা এবং প্রচলিত সীমানা—সরহদ্দসহ জমি

আমাদের মালিকানাভুক্ত ও দখলি জমি হওয়ায়, (হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত উহা কার্যত এবং আইনত বিরুদ্ধস্বত্বমুক্ত এবং হস্তান্তর বিরোধী মামলা-মোকর্দমা বর্জিত) উহা অন্তঃ ও বহিস্থ সকল স্বত্ব এবং তদীয় অনুষঙ্গাদি সহ বর্তমান চলিত এক সহস্র তিন শত মুদ্রার বিনিময়ে ইংরাজ কোম্পানিকে হস্তান্তর করিলাম ; উক্ত ক্রয়মূল্য ক্রেতাদের নিকট হইতে বুঝিয়া পাইলাম,-এবং আমরা কোনরকম ভূয়া দাবী অন্তর্ভুক্ত করি নাই এবং আমরা জামিনদার হিসাবে বলিতেছি যে, যদি ঘটনাক্রমে কোন ব্যক্তি উক্ত সীমানার মালিক হিসাবে কোনরূপ দাবি উপস্থিত করে তাহা হইলে আমরা ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিব। এখন হইতে আমরা বা আমাদের কোন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ কোন প্রকারে উক্ত সীমানাভুক্ত জমির দাবি-দাওয়া করিতে পারিবেন না বা উহার কোন মামলার খরচ ইংরাজ কোম্পানির উপর বর্তাইবে না। প্রয়োজনবোধে যাহাতে এই দলিল প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে সেইজন্য উপরোক্ত শর্তগুলি লিখিয়া দিলাম।"

হিজরী ১১১০ বৎসরের জামাদি মাসের ১৫ তারিখে এবং সম্রাটের পূর্ণ গৌরব ও ঐশ্বর্যময় শাসনের ৪৪তম বৎসরে লিখিত দলিলটির বিশেষত্ব হল এতে তপশিল বা দাগ বলে কিছু নেই। তখন অবশ্য মৌজা ম্যাপ এবং প্লট বলে কিছু ছিল না। দলিলে গন্ধর্বের নামের পরে ফাঁকা স্থানটি সম্ভবত 'অনুরূপ' কথাটি বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ মনোহর সিং পিং গন্ধর্ব পিং গৌরী হবে। দলিলে গন্ধর্ব নামটি 'দেও' বা 'দেব' না হয়ে ভুলক্রমে 'দত্ত' হয়েছে। নামগুলি অবাঙালী রকমের হওয়ার কারণ, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারদের ওয়ারিসরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং উপাধির তেমন কড়া ব্যবহার সেদিন ছিল না।

প্রথমদিকে খাজনা ছিল নিম্নরূপ :

ডিহি কলিকাতা	৪৬৮॥/৯ পাই
সুতানুটি	৫০১৸৶৬ পাই
পাইকান পরগনার গোবিন্দপুর	১২৫৸৶৩ পাই
ঐ কলিকাতা মৌজা	১০০।/১১ পাই
তিনটি মৌজার মোট খাজনা	১,১৯৪৸৵৫ পাই

পাইকান পরগনার গোবিন্দপুর মৌজার খাজনা শীঘ্রই বর্ধিত হয়ে ২১০॥/. হল, তখন মোট খাজনার পরিমাণ দাঁড়াল ১২৮১॥২ এবং বছরে এই খাজনা তিনবারে পরিশোধ্য, ১লা এপ্রিল, আগস্ট, ডিসেম্বর। এই ঐতিহাসিক দলিলের পরে ইংরেজরা জমিদার হলেন এবং প্রধানত তিনটি অধিকার লাভ করলেন, প্রথম রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়, দ্বিতীয় পতিত জমির বিলি বন্দোবস্ত করা, তৃতীয় ছোটখাট ট্যাক্স ধার্য করা। কোম্পানির কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত হলেন, তিনি হলেন জমিদার বা কালেক্টর। প্রথম কালেক্টর হলেন র‍্যালফ শেলডম, ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে। কালেক্টর কথার উৎপত্তি লক্ষণীয়। সেই থেকে কলকাতায় 'কালেক্টর' নিয়োগের ধারা আজও অব্যাহত।

ঐ দলিলের ক্ষমতায় ইংরেজরা ভারতে পা রাখার মাটি পেল, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালভাবে শুরু হয়ে গেল। তারপর? তারপর বঙ্গ-প্রান্তে ভাগীরথীর তীরে তীরে এই তিনটি অখ্যাত মৌজাই ক্রমে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল, এর চেয়ে তাজ্জব বাত্ আর কি থাকতে পারে। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগের এই দলিল-খানা তাই তিনটি মৌজা ক্রয়ের দলিল শুধু নয় একটি সাম্রাজ্যক্রয়ের দলিলও বটে—তা-ও মাত্র তেরোশত টাকায়। এই দলিলটি তাই শুধু দলিল নয়, এ এক ইতিহাস—জাতির পরাধীনতার ইতিহাস।

ভারতবর্ষের প্রথম নদী জরীপ

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার কথা মনে হলেই, মনে আসে গভীর দুর্গম অরণ্য, যানবাহনহীন পথের বিভীষিকা, তার মধ্যে ডাকাত, চোর, সন্ন্যাসী-ফকিরদের অত্যাচার, ঠ্যাঙাড়েদের নির্মমতা এইসব। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসন দেশে তখনও ভাল করে কায়েম হয়নি, ইংরেজদের ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান শক্তি এবং ক্রমবর্ধমান মারাঠা শক্তির সঙ্গে পদে পদে বলপরীক্ষা দিয়ে চলতে হচ্ছে। এমনি দিনেই ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান বাঙলা, (বর্তমান বাংলাদেশ সহ) বিহার এবং আসামের নদী-গুলির গতিপথ এবং অন্যান্য মানচিত্র অঙ্কন করেন জেমস্ রেনেল।*

সমস্ত জগতের জরীপবিদদের কাছে জেমস্ রেনেল নাম একটি অবাক বিস্ময়। তাঁর অক্লান্ত কর্মক্ষমতা, বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করার মনোবল আজও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। লর্ড ক্লাইভ যদি ভারতে ইংরেজ রাজত্ব পত্তন করে থাকেন, ওয়ারেন হেস্টিংস্ যদি সেই রাজত্ব সংহত করে থাকেন, তবে জেমস রেনেল সেই রাজত্বের মানচিত্র তৈরি করে নদী খাল প্রভৃতির গতিপথ নির্ণয় করে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য, রণজয়ের, অভ্যন্তরীণ শাসনের পথ মসৃণ করে দিয়ে গেছেন। অথচ তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর—যে বয়সে যুবকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাই ভাল করে সাঙ্গ হয় না।

ইংরেজী ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বরে জেমস্ রেনেল ইংলণ্ডের

---

* James Rennel (1767 AD—1777 AD), পরবর্তী কয়েকজন সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন, Tomas Call 1777-86 AD, Mark Wood 1786-88 AD, Alexander Kid 1788-94 AD, Robert Hite Cole-ᄀke 1794—1808 AD, John Garstine 1808—1813 AD, 1ও:s Crawfford 1813—1815 AD ইত্যাদি।

চাড্‌লে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন জন রেনেল, গোলন্দাজ-বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। জেমসের বয়স যখন মাত্র চার বৎসর সাত মাস তখন তাঁর পিতা সম্মুখযুদ্ধে মারা যান। সেই দুর্ঘটনা থেকেই দুর্ভাগ্যের শুরু এবং আমৃত্যু এই দুর্ঘটনা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ছোট-বেলায় মা এবং বোনের কাছেই তাঁর কিছুদিন দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে, তারপর গিলবার্ট ব্যারিংটন নামে এক সদাশয় ভদ্রলোকের কাছে তাঁর কৈশোর অতিবাহিত হয়। সেই শৈশবেই রেনেলের বিধিদত্ত প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল, জরীপের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আকর্ষণে।

মাত্র বারো বছর বয়সে রেনেল চাড্‌লে গ্রামের একটি মানচিত্র তৈরি করে ফেলেন। রেনেলের যখন চৌদ্দ বছর বয়েস তখন সুযোগ বুঝে একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের চাকর হয়ে অনন্ত সমুদ্রে ভেসে পড়লেন। সেখান থেকে রেনেল মেরিন-সার্ভে বা সামুদ্রিক জরীপ শিখতে আরম্ভ করেন এবং সে শিক্ষা যে ভালই হয়েছিল, তা তাঁর পরবর্তী জীবন থেকেই জানা যায়। নৌ-জাহাজে নানারকম উত্থানপতনের পর রেনেল ১৭৫১ সনে 'আমেরিকা' নামক জাহাজে চড়ে ভারতের দিকে পাড়ি জমালেন।

বাঙলা তখন সবে ইংরেজদের হাতে এসেছে—এর ঐশ্বর্য, এর প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগ্যান্বেষী ব্রিটিশদের কাছে এক অভূতপূর্ব সুযোগ বলে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং এ এক মহাসুযোগ রেনেলের কাছে। ভারতবর্ষে এসে তাঁর পদোন্নতি হলেও কয়েকবার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর রেনেল ১৭৬৩ সনে নেপচুন নামে জাহাজের অধিনায়ক হয়ে কলকাতায় এলেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র একুশ কিন্তু অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড চাপে মনে তাঁর হীরকের ঔজ্জ্বল্য এবং কাঠিন্য দানা বেঁধেছে।

এই সময় ১৭৬৪ খ্রীঃ রেনেল জমি জরীপের কাজে নিযুক্ত হন এবং ঠিক এই বছরই জেমস রেনেল ফোর্ট উইলিয়মের মহামান্য

ভ্যান্সিটার্টের কাছ থেকে বাঙলার সার্ভেয়ার জেনারেল নিযুক্ত হন। এরপর ১৭৬৭ খ্রীঃ রেনেল ভারতবর্ষের সার্ভেয়ার জেনারেল রূপে মনোনীত হন।* গভর্নরের কাছ থেকে তিনি প্রথম আদেশই পান জলঙ্গীর মাথা থেকে গঙ্গা এবং মেঘনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ তীর জরীপ করতে হবে। গঙ্গা এখানে পদ্মা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হল গঙ্গা বা পদ্মা থেকে এমন একটি নৌ-পথ বার করতে হবে যাতে সমস্ত ঋতুতেই নৌকা চলাচল করে। এরপর তিনি পদ্মা বা গঙ্গার বাম তীরও জরীপ করবার অনুমতি পান। তাঁর কার্যের পরিধি পরে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত করা হল।

রেনেল যে মানচিত্র রচনা করে গেছেন, সেগুলিকে তাঁর ভাষায় নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, (১) একস্যাক্ট সার্ভে, (২) কার্সারি সার্ভে, (৩) স্কেচ্, (৪) প্ল্যান, (৫) ম্যাপ এবং (৬) জেনারেল ম্যাপ। একস্যাক্ট সার্ভে হল অত্যন্ত নিখুঁত এবং নির্ভুল কাজ, কার্সারি সার্ভের বিশুদ্ধতার মান হল আর একটু নীচু। স্কেচ হল চোখের দৃষ্টিতে আঁকা এবং একটা আসন্নমান পর্যন্ত এ ম্যাপ বিশুদ্ধ; প্ল্যান হল, যেমন, কোন খালের দৈর্ঘ্য, ফোর্ট বা মন্দিরের চেহারা অঙ্কন। জেনারেল ম্যাপ বলতে রেনেল বড় ম্যাপ থেকে সদাসর্বদা ব্যবহারের জন্য রূপান্তরিত ছোট মানচিত্রকে বুঝিয়েছেন।

রেনেল একস্যাক্ট সার্ভেতে গঙ্গার প্রধান ধারা এবং মেন্দিগঞ্জ নদী জলঙ্গী থেকে শুরু করে লক্ষ্মীপুরের নিকট মেঘনা পর্যন্ত এঁকেছিলেন।

---

* James Rennel appointed as Surveyor Geneal on January 8th 1767, with the rank of captain and a salary of Rs 300/- Per month.—Selection form Unpublished Record of Government : Revd. J. Long, Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1969.

সেদিন রেনেল সাহেব মোট ষোলটি ম্যাপ তৈরি করেছিলেন, তার মধ্যে তিনটি হারিয়ে গেছে, বাকি তেরোটি ইণ্ডিয়া অফিসে জমা আছে। রেনেলের ভাষায় বলতে গেলে, "স্কেল চার ইঞ্চি = সামুদ্রিক এক মাইল, অথবা ম্যাপের এক ইঞ্চি = জমির পাঁচশত গজ।" এতে অনুমান করা যায় যে, রেনেল বাল্য এবং যৌবনে নৌ-জরীপ বা সমুদ্র জরীপ সম্পর্কে যে শিক্ষালাভ করেছেন, সে জ্ঞান নদী জরীপ এবং ভূমি জরীপে লাগিয়ে দিয়েছেন।

সে কথা এখন থাক। রেনেল সাহেব কাজ আরম্ভ করেছিলেন ২১শে মার্চ ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে। সে সময়ে দেশে ফকির এবং সন্ন্যাসীদের খুব অত্যাচার, রেনেল সাহেব তাদের দৌরাত্ম্যে একবার আহতও হয়েছিলেন। তা ছাড়া দেশে তখন সাপ, বাঘ ডাকাতদের দৌরাত্ম্য তো ছিলই। ২১শে থেকে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত তিনি জলঙ্গী থেকে শুরু করে গঙ্গা বা পদ্মার, দামোদর গ্রাম পর্যন্ত ম্যাপ তৈরি করলেন। তারপর ২৯শে থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত তিনি দামোদর গ্রাম থেকে কুষ্টিয়ার উত্তর পর্যন্ত গঙ্গার মানচিত্র আঁকলেন। বর্ষার রিমিঝিমি শুরু হল কিন্তু পথঘাট তখন পর্যন্ত তেমন খারাপ হয়নি দেখে রেনেল সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে এগিয়ে চললেন। ১লা জুন থেকে ১৭ই জুন পর্যন্ত তিনি কুষ্টিয়ার উত্তর থেকে শুরু করে গুবিকুন্দপুর পর্যন্ত মানচিত্র তৈরি করলেন। আবার ওখান থেকে যাত্রা করে ২১শে জুন পর্যন্ত চরবাঘাট পর্যন্ত গঙ্গার (সব স্থানেই পদ্মাস্থলে ব্যবহৃত) ম্যাপ সৃষ্টি করলেন। দক্ষিণে অবস্থিত মন্দপুরের খাল সাত মাইল পর্যন্ত আঁকা হল। এরপরই বাঙলাদেশের ঘনঘোর বর্ষা শুরু হয়ে পথঘাট অব্যবহার্য হয়ে পড়ল এবং কাজও বন্ধ হয়ে গেল। বর্ষার মাতলামি শেষ হয়ে গেলে, শরতের শুভ্র মেঘ সোনালি রোদ, আর নদীর পারে পারে কাশবন আত্মপ্রকাশ করল। রেনেল সাহেব সেই চরবাঘাট থেকে আবার শুরু করলেন, তারপর গঙ্গা বেয়ে অরিংবেড়ী খালসহ বেতুরি পর্যন্ত মেপে ৮ই অক্টোবর এসে

বেতুরিতে ক্যাম্প করলেন। তাঁর এই মানচিত্রে গঙ্গার উত্তর তীরে রটিনগঞ্জ এবং জাফরাগঞ্জ খাল এবং দক্ষিণ তীরে হেগিয়াগঞ্জ ও বুসতলা খাল অঙ্কিত হল। এই ম্যাপে অঙ্কিত জাফরাগঞ্জ খাল বর্তমান ব্রহ্মপুত্রের (তৎকালীন যমুনা) প্রধান ধারা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অক্টোবরে বেতুরি থেকে মুল্লোপাড়া পর্যন্ত গঙ্গার ধারার মানচিত্র তিনি রচনা করেন, কিন্তু সেটি হারিয়ে যাওয়া মানচিত্র তিনটির মধ্যে প্রথমটি।

২১শে থেকে ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে তিনি মুল্লোপাড়া থেকে মনসুদাবাদ পর্যন্ত ধারার ম্যাপ আঁকলেন, এই মানচিত্রের দক্ষিণে কর্তাখালি ও হেগিয়াগঞ্জ খালও দেখান হল। ঐ অক্টোবরেই রচিত হল মনসুদাবাদ থেকে পাঁচুর পর্যন্ত গঙ্গার মানচিত্র। গঙ্গার উত্তর তীরে ইছামতীর দুই শাখা এবং দক্ষিণে একটি নামহীন খাল অঙ্কিত হল। নদীর ওপর একটি সরললেখা বুন্দারকুল্লা দ্বীপ থেকে দক্ষিণ তীর পর্যন্ত আঁকা আছে। এরই একটি দ্বীপের মানচিত্রে বাঘের গমনাগমনের পথ দেখানো রয়েছে।

এবারে শীত চলে এল, রেনেল সাহেব একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নভেম্বরের পাঁচ তারিখ। তিনি পাঁচুর থেকে শুরু করে গঙ্গানগর দ্বীপ পর্যন্ত জরীপ করলেন। দক্ষিণে আঁকা হল বুদারমন খাল থেকে হাবলিগঞ্জ খালের মানচিত্র। তিনি আরও এগিয়ে চললেন তাঁর জরীপের দলবল নিয়ে বাঙলার পথে পথে, নদীর তীরে তীরে। টিকিয়া দ্বীপ পর্যন্ত গঙ্গার ধারা আঁকা হল, সেই ম্যাপে অন্যান্য খালের সঙ্গে বাখরগঞ্জ খালও অঙ্কিত হল। নভেম্বরের কুড়ি তারিখ থেকে আঠাশ পর্যন্ত কিস্তিমারিয়া অবধি গঙ্গার ধারা অঙ্কন করলেন। এই ম্যাপে দুটি প্যাগোডা দেখানো আছে। এর পরের গঙ্গার ম্যাপের চিত্রটি, হারানো ম্যাপটির দ্বিতীয়টি। এটিতে কিস্তিমারিয়া থেকে সোনাপাড়া পর্যন্ত গঙ্গার তৎকালীন চিত্র অঙ্কিত ছিল। নভেম্বরে তাঁর শেষ কাজ হল চোরমদডাঙ্গা পর্যন্ত গঙ্গার

ধারার মানচিত্র সৃষ্টি করা। ডিসেম্বরে রেনেল সাহেব চোরমদডাঙ্গা থেকে শুরু করে মেন্দিগঞ্জ খালের এক মাইলসহ আসেকুর পর্যন্ত গঙ্গার ম্যাপ রচনা করলেন। এই পর্যন্ত এসে তিনি গঙ্গা বা পদ্মার প্রধান ধারা পরিত্যাগ করলেন এবং মেন্দিগঞ্জ খাল বেয়ে এগিয়ে চললেন। এই ডিসেম্বরেই আসেকুর থেকে কুমারখালি পর্যন্ত জরীপ করলেন তিনি। এরপরে কুমারখালি থেকে মেঘনা নদী পর্যন্ত ম্যাপটি আঁকা হয় এবং এটিই হল গঙ্গা এবং মেন্দিগঞ্জের খালের সিরিজের শেষ ম্যাপ। এটিও হারিয়ে গিয়েছে। রেনেলের সমস্ত কাজের মধ্যে এই গঙ্গার তীরের এবং মেন্দিগঞ্জ খালের ম্যাপ রচনা তাঁর বিশুদ্ধ কাজ-গুলির অন্যতম।

রেনেল সাহেবের উল্লেখযোগ্য পরবর্তী কাজ হল মেন্দিগঞ্জ খাল থেকে মেঘনা নদীর প্রধান শাখা, ইছামতী, ধলেশ্বরী এবং ঢাকা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীর জরীপ করা। এ ব্যাপারে তিনি পাঁচটি ম্যাপ রচনা করেছিলেন এবং এর স্কেল ছিল ম্যাপের দুই ইঞ্চি ভূমির এক মাইল। এই ম্যাপগুলি পূর্ববর্তী ম্যাপগুলি অপেক্ষা আরও নির্ভুল ছিল। এই ম্যাপগুলিতে যথাক্রমে মেঘনা নদীর গতিপথ, মেন্দিগঞ্জ খাল থেকে দয়াখালি, দয়াখালি থেকে সাতুকপুর, সাতুকপুর থেকে ইছামতী, রাজা-বাড়ি, রাজাবাড়ি থেকে ফিরিঙ্গিবাজার এবং ফিরিঙ্গিবাজার থেকে ইছামতী, ধলেশ্বরী নদী দেখিয়ে ঢাকা পর্যন্ত আঁকা হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাতুকপুর থেকে রাজাবাড়ি পর্যন্ত ম্যাপে রেনেল সাহেব যে মন্দির এঁকেছিলেন, সে এখনও তেমনিভাবে রয়েছে।

উপরোক্ত ম্যাপগুলি ছাড়াও রেনেল ছোট নদী এবং খালের অনেক-গুলি ম্যাপ তৈরি করেছিলেন। এগুলি তাঁর ম্যাপের কুড়ি থেকে একত্রিশ নম্বর ম্যাপের মধ্যে পড়বে। তবে এ ম্যাপ রচনাগুলি অসমাপ্ত এবং এর বিশুদ্ধতাও অনেক কম। রেনেলের 'সাধারণ ম্যাপগুলি' নদী জরীপের ম্যাপ থেকে তৈরি। যেমন পাবনা নদী, চন্দনা নদী, কুমার-

খালি নদী প্রভৃতি।

রেনেলের রচিত রাস্তা এবং নদীখালের পথনির্দেশিকা তৎকালীন দেশের, পথের অবস্থার একটি পরিষ্কার চিত্র। যে নদীপথে সব ঋতুতে নৌকা চলে তিনি ম্যাপে সে পথ ক্রমাগত রেখা দিয়ে দেখিয়েছেন; আর যে নদীপথে শুধু বর্ষায় নৌকা চলে, সে পথ ম্যাপে ফুটকি বা ভগ্নরেখা দিয়ে দেখিয়েছেন। এই নদীর পথচিত্রগুলি থেকে দেখা যায় যে, ১ থেকে ১৬৩নং পথ, কলকাতা থেকে আঁকা; ১৬৪ থেকে ২৭৭নং পথ, ঢাকা থেকে আঁকা; ২৭৮ থেকে ৪০১ নং পথ মুর্শিদাবাদ থেকে আঁকা; ৪০২ থেকে ৫১০নং পথ, পাটনা থেকে আঁকা।

রাস্তার যে মানচিত্র তিনি এঁকেছেন, সেগুলি ১৭৭৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। শুধু এইখানেই রেনেলের কর্মসমাপ্তি নয়। তিনি অনেকগুলি ইনডেক্স ম্যাপও (**Index Map**) সৃষ্টি করেন। পূর্বে সিলেট থেকে পশ্চিমে বক্সার এবং উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপ-সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার এক ম্যাপ তিনি আঁকেন। এরপর বাঙলা-বিহারের একটি টপগ্রাফিক্যাল ম্যাপ করে ওয়ারেন হেস্টিংসের নামে উৎসর্গ করেন। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদের এবং পলাশীর যুদ্ধের নকশা তৈরি করে তিনি লর্ড ক্লাইভের নামে উৎসর্গ করেন। অন্যান্য ম্যাপের মধ্যে ঢাকার চতুর্দিকের ম্যাপ, উত্তর সুন্দরবনের ম্যাপ (হরিণঘাটা নদীর পশ্চিমাংশ); যুদ্ধপূর্ব উধুয়ানালার প্ল্যান, দখলের পরের চুনারের দুর্গের প্ল্যান প্রভৃতি।

স্বল্পপরিসরে জেমস রেনেলের কার্যকলাপ আলোচনা করা গেল। তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানবার উপায় হল, তাঁরই রচিত জার্নাল (১৭৬৪-'৬৭), মালা টাচের রেনেলের ডায়েরীর ভূমিকায় মতামত, আত্মজীবনী এবং রেনেলের ম্যাপসমূহ।

এই জরীপ কর্মের অবসরে তিনি ১৭৭২ খ্রীঃ ১৫ই অক্টোবর শরতের এক মনোরম সন্ধ্যায় ডোন থ্যাকি নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন।

রেনেলের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত মধুর এবং সুখের ছিল। ১৭৭৭ খ্রীঃ জেমস রেনেল সস্ত্রীক ইংলণ্ডে ফিরে যান এবং পরবর্তীজীবনে তিনি একজন নামকরা ভৌগোলিক হিসেবে পরিচিত হন। এর চার বছর পরে রয়াল সোসাইটি তাঁকে সভ্য মনোনীত করেন এবং আরও আট বছর পরে আফ্রিকান অ্যাসোসিয়েশনও তাঁকে সভ্য মনোনীত করে সম্মানিত করেন। রেনেলের নাম আজ পৃথিবীখ্যাত, সিসিলি দ্বীপের পাহাড়ের সারি ছাড়িয়ে আফ্রিকার একটি সাম্প্রতিক স্রোতের নাম এবং সুমেরু প্রদেশের একটি অন্তরীপের নাম রেনেলের নামে নামকরণ করা হয়। কিন্তু যে ভারতবর্ষের সজল নদী এবং রৌদ্রময় আকাশের নীচে তিনি প্রথম সাফল্যের স্বর্ণকিরণ দেখেন, সেখানে তাঁর কোন স্মৃতিচিহ্নই নেই।

লর্ড ক্লাইভের জমিদারি

ইংলণ্ডেশ্বর যখন ক্লাইভকে ভারতবর্ষে প্রশংসনীয় কার্যের জন্য (Meritorius Service) লর্ড অব্ পলাশী উপাধি দিয়েছিলেন, তখন তিনি নাকি সখেদে বলেছিলেন, লর্ড উপাধি আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম নবাব হতে।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষে ক্লাইভ মোগল সম্রাটের ওমরাহ হয়েছিলেন, পাঁচহাজারি ছ'হাজারি মনসব্দার। আর ওমরাহর ঠাট বজায় রাখার জন্য তাঁকে কলকাতা আর ২৪ পরগনার জমিদারি দেওয়া হয়েছিল।

ক্লাইভের মেরিটোরিয়াস্ সার্ভিস বলতে হয়তো ইংরেজ সরকার বুঝিয়েছিলেন মীরজাফরের মতো সমর্থ বেইমান খুঁজে বার করে বাঙলা-দেশ জয় করা।

কিন্তু নবাব হবার খেয়াল কেন ক্লাইভের চাপল? শুনেছি তিনি নাকি সখেদে বলেছিলেন, নবাবের কি দারুণ মেজাজ, যার জন্য সিরাজ জুতো পরিয়ে দেবার লোকের অভাবে প্রাণটাই দিয়ে দিলো।

ভারতবর্ষে ক্লাইভ সবকিছুই তো পেয়েছিলেন, সম্মান, কামিনী, কাঞ্চন, ক্ষমতা। আর সিরাজের সমস্ত রত্নভাণ্ডারইতো তাঁর হাতে পড়েছিল। শুধু মেজাজটি ইংরেজদের মধ্যে দেখান চলত না। সে যুগেই সিরাজের মেজাজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। আজও লোকে কারুর বিলাসিতা আর মেজাজ দেখলে বলে, ব্যাটা যেন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা! এটা হল খাঁটি আভিজাত্যের অবদান, ব্যবসায়ী কোম্পানির কেরানি তা পাবেন কোথা থেকে?

ওসব কথা থাক। দিল্লির বাদশা দ্বিতীয় আলমগীর কেন ক্লাইভকে ওমরাহ করতে চেয়েছিলেন? এর কারণ, সম্রাটের বিদ্রোহী জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম যখন বাঙলা আক্রমণ করেন তখন ক্লাইভ ইংরেজ সৈন্যের

সাহায্যে সে বিদ্রোহ দমন করেন। বাদশা তখন বাঙলার নবাব মীর-জাফরকে আদেশ দিলেন ক্লাইভকে ওমরাহ করা হল। তুমি এখন তাকে জায়গীর দেবার ব্যবস্থা কর যাতে মহব্বতজং ক্লাইভ ওমরাহের মতো খরচ খরচা করতে পারেন (১৩ই জুলাই ১৭৫৯ খ্রীঃ)। সে হবে মুঘল সাম্রাজ্যের একজন ইংরেজ জায়গীরদার। জাবেদাৎ উল্ মুলক্ নসরদ্দৌল্লা সাবেৎ বাহাদুর কর্নেল ক্লাইভ।

মীরজাফরকে বলা হত ক্লাইভ সাহেবের গর্দভ। তাহলেও জমিদারি দেবার ব্যাপারে মীরজাফর সাহেব একটু চালাকি খেলেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে সন্ধির নয়-ধারা অনুসারে যে ২৪টি পরগনা ইংরেজ কোম্পানি লাভ করেছিল তার মালিকানা অর্থাৎ উপরস্থ স্বত্ব লর্ড ক্লাইভকে দেওয়া হল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি খাজনা দেবে ক্লাইভকে। ফল দাঁড়াল এই, লর্ড ক্লাইভ যিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেতনভুক চাকর তিনি আবার হলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জমিদার। মীরজাফর দেখল, এইভাবে নতুন জমি ইংরেজ ওমরাহকে দিতে হচ্ছে না। সাপটিও মরল অথচ লাঠিও ভাঙল না। দিল্লির বাদশার হুকুমও মানা হল, অতিরিক্ত জমিও দিতে হল না।

মীরজাফর সনদ প্রস্তুত করে ক্লাইভকে জমিদার করে তুললেন। ২৪টি পরগনার খাজনা আর কোম্পানিকে মুর্শিদাবাদে জমা দিতে হবে না, ক্লাইভকে দিতে হবে। খাজনার পরিমাণ হল বাৎসরিক ২,১৪,০৪,০৮১ দাম, অথবা ২,২২,৯৫৮ টাকা ১০ আনা। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের আবওয়াব থেকে আদায় হবে ৫,৩৫,১০৫ টাকা।

মুর্শিদাবাদ থেকে ফার্সীতে জায়গীর দানের যে পরওয়ানা বের হল ক্লাইভের হয়ে তার জন্য মুচলেকা দিলেন তাঁর উকীল মহম্মদ আনিস্। ফার্সী পরওয়ানার অনুবাদ আমরা কৌতূহলীদের জন্য তুলে দিলাম। "বাংলা সুবা বা জিন্নতাবাদের সরকার সাতগাঁও ইত্যাদির অধীনে কলিকাতা ইত্যাদির পরগনার চৌধুরী/কানুনগো/মুৎসুদ্দি/রায়ত এবং

কৃষকদের প্রতি নাসির-উল-মূলক আলাউদ্দৌল্লা মীরমহম্মদ সাদিক খান বাহাদুরের শীলমোহরাঙ্কিত পরওয়ানা, যাহা সম্রাটের গৌরবময় জৌলস্‌আলা রাজত্বের ৬ষ্ঠ বৎসরের ৪ঠা শাহী শাবণে জারী করা হইল, তাহারই অনুলিপি।

"সকলে অবগত হউক যে মহামান্য এবং শক্তিশালী সুজাউলমুলক হিসানৌদ্দল্লা মীর মহম্মদ জাফরখাঁ বাহাদুর মহাবৎ জং ও বাংলা সুবার নাজিম, ফর্দ সওয়ালে সই করিবার ফল হিসাবে এবং ফার্দ হাককৎ ও মুচলেকাতে একই সঙ্গে স্বাক্ষর করিবার জন্য (যার বিশদ বিবরণ এই সঙ্গে উল্লেখিত হইল) উপরিউক্ত পরগণাসমূহের খাজনা দুই লক্ষ বাইশ হাজার নয় শত আটান্ন টাকা দশ আনা, বাদশার সনদ প্রাপ্তি ও দৌল প্রস্তুত সাপেক্ষে মহান এবং শক্তিশালী জাবদাৎ-উল-মূলক নসরৌদ্দল্লা কর্ণেল ক্লাইভ সাবেৎ জং বাহাদুরের সর্তহীন বেতন, বাংলা ১১৬৫ সনের রবিশুসকান তারিখ হইতে ধার্য করা হইল। অত্র বর্ণিত পরগণা-সমূহের খাজনা পূর্বোক্ত মহান ও শক্তিশালী ব্যক্তির প্রতিনিধিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

"প্রতিনিধির কর্তব্য হইবে অধিকার অবৈধভাবে ভঙ্গ না করা এবং বিজ্ঞজনোচিত ভদ্র ব্যবহারের সীমা অতিক্রম না করা। প্রতিনিধি তার সদ্ব্যবহার ও দয়ালু কার্যকলাপ দ্বারা রায়তদের সুখী ও সমৃদ্ধশালী রাখার চেষ্টা করিবেন, সর্বরকম চেষ্টা করিবেন যাহাতে রাজস্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ভূমির উৎপাদনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘটে।

"ফার্দ সাওয়াল (দরখাস্ত) গৃহীত এবং মহান ও শক্তিশালী সুজা-উল-মূলক হিসানদ্দৌল্লা মীর মহম্মদ জাফর খাঁন বাহাদুর মহব্বৎ জং জিন্নতাবাদ বাংলা সুবার নাজিমের স্বাক্ষরযুক্ত হওয়ায় সেই সঙ্গে ফার্দ হকিকৎ ও মুচলেকা স্বাক্ষরযুক্ত হওয়ায় সরকার সাতগাঁওর অধীনে কলিকাতা প্রভৃতি পরগনার খালসা সরিফা (সম্রাটের খাস জমি) ও মুর্শিদাবাদ নিজামৎ-এর মুক্ত জায়গীর মহান ও শক্তিশালী জাবাদৎ-

উল-মুলক নসরৌদ্দল্লা মহাবৎ জং বাহাদুর ক্লাইভকে সর্তহীনভাবে জায়গীরদার হিসাবে (সম্রাটের সনদ প্রাপ্তি ও দৌল প্রস্তুত সাপেক্ষে) একসহস্র একশত পয়ষট্টি বাংলা বৎসরের রবিশুসকান তারিখ হইতে প্রদান করা হইল।"

'সনদ প্রদত্ত হউক'

মীরজাফরের এই পরওয়ানা জারি হবার আগেই ক্লাইভের প্রতিনিধি বা উকিলের (মহম্মদ আনিস্) ফার্দ সাওয়াল বা দরখাস্ত জমা পড়েছিল। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে মহম্মদ আনিসকে একটি মুচলেকাও দিতে হয়েছিল। কৌতূহলীরা ফার্দ সাওয়ালের অনুবাদ পড়লে ক্লাইভের জমিদারি এবং তার আয় বুঝতে পারবেন। ফার্দ সাওয়ালের (ক্লাইভের আবেদনপত্র) বাংলা অনুবাদ এখানে করে দেওয়া হল।

"ফার্দ সাওয়াল : ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে মূল্যবান সেবা করার জন্য মহান এবং ক্ষমতাশালী নসরদ্দৌল্লা কর্ণেল ক্লাইভ সাবেৎ জং বাহাদুরকে 'ছয় হাজারী (পদাতিক) পাঁচ হাজারী ঘোড়সোয়ার মনসব' উপাধি দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু একটি জায়গীর ব্যতীত মনসবের উপযুক্ত মর্যাদা এবং অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব নহে, সেইহেতু তিনি প্রার্থনা করিতেছেন যে সম্রাটের সনদ প্রাপ্তি, দৌল ও মুচলেকা অফিসে প্রস্তুত সাপেক্ষে, সরকার সাতগাঁওর অধীনে কলিকাতা প্রভৃতি পরগণার (যাহা খালসা সরিফা ও নিজামতমুক্ত জায়গীরের অধীনে) খাজানা ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৪ হাজার একাশী দাম, যাহা টাকায় ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯৫৮ টাকা ১০ আনা তাহাকে মঞ্জুর করা হউক।

"পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, ছয় হাজার পদাতিক, ২,১৪,০৪,০৮১ দাম।

	টাকা	আনা	গণ্ডা	কড়া
মনসবের জন্য	২২২৯৫৮	১০	০	০
খালসা সরিফা				
থেকে আয়	১৭৮৯৫৪	১৪	৫	০
নিজামতের মুক্ত জায়গীর				
থেকে আদায়	৪৬০০৩	১১	১৫	০
খাসপুর পরগণা (বর্তমান				
টালিগঞ্জ এলাকা)	৬৩৭	০	২	০
মেদনমল্ল	২২১৯৯	৫	৫	০
মাগুরা	২৬৫০৪	১৩	১৫	১
বারহাট্টি	৬১৫৯	৪	১৩	৩
এক্তিয়ারপুর	৭৯২৩	১	৮	০
দক্ষিণ সাগর	৬০	৭	১২	২
শাহনগর	২৮৩	'	১৪	০
আজিমাবাদ	১০,০০০	০	০	০
ঘুর	৭৬২০	৯	১৫	০
মুড়াগাছা	৬১৭৯৩	১০	০	০
পিচ কলি	৬১২৯	৪	১৫	০
খাড়িজুড়ি	৫৬২	৮	০	০
মণিপুর	৯৯৪৭	১০	১	১
নিজতালুক (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর				
জমি)	৮৮৫৬	০	৩	১
তালুক রামকান্ত	৯১	৯	১৮	০
পাইকান	৬৭৮৭	১০	৬	৩
কিস্মেৎ				
হাবেলিশহর	৩২৩	১১	৮	০
মহম্মদ আমিনপুর	১৮৪	৫	১০	০
কিসমেৎ (—) মুন্ ও				
মোম্‌মহল	১৬৭০২	১৩	০	১
হাতিয়াগড়	২২১১৯	৭	১৯	৫
জানিদার				
জায়গীর	৪১৯৯	১৪	১০	০
আকবরপুর				
জায়গীর	২২২৮	১৫	১৫	০
শাহপুর				
খালসা	৩৬৭০	১২	২	২
কিসমেৎ আবওয়াব				
ফৌজদারী	১২০৬	১২	১৮	৩
হাতিয়াগড়-মায়দা-মুড়াগাছা				
(ইফতিয়ারপুর খালসাজমির				
অন্তর্গত)	৪৫০১	০	০	০
কিসমেৎ বা সুন্দরি সরকার				
সেলিমাবাদ				
সরকার	২৭৯১	১১	১২	০
খালসার জমি	২৮১১	০	০	০
নিজামৎ মুক্ত				
জায়গীর	৮৩৮	১৪	১৬	১

"অত্র এই মর্মে আদেশ করা হইতেছে যে প্রথা অনুযায়ী মুচলেকা প্রদানের পর সনদ্ অর্পণ করা হইবে। ফার্দ হকিকৎ-এ যে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে এবং মহান ও শক্তিশালী সুজাউল মুলক্ হিসামদ্দৌল্লা মীর মহম্মদ জাফর খাঁন বাহাদুর মহব্বৎ জং এবং বাংলা সুবার নাজিমের স্বাক্ষরের পর গৃহীত হওয়ায় খালসা সরিফা ও নিজামৎমুক্ত জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত সরকার সাতগাঁওর অধীনে কলিকাতা প্রভৃতি মহলের খাজনা

হইতে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯ শত পঞ্চাশ টাকা ১০ আনা (এখানে নকল করিতে ভুল করা হয়েছে, হবে নয় শত আটান্ন টাকা) বিনা সর্তে জায়গীর হিসাবে শক্তিশালী এবং মহান উজির উল মূলক নসরৌদ্দল্লা সাবেৎ জং বাহাদুরকে মঞ্জুর করা হইল।

"মহান শক্তিশালী ক্লাইভের প্রতিনিধি মহম্মদ আনিস যথাবিহিত সম্মানপূর্বক জানাইতেছে যে মুচলেকা, রাজকীয় সনদ এবং দৌল প্রথা অনুসারে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত করা হইবে এবং প্রার্থনা জানান যাইতেছে যে তাহাকে (ক্লাইভকে) সনদ অর্পণ করা হউক।"

মহম্মদ আনিস ক্লাইভের আমমোক্তারবলে উকিল হয়েছিলেন, তিনি নবাবের নিজামতে মুচলেকা দিলেন। এরপর সনদ মিলল। ক্লাইভ বহাল তবিয়তে জমিদারি আরম্ভ করলেন, এদিকে আবার তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেতনভুক কর্মচারী।

কিন্তু বেশিদিন তাঁর ভাগ্যে এ সুখ সহ্য হল না। ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরলেন ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ওমরাহ হবার পরের বছর।

সেখানে কোম্পানির কর্মকর্তারা ১৭৬৪ খ্রীঃ তাঁকে চেপে ধরলেন, "আপনি কি করে কোম্পানির বেতনভুক হয়ে কোম্পানির মনিব সেজে বসলেন? এটা জুয়াচুরি এবং অসাধুতা।" অবশেষে একটা রফা হোল। ১৭৬৫ সালের জুলাইতে যখন তিনি কলকাতায় ফিরলেন, তখন আবার এক সুবাদারি পরওয়ানা বের হল। তাতে আদেশ ছিল যে লর্ড ক্লাইভ তার জমিদারি ১৭৬৪ সন থেকে মাত্র দশ বছর ভোগ করতে পারবেন। তারপর ঐ জমিদারি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে বর্তাবে। এই শেষ দলিলটি ভারত সম্রাটের অনুমোদন লাভ করল ১২ই আগস্ট ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ১৭৬৭তে ক্লাইভকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হল। অতএব তাঁর নবাব হবার স্বপ্ন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

হাউস্ অব লর্ডসের তিনি সভ্য হতে পারেননি। যেখানে তিনি যেতেন সেখানেই তাকে 'নবুব ক্লাইভ' বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে জীবন

অতিষ্ঠ করে তুলতো।

তারপর বৃটিশ সরকার মামলা মোকদ্দমা করে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত হাউস্ অব কমনস্ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তনের কৃতিত্বের জন্য ক্লাইভকে রেহাই দিল। তখন তিনি নিঃস্ব, রিক্ত। ভাগ্যদেবতা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন তাঁর দিক থেকে। অবশেষে নিজের হাতেই তিনি তাঁর নীতিহীন অসৎ জীবনের অবসান ঘটালেন। তিনি আত্মহত্যা করলেন। ক্লাইভের জীবন ও জমিদারির এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল।

কিন্তু আজও ভাবলে অবাক হতে হয় যে এই ২৪ পরগনা জেলার মধ্যেই তৎকালীন সময়ে লর্ড ক্লাইভ একজন জায়গীরদার এবং ওমরাহ হয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন।

খাড়ি

দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রগামী অতল নদীবক্ষ দিয়ে যেতে যেতে কেউ কি কল্পনা করতে পারেন, এ নদী একদিন শুকিয়ে যাবে! এখন যেখানে অথৈ জল, নদীতে কুমির হাঙর পরিপূর্ণ, তারই বক্ষে একদিন পিচের রাস্তায় বাস চলবে, ট্রেন চলবে, খণ্ড খণ্ড জমিতে কৃষক চাষ করবে, ক্লাবঘর হবে, পঞ্চায়েৎ-সভা বসবে। মন বলবে এ অসম্ভব, কল্পনা করার প্রশ্নই আসতে পারে না। তেমনি কেউ কল্পনা করতে পারবেন না আজকের শিয়ালদহ-জয়নগর-লক্ষ্মীকান্তপুর ট্রেন লাইন, বাস রাস্তা দেখে—যে এখান দিয়েই এককালে মকরবাহিনী আদিগঙ্গা তার তরঙ্গ-ভঙ্গী নিয়ে প্রবহমাণা ছিলেন। যে পথে আজ ছোট ছোট গ্রাম তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে দিনরাত্রির তরী বাইছে, সে পথ এককালে ছিল নদীর অতল তলে।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও ইতিহাস, সাহিত্য-কাব্য, জনশ্রুতি এর সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। আদিগঙ্গার প্রধান ধারাটি যে কলকাতার পরে এই পথেই প্রবাহিত ছিল, সে নদীপথ আজ শুষ্ক গ্রামবহুল হলেও, প্রাচীন পুঁথি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভগীরথ আনিত আদিগঙ্গা একদা চিৎপুর, সালকিয়া, বেতাই, বেলেঘাটা, কালীঘাট, রসা, নাচন-ঘাটা (বা গাছা), বৈষ্ণবঘাটা, কল্যাণপুর, বারুইপুর, সাধুঘাট, সূর্যপুর, মূলটি, দক্ষিণ বারাসত, বহড়ু, জয়নগর, বিষ্ণপুর, ছত্রভোগ, খাড়ি, কাশীনগর, ধামাই, বেতাই, মগরা হয়ে কাকদ্বীপের পথে সাগরে পড়েছিল। এই আদিগঙ্গারই পুব তীরে জয়নগর এবং মথুরাপুর স্টেশন থেকে সামান্য দূরে খাড়ি অবস্থিত। গঙ্গার যে শুষ্ক খালটি আজও ওখানে বর্তমান, মনে হয় ঐ থেকেই এ স্থানের নামকরণ খাড়ি হয়।

আজকে নতুন জনবসতি সত্ত্বেও এ গ্রামের মধ্যে অতীত ঐশ্বর্যের

চিহ্নমাত্র খুঁজে পাবেন না। না আছে প্রাচীন গঙ্গা, না আছে মন্দির অট্টালিকার সেই অপরূপ শোভা। অথচ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে এ পথে একদিন জাহাজ ভিড় করত। কত কর্মব্যস্ততা, কত কেনাবেচা চলত এর হাটে হাটে ; তারপর তারা আবার বাংলার পণ্য নিয়ে পাল তুলে সুন্দরবনের পথে দূর দূর সমুদ্রে অদৃশ্য হত।

মরা অতীতের স্তূপ খুঁজে খাড়ির নাম পেতে হলে প্রথমে 'ডাকার্ণব' নামে একখানা বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ চোখে পড়বে। পুস্তকখানি খ্রীস্টীয় দশম শতকে রচিত। বৌদ্ধদের মধ্যেও যে তন্ত্রমতের প্রসার হয়েছিল, এ গ্রন্থ তার এক প্রমাণ। এ পুস্তকে খাড়ির নাম উল্লেখ আছে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের চৌষট্টি পীঠস্থানের মধ্যে একটি বলে।

এর পূর্ব থেকেই তাহলে খাড়ির খ্যাতিলাভ শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই। মনে হয়, প্রাচীন তাম্রলিপ্তির গৌরব ম্লানের যুগে খাড়ির উন্নতি শুরু হয়। তখন অবশ্য সমস্ত নিম্নবঙ্গ জল-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং মথুরা-পুর, জয়নগর, কাকদ্বীপ প্রভৃতি সমুদ্রমিলিত থানাগুলির নিম্নাংশ দিয়ারা হয়ে সৃষ্টি হয়নি।

ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের পত্তন হল দ্বাদশ শতকের শেষে। বাংলার লক্ষ্মণসেন পরাজিত হলেন বক্তিয়ার খিলজীর হাতে। মীনহাজের বর্ণনায় সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় বার্তা লিখিত হওয়ায়, মরেও তিনি ইতিহাসে কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে রইলেন। অথচ লক্ষ্মণসেনের শাসনের প্রথম যুগ গৌড়বাংলার এক স্বর্ণযুগই বলা চলে। সে যুগে শাসনকর্তারা দেশকে 'ভুক্তি' নামে বড় বড় বিভাগে ভাগ করতেন এবং 'ভুক্তি' আবার 'মণ্ডল' নামে কতগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হত। সেকালের খাড়ি ছিল তেমনি একটি মণ্ডল এবং এখানকার মণ্ডলেশ্বর এই খাড়িতেই বাস করতেন।

বহু প্রাচীন জনপদ খাড়ির এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে উনবিংশ শতকে, ২২ নম্বর লাট বকুলতলায় একটি দিঘি খননের

সময়। আবিষ্কৃত হল লক্ষ্মণসেনের যুগের এক তাম্রশাসন তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে—মহারাজ লক্ষ্মণসেন পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মধ্যে অবস্থিত খাড়ি মণ্ডলের অধীন মণ্ডলগ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ, ব্যাসদেব শর্মাকে ভূমি দান করলেন। মণ্ডলগ্রাম পল্লীটি আজও বর্তমান। হিন্দু পুরাণ-মতে একটি মণ্ডলের আয়তন বত্রিশ শ বর্গমাইল এবং 'মণ্ডল' সর্বদা মণ্ডলেশ্বর, অমাত্য, দুর্গ প্রভৃতি দ্বারা অধ্যুষিত ও সুরক্ষিত থাকবে। খাড়ির অবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে এর খ্যাতিও ছিল অত্যন্ত বেশি। সুন্দরবনের বন্দর বলে এর নাম ছিল বিদেশিদের মুখে মুখে। এখানে বহু বিদেশি জাহাজে এসে ভিড় জমাত। একটি তাম্রশাসন থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই খাড়িতে ১১১৮ শকে (১১৯৬ খ্রীঃ) মহাসামন্তাধিপতি ডোম্মন পাল রাজত্ব করে গেছেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের সামন্ত রাজা ছিলেন, পরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন। তাম্রশাসনটিতে (১১৯৫-১২১৫ খ্রীঃ) লেখা আছে যে ডোম্মন পাল তার সুহৃদ বার্ধীনস গোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ রান উপাধিধারী বাসুদেবকে বামহিথা গ্রাম দান করেছিলেন।

ইতিহাসের বিবর্তনে হিন্দুযুগের পরে মুসলমান যুগ এল। গৌড়ে-পাণ্ডুয়ায় পাঠান শাসনের সময়ে খাড়ির বর্ণনা পাওয়া যায় চৈতন্য ভাগবতে। (দ্রষ্টব্য, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত সংস্করণের ৩৮৩—৩৮৬ পৃষ্ঠা)। আদিগঙ্গা দিয়ে চলেছেন প্রেমের ঠাকুর নিমাই, পথে পড়ল বারুইপুর, সাধুঘাট, সূর্যপুর, মূলটি, দক্ষিণবারাসত, বহড়ু, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, খাড়ি, কাশীনগর প্রভৃতি স্থান। ছত্রভোগে নিমাই এক রাত্রি অতিবাহিত করলেন এক গৃহস্থের বাড়িতে, সে ভিটাটি আজও বর্তমান নিমাইয়ের পদচিহ্ন নিয়ে (পরে স্থাপিত)। এরপর নিমাইয়ের নৌবহর আদিগঙ্গা বেয়ে এসে থামল খাড়িতে। খাড়িতে তিনি নামলেন, ধন্য হল খাড়ি তাঁর পদধূলিতে।

এরপর দায়ুদ খাঁর ছিন্নমুণ্ডের উপর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন আকবর। তাঁর রাজত্বের বর্ণনা লিখলেন তাঁর সুহৃদ এবং নওরতনের এক রতন আবুল ফজল বিখ্যাত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তৎকালীন খাড়ির এক সুন্দর বর্ণনা তিনি লিখেছেন। কলকাতা তখন সৃষ্টি হয়নি, বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে সরিয়ে এনে রাজমহলে স্থাপন করেছেন মহারাজ মানসিংহ। এ গ্রন্থে লেখা হয়েছে—খাড়ি হল বাংলার পশ্চিম সীমানার শেষ বন্দর। আবুল ফজল লিখেছেন, "চট্টগ্রাম থেকে খাড়ির দূরত্ব চারশ ক্রোশ, এবং উত্তরের পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে মাদারুণ সরকারের শেষ পর্যন্ত দূরত্ব হল দুইশ ক্রোশ। এরপরে উড়িষ্যা যখন বাংলায় যোগ হল তখন দৈর্ঘ্যে আরও তেতাল্লিশ ক্রোশ এবং প্রস্থে তেইশ ক্রোশ যোগ হল।" তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, খাড়ি ছিল প্রাচীন সুন্দরবনের দরজা এবং এখান থেকে সমুদ্রযাত্রার শুরু হত। সে সময়ে খাড়ি এক বিখ্যাত মুঘল পরগনাও বটে।

ইংরেজ যুগের প্রারম্ভে খাড়ির বর্ণনা লর্ড ক্লাইভের ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের প্রসিডিংস-এ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "খাড়ি বা করীজুড়ী পরগনার আয়তন ঠিক আমরা জানি না, তবে খাড়ি পরগনা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত এবং পূর্বে সুন্দরবনে গিয়ে মিশেছে। খাড়ির রাজস্ব আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি, চল্লিশ লক্ষ টাকা। কিন্তু এ পরগণার অধিকাংশই হল জঙ্গলাবৃত, জনশূন্য এবং চাষের অযোগ্য। এই পরগনা থেকে খাজনা পাওয়া যায় দুই হাজার নয় শত পঁচিশ টাকা নয় আনা মাত্র আর নবাবকে আমরা খাজনা দিয়ে থাকি পাঁচশত বাষট্টি টাকা আট আনা মাত্র।"

উপরোক্ত উক্তি থেকে বোঝা যায়, ইংরেজযুগের বহু পূর্ব থেকেই খাড়ির অবনতি শুরু হয়েছে। মনে হয় খাড়ির অবনতির প্রধান কারণ হল পর্তুগীজদের সুন্দরবনের জলপথে অত্যাচার।

১৮৪৬-৫২ খ্রীস্টাব্দে এ জেলার প্রথম রেভিনিউ সার্ভে করেন ক্যাপ্টেন আর স্মিথ। [পরে কর্নেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন]। তাঁর রাজস্ব জরীপের রিপোর্টে দেখা যায় যে, খাড়ির দক্ষিণে ঘন জঙ্গলে আবৃত এবং জঙ্গলে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও উঁচু পাড় বিশিষ্ট মজা দিঘি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুন্দরবন জরীপের সময় খাড়ির চার পাশের লাটগুলি হাসিল করে বিলি করার সময়েও জঙ্গলের মধ্যে অনেক ভাঙা মন্দির, দেবমূর্তি, মজাপুকুর, গৃহস্থালী দ্রব্য প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এ থেকে খাড়ির গৌরবময় অতীত সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েক বছর পূর্বেও আদিগঙ্গার শুকিয়ে যাওয়া বুকে টেস্ট রিলিফের কাজের সময় প্রাচীন জাহাজের ভগ্নাবশেষ, সোনার টাকা প্রভৃতি পাওয়া গেছে। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির কাগজপত্র ঘাঁটলে খাড়িতে প্রাপ্ত দ্বাদশ শতকের কারুকার্যখচিত পাথরের জানলার ফ্রেম, অষ্টম শতকের বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতির কথা জানতে পারা যায়। খাড়ির সভ্যতা সম্পর্কে আরও জানতে হলে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালানো প্রয়োজন, তাতে আরও নতুন আলোকপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

খাড়ি সম্পর্কে আলোচনায় যবনিকাপাত করার পূর্বে খাড়ির মুসলমান পীর বড়খাঁগাজী এবং 'রায়মঙ্গলে' বর্ণিত দক্ষিণরায়ের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন। বড়খাঁগাজী সে যুগে হিন্দুদের মুসলমান করার আদর্শে দীক্ষিত হয়ে অনেক অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন। খাড়ি ছিল বড়খাঁগাজীর অন্যতম প্রধান আড্ডা। তাঁর হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দক্ষিণরায়। তাঁদের লড়াইয়ের অনেক কাহিনী রায়মঙ্গল এবং পল্লীগাথায় আজও বেঁচে আছে। দক্ষিণরায়ের বীরত্বের জন্য তিনি আজও সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ধপ্‌ধপিতে বীরবেশে পূজিত হয়ে আসছেন।

এই হল খাড়ির মোটামুটি ইতিহাস। খাড়ির তৎকালীন জীবন-যাত্রা সম্পর্কে কোন কবি বা ঐতিহাসিক তেমন কোন বিশদ বিবরণ

রেখে যাননি, যা থেকে আমরা এই প্রাচীন গৌরবময় জনপদের জনসাধারণের সুখদুঃখ, কৃষি-বাণিজ্য সম্পর্কে জানতে পারি। আজও মথুরাপুর থানায় এই খাড়ি গ্রাম বর্তমান, কিন্তু প্রাচীন বসতিও নেই, সে প্রাচীন ঐশ্বর্যের কোন চিহ্নও নেই, আছে শুধু গঙ্গার একটি মরা খাত আর প্রাচীন মাটি। সে দিকে তাকিয়ে এর অতীত গৌরবের কথা মনে করলে বিস্ময় বেদনার অন্ত থাকে না। কিন্তু দুঃখ করে লাভ নেই, কারণ নদীপ্রবাহের মতনই হয়ত মহাকাল কোন জায়গায় গৌরবময় দিয়ারা সৃষ্টি করছেন, আবার কোন স্থানকে সে বিস্মৃতির অন্তরালে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কালের এই লীলাখেলায় আমাদের কোনই হাত নেই, আমরা সেখানে অসহায় দর্শক মাত্র।

পঞ্চান্নগ্রাম

গত শতাব্দীর একজন লোক যদি কোনক্রমে মহাকালের যবনিকা সরিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'মশাই, বলতে পারেন পঞ্চান্নগ্রাম যাব কোন্ পথে?' তাহলে এ যুগের কলকাতাবাসী সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না নিশ্চয়ই। অবাক হবে, জিজ্ঞেস করবে—'পঞ্চান্নগ্রাম, সে কোথায়?'—যদি সে বলে, 'সুতানুটি ছাড়িয়ে—কলকাতা, তারপর গোবিন্দপুর, তারপর পঞ্চান্নগ্রাম', তবুও বর্তমান কলকাতাবাসীর পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। আর কি করেই বা হবে! পঞ্চান্নগ্রাম তো আর আজ নেই, সে কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতার অস্থিমজ্জায় নিজেকে মজিয়ে বসে আসে। অথচ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে কলকাতার এবং মুর্শিদাবাদের রাজস্ব আদায়ের খাতায় পঞ্চান্নগ্রামের নাম সকলেরই সুপরিচিত ছিল।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জোবচার্নক কলকাতাতে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করলেন, ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা গেলেন। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ক্রয় করলেন পুরাতন ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা কলকাতা হারালেন সিরাজের আক্রমণে, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পলাশীর প্রহসনের পর সাঁতগাঁও-সরকারের ২৪টি পরগনা তাঁদের দখলে এল, নবাবের পরওয়ানা বলে।* প্রকৃত

---

* পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে (৩রা জুন ১৭৫৭ খৃঃ) মীরজাফরের সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের একটি গোপন চুক্তি হয়, তাতে লেখা ছিল।

Within the ditch which surrounds the borders of Calcutta are tracts of lands belonging to several Zemindars, besides this I will grant the English Company 600 Yards without the ditch, ডিচের বাইরে এই ৬০০ গজ জমিই অন্যান্য মৌজা সংযুক্ত হয়ে পঞ্চান্নগ্রাম এস্টেট হিসেবে পরিচিত হয়।

কলকাতার সীমানা এই তিনটি মৌজার সীমানা নিয়ে খুব বেশি ছিল না অথচ নিরাপদ আশ্রয়দাত্রী এবং ব্যবসাবাণিজ্যের কর্মস্থল হিসেবে এস্থানে জনসমাগম হয়ে উঠছিল। তাই কলকাতার বাইরেও কলকাতার সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

কলকাতার বাইরে পুবে বিরাট এলাকা তখন পতিত হয়ে পড়েছিল, এই এলাকাকে লোকে বলত পঞ্চান্নগ্রাম এস্টেট বা পঞ্চান্নটি গ্রামের তৌজী। এর মধ্যে ১৫টি ডিহি ছিল। ১৭৫৭ খ্রীঃ হলওয়েল সাহেব বলেছেন, এই পঞ্চান্নগ্রাম হল ২৪-পরগনা থেকে পঞ্চান্নটি গ্রাম নেওয়া এক এলাকা। এর মোট আয়তন হল ২৬০ বর্গমাইল। পঞ্চান্নগ্রামের চৌহদ্দি হল : দক্ষিণে টালিনালা পুবে দমদম থানার সীমানা এবং উত্তরে বরানগর। ইংরেজরা এই পঞ্চান্নগ্রামকে কলকাতার উন্নতির জন্য রেখে দিলেন। এই এলাকার খাজনা ছিল একলক্ষ সাত হাজার টাকা।

বর্তমান কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতার অধিকাংশই ছিল এই পঞ্চান্নগ্রাম এস্টেটের মধ্যে। যেমন—সিঁথি, কাশীপুর, পাইকপাড়া, চিৎপুর, টালা, বীরপাড়া, কালিদহ, দক্ষিণদ্বাড়ি, কাঁকোড়িয়া, নোয়াবাদ, বেলগাছিয়া, উল্টাডাঙ্গা (অংশ), বাগমারি, গৌরীবেড়, বাহির সিমলা, নারকেলডাঙ্গা, সুরা, কাঁকুড়-গাছা, কুচলান্, দত্তাবাদ, মল্লিকাবাদ, কুলী, শিয়ালদহ, বালিয়াঘাটা, এণ্টালী, পাগলাডাঙ্গা, নিমকপোতা, কামারডাঙ্গা, গোবরা, ট্যাংরা, তপসিয়া, তিলজলা, বেনিয়াপুকুর (কড়েয়া সহ), চৌভাগ, ধলন্দা, সোপগাছি, অন্তাবাদ, নোনাডাঙ্গা, বোঁদেল, গুলোবেড়িয়া, বেনিয়াডাঙ্গা, কুষ্ঠিয়া, পুরানগর, ঘুঘুডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, বালিগড়, গুড়সাহা, চক্রবেড়িয়া, ভবানিপুর-নিজগ্রাম, বেলতলা, কালীঘাট, মনোহরপুর, মুদিয়ালি, শাহানগর, কয়থালি। নামগুলি খুব অপরিচিত নয়—বরং চেনা-চেনাই লাগবে। তবে আজ আর সেদিনকার সেই ঘন জঙ্গল, কাদাপুকুর,

বাঁশঝাড়পরিপূর্ণ অসংখ্য মশক উৎপীড়িত গ্রামগুলিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা কলকাতার প্রাসাদ, রাজপথ, সিনেমা হাউস এবং মাঠগুলির অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছে।

প্রথমে এ উন্নতি কিন্তু একদিন বা এক জীবনে হয়নি। পঞ্চান্নগ্রাম ছিল কলকাতার কালেক্টারের অধীনে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম এই এলাকাকে ২৪-পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা থেকে পঞ্চান্নগ্রাম বাদ পড়ল। এখানকার বসবাসকারী প্রজারা রইল সরাসরি সরকারের অধীনে এবং তাদের প্রজাস্বত্বের নিয়মগুলি সরকার প্রদত্ত পাট্টা অনুযায়ী রইল।

ক্রমাগত কলকাতার জমির দাম বেড়ে চলেছে দেখে কোম্পানী ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দেই পঞ্চান্নগ্রামের এক জরীপ করলেন এবং রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। দেখা গেল, একটু একটু করে নয়, বেশ দ্রুতগতিতে লোক গোবিন্দপুরের মাঠ ছাড়িয়ে ভবানীপুর, বেলতলা প্রভৃতি এলাকাতে এসে বেশি জমি নিয়ে বাস করছে। রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে, পুকুর ডোবা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এমনি সময়ে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী পঞ্চান্নগ্রামকে কলকাতার কালেক্টারের অধীনে নিয়ে এলেন। এর সতেরো বছর পরে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে কাপ্তেন স্মিথ পঞ্চান্নগ্রামের একটি সুষ্ঠু জরীপ করলেন। নতুন খাজনা ধার্য হল, আরও লোক বিলি গ্রহণ করল পঞ্চান্নগ্রামের জমি।

এরপর ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার সম্প্রসারণ আবার ভীষণ দরকার হল। মিঃ বিলনের অধীনে নতুন করে সেটেলমেণ্ট হল, সরকার নতুন বসবাসকারীদের পাট্টা দিলেন এবং কবুলতি নিলেন। এই পাট্টা এখনও ভবানীপুর, কালীঘাট অঞ্চলে অনেকের বাড়ি খুঁজলে পাওয়া যাবে। মিঃ বিলন তাঁর জরীপে দক্ষিণ অঞ্চলের জলজঙ্গল পরিপূর্ণ

এলাকাটুকু বাদ দিয়েছিলেন।

গত শতকের শেষাশেষি ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে আরও অনেকে কলকাতায় বসবাসের আবেদন করায় এই অংশটুকু জরীপ শুরু করেন খান বাহাদুর দলিল উদ্দিন আহমেদ এবং শেষ করেন হেমচন্দ্র কর ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে। নতুন করে বিলি বন্দোবস্তের মাধ্যমে কলকাতা এতদিনে বেশ বেড়ে উঠেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীরূপে পরিচিত হয়েছে। কলকাতার এ খ্যাতির মধ্যে শুধু তাই সূতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার অবদান নেই, আছে পঞ্চান্নটি ইতিহাস উপেক্ষিত গ্রামেরও, যাদের আত্মদানে কলকাতার বিপুল আয়তনের মহিমা।

একদিন যেখানে বিশাল অরণ্যানী, নোনা নদীর খাল, বাঁশঝাড়, তাল-তেঁতুল-আম, সুন্দরী, হিজল প্রভৃতি গাছে পরিপূর্ণ ছিল, খাল-গুলিতে হুগলি নদীর টানে জোয়ার-ভাঁটা আসত, শুক্লপক্ষে মায়াময় জগতের সৃষ্টি হত, রাত্রে বাঘ, শিয়াল, বিষধর সাপের আড্ডা ছিল, সেখানে আজ তৈরি হয়েছে তৈল-পিচ্ছিল নিরাপদ রাস্তা, ইন্দ্রধনু আলোকিত সুরম্য প্রাসাদ, নিওন-আলো শোভিত মাঠ এবং সিনেমা পরিপূর্ণ মহানগর। ইতিহাসের অসংখ্য আশ্চর্যের মধ্যেও এও এক মহা আশ্চর্য। অথচ কলকাতার ইতিহাস বলতে গিয়ে আমরা এর আশ্চর্য উৎপত্তির কথা বলি, কিন্তু পঞ্চান্নগ্রামের কথা আশ্চর্যজনকভাবে বাদ দিয়ে যাই—যদিও পঞ্চান্নগ্রামের আত্মদানেই এ মহানগরীর অনেকখানি গৌরব।

সুন্দরবন : জরীপ প্রসঙ্গ

সুন্দরবন নামটি সকলের কাছে এক রোমাঞ্চকর বিস্ময়। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের তলে তলে প্রচ্ছন্ন-অনল রয়েল বেঙ্গল টাইগার, নোনা নদীর কূলে কূলে বিষাক্ত শ্বাপদের বিচিত্র বঙ্কিম গমন, স্পটেড্-হরিণের উদ্দামগতি, বহু রকম পাখিদের সুন্দরী, করঞ্জ প্রভৃতি গাছে রাত্রি যাপন, অগণিত বৃক্ষে মৌচাক, অসংখ্য নোনানদীর মাছ চিরদিনই মানুষকে সুন্দরবনের গভীরে টেনে নিয়ে গেছে।

যাঁরা সুন্দরবন দেখে ফিরে এসেছেন তাঁরা গল্প করেন, বঙ্গোপ-সাগরের বালুতটে নারিকেলকুঞ্জের উদাস হাওয়া, পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্র-তটে আছড়ে-পড়া উত্তাল তরঙ্গরাজির সৌন্দর্য, নদীতীর বেয়ে অতিকায় কুমিরের সন্তর্পণে শিকারের দিকে অগ্রসর হওয়া, ব্যাঘ্র মহারাজদের নদীতে জল খাওয়ার দৃশ্য সত্যিই অতুলনীয়।

সুন্দরবন অজ্ঞাত, দুর্জ্ঞেয় বলেই তো তার আকর্ষণে মানুষ বার বার সেখানে গেছে। বন কেটে বসত করতে কত মানুষ বাঘের পেটে আর সাপের কামড়ে মারা গেল, তার হিসেব নেই। তবুও বিরাম নেই, মানুষ বনকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। মাটিকে জঙ্গলের লোলুপ গ্রাসে ফেলে রাখা চলবে না, তার বুকের সোনা, তার নদীর সম্পদ উদ্ধার করতেই হবে।

সুন্দরবনের কথা প্রথম উল্লেখ পাই একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনায়। তিনি এ অঞ্চলকে 'ভাটি' বলে উল্লেখ করেছেন। ভাটি কথার অর্থ হল নিচু জমি, যা জোয়ারের জলে ভরে যায়, আবার ভাটার টানে ভেসে ওঠে। খুলনা আর বরিশালের লোকেরা আজও সুন্দরবনকে ভাটি অঞ্চল বলে থাকে। 'আইন-ই-আকবরী'তেও সুন্দরবনকে ঐ 'ভাটি, নামে উল্লেখ করেছেন আবুল ফজল।

সুন্দরবন নাম হল কেন এ নিয়ে একদল বলেন—ঐ অঞ্চলে প্রচুর মূল্যবান সুন্দরী গাছ জন্মায় বলেই ঐ নাম। আর একদল বলেন, সুন্দরী গাছ তো সর্বত্র জন্মায় না, আসলে ঐ নাম উৎপত্তির কারণ হল বাখরগঞ্জের সুন্ধ নদী। সুন্ধ নামটি আবার 'সুগন্ধ' নামক পীঠস্থানের সঙ্কোচন মাত্র। পুরাণমতে সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব যখন তাঁকে স্কন্ধে করে ঘুরতে লাগলেন, তখন বিষ্ণু চক্রে খণ্ডিত হয়ে, তার দেহের অংশ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সুগন্ধে পড়েছিল তার 'নাসিকাটি'।

কেউ কেউ বলেন, সুন্দরবনে উপজাতীয়দের রাজ্য ছিল 'চন্দ্রদ্বীপ'। ঐ রাজ্যের 'চন্দবন্দ' উপজাতিদের নামের অপভ্রংশই হল সুন্দরবন। সুন্দরবনের একজন কমিশনার মিঃ পারজিটার সাহেব বলছেন অন্য কথা। তিনি বলেছেন, সুন্দরবন নামটি এসেছে সমুদ্র-বন থেকে। যতদূর মনে হয় এই মতটি অভ্রান্ত।

সুন্দরবনের নামকরণের ইতিহাস যাই হোক, সাধারণত বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ২৪ পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জের বিস্তীর্ণ অরণ্যানীকেই সুন্দরবন বলা হয়ে থাকে। এর আদি সীমানা হল উত্তরে ২৪ পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তমতে তৌজীগুলি (**Permanently settled estates**)। দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে হুগলি নদী। পূর্বে মেঘনা নদী। এর মধ্যে ২৪ পরগনার অংশটুকু হল, উত্তরে ২৪ পরগনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তমতে তৌজীগুলি : পূর্বে কালিন্দী নদী, পশ্চিমে হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বলা বাহুল্য, বাকিটুকু এখন বর্তমান বাংলাদেশে। সুন্দরবনের প্রকৃত সীমানা যাই হোক জঙ্গল কেটে মানুষ যতই দক্ষিণে এগিয়ে চলেছে সুন্দরবনের সীমানা ততই কমে যাচ্ছে।

বিরাট সুন্দরবন, রহস্যময় সুন্দরবন—কত ঐতিহাসিক তথ্য তার বুকে রয়েছে। পুরানো ভাঙা বড় বড় প্রাসাদ বন-জঙ্গল ঢাকা হয়ে পড়ে রয়েছে, কত বিশাল দিঘি মজে গেছে, তার ভাঙা সিঁড়ি আর টল্‌টলে

জল দেখলে বোঝা যায় নিশ্চয়ই একদিন এখানে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, যা কোন কারণে হারিয়ে গেছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, প্রায় ৫।৬ শত বছর আগে জীবন-ধারা এখানে সচল ছিল। এর কারণ সম্পর্কে একদল বলেন, সুন্দরবনের জলবায়ুই এর জন্য দায়ী। আর একদলের মত হল পর্তুগীজ জলদস্যুদের (হার্মাদদের) এবং আরাকানদের অত্যাচার এবং স্থানীয় রাজশক্তির এঁদের রক্ষা করার অক্ষমতা।

সম্রাট আকবরের রাজত্বে তোডরমল্লের যে জরীপ ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে হয় (আসলি জমা তুমার), তাতে বাংলাকে ১৯টি সরকারে ভাগ করা হয়। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় তোডরমল্ল সুন্দরবনের কোন খাজনাই ধার্য করেননি। তখনকার সাঁতগাও সরকারের দক্ষিণতম সীমা ছিল হাতিয়াগড় পরগনা, এর পরেই হল সুন্দরবনের অরণ্যময় অঞ্চল।

ঐতিহাসিক ভ্রাতৃবিরোধ আর বিলাসিতার বর্ণনায় ঢাকা পড়ে গেছে হতভাগ্য শাহ সুজা! কিন্তু তিনিই প্রথম তাঁর সুবার সীমানা সুন্দরবনের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে সুন্দরবনের এক অংশ মুরাদখানা বা জেরাদখানা নামে খাজনা ধার্য হল আট হাজার চারশত চুয়ান্ন টাকা। এ অংশ অবশ্য বাখরগঞ্জের অংশবিশেষ ছিল এবং আকবরের সময়ে বাকলার শাসনকর্তা মুরাদ খাঁর নামে এই নামকরণ হয়। সে যাই হোক, এই প্রথম সুন্দরবনের খাজনা ধার্য হল।

এরপর মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে জরীপে (জমা-ই-কামিল তুমার) বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি হল বটে, কিন্তু সুন্দরবনের কোন খাজনা বেড়েছিল কিনা তার কোন ইতিহাস নেই।

ইংরেজরা দেওয়ানী লাভ করা পর্যন্ত সুন্দরবনের তেমন কোন ইতিহাস নেই। ইংরেজরা ২৪ পরগনা পেল বটে, কিন্তু চতুর্দিকে তার ঘোরতর অরণ্য ছাড়া আর কি ছিল। এদিকে ভারতময় শত্রু। বুদ্ধিমান ইংরেজরা কিন্তু ঠিক ধরতে পেরেছিল সুন্দরবনের অপরিসীম সম্ভাবনা আছে। বন-জঙ্গল কেটে আবাদ করলে সুন্দরবনে সোনা ফলবে।

১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে, ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর জেনারেল, যশোরের (বর্তমান খুলনা। খুলনার সৃষ্টি হয়েছে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।) তখনকার জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট হেঙ্কেল সাহেব (Tilman Henckell) সুন্দরবনের জঙ্গল রায়তদের কাছে সরাসরি বন্দোবস্ত দিয়ে সুন্দরবনের উন্নতির চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ছিল ঐ জঙ্গলগুলি পরিষ্কার হয়ে আবাদ হলে গ্রাম গঠন হবে, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হবে এবং পর্তুগীজ ও আরাকান জলদস্যুদের অত্যাচারও কমে যাবে। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। হেঙ্কেলের স্কীম হল মোটামুটি এইরকম—

জঙ্গলপূর্ণ জমিগুলি সীমানা এবং প্লট করে রায়তদের মধ্যে লীজ দেওয়া। প্রথম তিন বৎসর রাজস্ব মকুব, চতুর্থ বৎসর রাজস্ব ধার্য হবে বিঘা প্রতি দু আনা, পঞ্চম বৎসর চার আনা, ষষ্ঠ বৎসর ছ'আনা, সপ্তম বৎসর আট আনা ইত্যাদি। এই প্লটগুলি হেঙ্কেলের তালুক নামে বিখ্যাত।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, হেঙ্কেলের সীমানা ছিল খুলনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ২৪ পরগনা তাঁর পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়েছিল। হেঙ্কেল তাঁর পরিকল্পনার সুবিধের জন্য তিনটি মার্ট বা বাজার করেছিলেন, তার একটি হল ২৪ পরগনায়। নাম হল হেঙ্কেলগঞ্জ বা হিঙ্গুলগঞ্জ ওরফে বাঙ্গালপাড়া। কালিন্দা নদীর তীরে এই গ্রাম আজও হেঙ্কেল সাহেবের নামের সাক্ষ্য বহন করছে। হেঙ্কেল সাহেব আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর তালুকগুলির সীমানায় বাঁশগাছ পুতে সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। হেঙ্কেলের বাঁশগাড়ি দেখে জমিদাররা চোখ টিপলেন। হেঙ্কেল তার তালুকের বাসিন্দাদের রাজস্ব অনেক কম ধার্য করল। ফলে লাঠিয়াল নিয়ে জমিদাররা তাদের জমিদারীর সীমানা এগিয়ে নিয়ে চলল সরকারী তালুকগুলি গ্রাস করে। এ সমস্ত জমিদারদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন মুহম্মদ স্বামী, রাজবল্লভ রায়, ওয়েন জন এলিয়াস্।

কোম্পানি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেল ক্ষুদে নবাবদের চালাকিতে।

এ জমি বার করতে কোম্পানিকে ১৮১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল।

১৮১১-১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে লেফটন্যাণ্ট মরিসন সাহেব ২৪ পরগনার সুন্দরবন জরীপ করলেন। তাঁর জরীপের কাহিনী রোমাঞ্চকর ও ভীতিপ্রদ। তিনি সমুদ্রের অংশটুকু বাদ দিয়েছিলেন, সেটুকু শেষ করলেন ব্লেন সাহেব (১৮১৩-১৪ খ্রীঃ)। সুন্দরবনের জমির একটি হিসাব বেরুল।

জমিদাররা এদিকে পতিতাবাদ তালুকগুলির উপর সরকারের অধিকার নিয়ে তুমুল বিতর্ক তুলল। যশোর (বর্তমান খুলনা) রক্ কোলব্রুক কোম্পানি ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে সুন্দরবনের জমি বিলির ব্যাপারে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। ১২ জুন ১৮১৪ খ্রীঃ গভর্নর জেনারেল তা অনুমোদন করলেন। এবার স্থির হল প্রকৃত জরীপের পর তদন্তে জমিদারদের তৌজির মধ্যে যে সুন্দরবনের তালুক অধিকৃত হয়েছে, তা বের করে এনে পুনর্বিলি করতে হবে।

এই বছরই কোর্ট অব ডিরেক্টরস ঠিক করলেন, সুন্দরবনের উন্নতি ও রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত হোক। মিঃ স্কটই হলেন প্রথম সুন্দরবন কমিশনার। মিঃ স্কট চিংড়ি ক্রীক থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে হাতিয়াগড়, সাহপুর খাড়ির দিকে মেপে চললেন। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে অ্যাকাউণ্টস্ দিলেন, তাতে দেখা গেল তিনি ১১টি পরগনার ১২২টি তালুকের অতিরিক্ত জমির সন্ধান করেছেন। ১৮১৭ সনে আরও জমি বেরুল যা থেকে সরকার খাজনা পায় না। আপত্তির ঝড় উঠল দেশী মহলে। এই বিবাদ এড়ানর জন্য গভর্নর জেনারেল দুটি আইন পাস করলেন ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে।

১৮২১ খ্রীস্টাব্দে নতুন কমিশনার এলেন মিঃ ডেল। সার্ভেয়ার নিযুক্ত হল মিঃ এনসাইন্ প্রিন্সেপ।

মিঃ ডেল নিজে ২৬টি তালুকের পরিমাপ করেছিলেন যেমন, অরুণ-নগর, ফিঙা, টোনা, দোসরভগবানপুর, কিষ্টপুর, ঘোলা প্রভৃতি।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব সুন্দরবনের সমস্ত চাষের জমির

একটা হিসেব তৈরি করে ফেললেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে মিঃ ডেল নিজে আরও ২২টি তালুকের পরিমাপ করে ফেললেন রাজারামপুর, মুলাদাড়ি, কোলদাড়ি ইত্যাদি। দেখা গেল, যে পরিমাণে চাষের জমি ধরে পূর্বে রাজস্ব নির্ণীত হয়েছিল চাষের জমির পরিমাণ এখন অনেক বেড়ে গেছে।

এই অতিরিক্ত জমি পুনঃ বিলি এবং রাজস্ব নির্ণয়ের প্রশ্নে প্রবল আপত্তির ঝড় উঠল।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বরে মিঃ ম্যানগল্‌স (Mr. Mangles) সুন্দরবনের কমিশনার হয়ে এলেন। তাঁর সময়ে নতুন একটি আইন পাস হলো (Wasteland Rule of 1825)। এ আইনে বিশেষ কতকগুলি সুবিধে দিলেও মাত্র চারটি লটের (lot) বেশি বিলি হল না (৫৫, ৫৬, ৬১, ৬৪ নং লট)।

পরবর্তী কমিশনার হলেন মিঃ ড্যাম্‌পীয়ার (Dampier)। তিনি এসে মুড়াগাছা ও মেদনমল্ল পরগনার মাপ করালেন। মাপ করলেন মিঃ ম্যালকক্ (Malcock)। ড্যাম্‌পীয়ারের সময় বিখ্যাত একটি আইন পাস হয় যে, সুন্দরবনের সমস্ত জমি সম্পত্তি সব কিছুই হল সরকারের (Regulation III of 1828)।

ড্যাম্‌পীয়ার আর একটি বিখ্যাত কাজ করলেন সেটি হল তিনি মিঃ হজকে, সুন্দরবনের নতুন ম্যাপ তৈরি করতে আদেশ দিলেন। হুগলি নদী থেকে মেঘনা পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলটুকু আঁকতে তিনি প্রিন্সেপ সাহেবের মানচিত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন।

পূর্বের আইন তেমনি সুবিধের না হওয়ায়, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে নতুন আইন পাস করল কোম্পানি (Grant Rules 1830)। এবার সমস্ত লটগুলি বিলি হয়ে গেল।

১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে গ্রাণ্ট সুন্দরবনের কমিশনার হয়ে এলেন। কিন্তু কোন কারণে ঐ বছরই তিনি বদলি হয়ে যান। নতুন কমিশনার এলেন মিঃ সেক্সপীয়ার। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। এ সময়ে দুজন কমিশনার এসেছিলেন, একজন মিঃ কেম্প দ্বিতীয়জন মিঃ শ'।

১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে সুন্দরবন-কমিশনারের পদই অবলুপ্ত করে দেওয়া হল। ডেপুটি কালেক্টর রায়সাহেব উমাকান্ত সেনের তখন খুব নামডাক। তাকে বলা হল তুমি বাপু সুন্দরবনের স্পেশ্যাল অফিসার হয়ে কাজ চালাও। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে রায়সাহেব উমাকান্ত সেনই আবার কমিশনার হলেন। উমাকান্ত সেনের সময় নতুন একটি আইন পাস (Waste land Rule 1853) হয়। নতুন আইনে ৯৯ বছর জমি লীজের সুযোগ দেওয়া হল, খাজনার হারও কমে গেল। প্রজারা সানন্দে এগিয়ে এল নতুন আইন গ্রহণ করতে, সুন্দরবন পতিতাবাদের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে লবণ ব্যবসায়ীদের সুবিধের জন্য নতুন ধারার সংযোজন করা হল। বাবু উমাকান্ত সেন তখনকার দিনে বাংলায় সই করতেন, তাছাড়া তিনি নতুন আইনে কাজ করবার সময় কিছু কিছু ভুল করেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। নতুন কমিশনার এলেন মিঃ রেইলে (H. Reily)।

এর মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের ঝড় চলে গেল ইংরেজদের ওপর দিয়ে। ভারতের কোম্পানি শাসনের অবসান হয়ে রাজশাসন শুরু হল, শেষ গর্ভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় হয়ে বসলেন।

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে সুন্দরবনের ধনিকদের ওখানকার জমি সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলবার জন্য আরও দুটি স্কীম তৈরি করলেন, সরকার। অনেক বাকবিতণ্ডার পর ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে নতুন আইন পাস হল (Fee simple grant & Redemption Rules 1863)।

এই আইন ২৪ পরগনার ২২টি লট (lot) সম্পূর্ণ এবং ৫টি আংশিক সুবিধে নিয়েছিল। খুলনায় একমাত্র লাহা পরিবার ছাড়া, কেউই এ সুযোগ গ্রহণ করেনি। এর মস্ত অসুবিধে ছিল প্রজাকে একসঙ্গে অনেক টাকা সরকারকে দিতে হত। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে মিঃ

ক্যাসপারস (Casperz) ছিলেন কমিশনার, তাঁর সময়েই উপরোক্ত আইন চলে। ১৮৬৫ খ্রীঃ মিঃ গোমেজ এলেন কমিশনার হয়ে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ধনী আবাদকারীদের লোভ দেবার জন্য নতুন আইন পাস করালেন (Large Capital, Simple Capital Rules)। আইনের গলদ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ২৪ পরগনার সুন্দরবনের এ আইনে বেশ উন্নতি হয়েছিল।

৩৫টি লটকে (lot) ভেঙে ১৩৮টি করা হল এবং গোসাবা দ্বীপ বন্দোবস্ত হয়ে গেল। কাকদ্বীপ ও মথুরাপুর থানার সুদূর দক্ষিণে কতকগুলি লট A থেকে L পর্যন্ত সংখ্যায় চিহ্নিত হয়ে বিলি হয়ে গেল। গোমেজ সাহেবের পরে এলেন মিঃ পারজিটার (F. E. Pargiter)। তিনি সুন্দরবন সম্পর্কে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে গেছেন। (History of Sundarban)।

১৮৯৪ খ্রীঃ কমিশনার হলেন মিঃ পি রস্ (P. Ross), তার সময় সাগর দ্বীপ আইন পাস হল (Saugar Islands Rules, 1897)।

সুন্দরবনের সর্বশেষ কমিশনার হলেন মিঃ ডোনাল্ড সাণ্ডার (Donald Sunder)। তার কার্যকাল ১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত। এরপর ১৯০৫ সনের আইনে (Act I of 1905) সুন্দরবনের কমিশনারের পদ লোপ পেয়ে গেল। ২৪ পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জ এ তিনটি জেলার সুন্দরবনের অংশ যথাক্রমে ঐ তিনটি জেলার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল।

২৪ পরগনায় মিঃ সাণ্ডার ডেপুটি কালেক্টর হয়ে সুন্দরবনের কাজ দেখতে লাগলেন।

এই হল সুন্দরবনের জরীপের এবং জঙ্গল উন্নতির পুরানো ইতিহাস। স্বল্পপরিসরে অনেক কথা বাদ পড়ে গেল, যেমন বাখরগঞ্জের কথা, ২৪ পরগনার পোর্ট ক্যানিং পরিকল্পনা, সাগরদ্বীপ স্কীম, হেসামাবাদের গল্প,

ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সাহেবের কো-অপারেটিভ ইত্যাদি।

২৪ পরগনা জেলা জরীপ (১৯২৪—৩৩ খ্রীঃ) ২৪ পরগনা সংযুক্ত সুন্দরবন এলাকাকে ক্যাডাস্ট্রাল জরীপে ভাল করে মাপ করা হয়। এই জরীপে লটগুলিকে (Lot) মৌজা হিসেবে ধরা হয়েছিল। বৃহৎ লট-গুলিকে ভেঙে একত্রিত করে একটি মৌজায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ২৪ পরগনায় জেলা জরীপে মৌজায় সংখ্যা দাড়িয়েছিল ৬৭৮টি।

এই জরীপে ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার মানচিত্র এবং স্বত্ব-লিপি (Record of Right) সুষ্ঠুভাবে তৈরি হয়ে যায়। দেশ ভাগ হবার পূর্বে ২৪ পরগনা সুন্দরবন অংশের (খুলনা অংশসহ) আর একটি জরীপ হয়েছিল ১৯৪৬ সনে (বোর্ডের আদেশ নং ৭৫।২ এল আর (১) তাং ১৭।৬।৪৬)। এর সঙ্গে বসিরহাট থেকে ক্যানিং-এর ১০০ বর্গমাইল এলাকা যুক্ত হয়েছিল। এই জরীপের খতিয়ানগুলি চূড়ান্ত প্রকাশনা হয়নি। ২৪ পরগনার সর্বশেষ জরীপ হয়েছিল জমিদারী গ্রহণ আইনে ১৯৫৫ সন থেকে যে রিভিশনাল জরীপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই জরীপে মধ্যস্বত্বাধিকারিদের বিলোপ ঘটে এবং প্রজাদের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়।

বর্তমান ২৪ পরগনার সুন্দরবন বলতে সাধারণত বোঝায় জয়-নগর, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ, ক্যানিং, হাড়োয়া, হাসনাবাদ এবং সন্দেশ-খালি থানা। আজকাল সুন্দরবনের এমন সব স্থানে ভাল ভাল রাস্তা-ঘাট, বাড়ি তৈরি হচ্ছে যা এককালে গভীর অরণ্যসঙ্কুল হিংস্র বাঘ-সাপে পরিপূর্ণ ছিল। অনেকে সুন্দরবনের বর্তমান ২৪ পরগনার অংশ-টুকু নিয়ে একটি পৃথক জেলা গঠনের দাবি তুলেছেন। সে কথা এখানে আলোচ্য নয়।

সুন্দরবনে যেটুকু বর্তমান আছে, সেটুকু যদি কেউ দেখতে যান তবে তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করবেন, গৃহযুদ্ধে পরাজিত হতভাগ্য সুজার কথা, হেঙ্কেল, রাসেল, প্রিন্সেপ, মরিসন প্রভৃতি অক্লান্ত কর্মীদের

কথা। তাঁরা জীবন-ভয় তুচ্ছ করে সেদিনের মানুষের অগম্য অরণ্যানীর ভেতর থেকে জমি বের করে সোনার বরণ ধান ফলানোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

সেইসঙ্গে যেন মনে করি তাদের কথা যারা প্রথমে গভীর অরণ্যে বাঘ, ভালুক, সাপ প্রভৃতি তুচ্ছ করে বন্ধ্যা জমিতে লাঙ্গল চালিয়েছে, জঙ্গল কেটেছে, ধান ফলিয়েছে, নোনা নদীতে জাল ছড়িয়ে দিয়েছে। আজকের সুন্দরবনের নিরাপদ জনপদ, তার মাটির বৃক্ষের জলের ঐশ্বর্য যে আমরা অনায়াসে ভোগ করছি, সে তো তাদের সেই আপসহীন সংগ্রামেরই ফল।

কলকাতার প্রথম জরীপ

প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন শহর বা রাজধানী দেখলে অনেকের মনেই অনেক প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল বা মুর্শিদাবাদ দেখবার সময় আমার মনে হয়েছিল অনেক কথা, যেমন অসংখ্য জনপদ-অধ্যুষিত অধুনা নির্জন প্রাসাদে প্রান্তরে আমি যেন অনুভব করেছি একদা লোকেদের কলকোলাহল, তাদের সভ্যতা-উদ্ভূত যন্ত্রণা, তাদের অর্থ পদগৌরবের আনন্দ অনুভূতি। সেই সমস্ত তাদের ব্যক্ত অব্যক্ত হৃদয়ানুভূতি যেন মূর্ত হয়ে উঠবে এখুনি এক বাতাসের দমকায়। সেই অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকি ভগ্ন দেয়ালে, প্রাচীন জনপদের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজপথে। মনে আসে একদা নিত্যপ্রয়োজনে যে স্থান মানুষের এত প্রয়োজনীয় এবং প্রিয় ছিল, সে স্থান কেন এখন শ্মশান? সেই মানুষগুলির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কেন তার মহিমা তিরোহিত হল?

আর বর্তমান জন অধ্যুষিত, কোলাহলমুখরিত জাগ্রত বাংলার রাজধানী কলকাতাকে দেখলে মনে আসে ভিন্নকথা। মনে হয় আজকে যে স্থান এত জনমুখরিত সত্যিই কি একদিন কালের নির্মম বিধানে তার মৃত্যু হতে পারে? তখন আজি হতে শত বা সহস্র বর্ষ পরে কোন পথিক বা ঐতিহাসিক ঐ গঙ্গা বা হুগলীনদীর পারে দাঁড়িয়ে কখন স্মরণ করতে পারবে না আজকের দিনের তুচ্ছ বৃহৎ অসংখ্য কাহিনীকে, শত শত সংসারের হৃদয়রাগের কবিতায় উজ্জ্বল কলকাতাকে। তারা সব ভেসে চলে গেছে দূরের আকাশের—কোন অজানা দিকে। তাদের কোন মানচিত্র রাখা যায়নি।

অতীতের ধূসর ধূলাবালির আবরণ সরিয়ে দেখলে দেখা যাবে, কলকাতার অতীতের জন্মদিনকে। যেদিন প্রথম স্থির হয়েছিল

উলুবেড়িয়া হবে কলকাতার রাজধানী। স্বাস্থ্যকর মনোরম তপসে মাছ এবং ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত উলুবেড়িয়া। তারপর একদিন মধ্যাহ্নে জোবচার্নকের পাল্কি বেয়ারারা হেঁইও হেঁইও করতে করতে শিয়ালদহের ঘন জঙ্গলে (মতান্তরে নিমতলার নিমবনে) পাল্কি রেখে বিশ্রাম শুরু করল। পাল্কির পর্দা সরিয়ে জোবচার্নক সুন্দরী, করঞ্জ প্রভৃতি গাছের সবুজ বনচ্ছায়ার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চাকর তামাক সেজে দিল। অপরাহ্নের সবুজবনচ্ছায়ায়, পাখিদের কলকাকলিতে, চার্নক সাহেব কি মুহূর্তেও কল্পনা করেছিলেন বর্তমান শিয়ালদহ স্টেশনের বা সার্কুলার রোডের আজকের ব্যস্ততাকে? না আমরাই কল্পনা করতে পারি সেদিনের বনচ্ছায়া, শ্যামচ্ছায়াকে? শিয়ালদহ স্টেশনের ভিত্তিস্থাপনের সময়ে শুধু মাটির নিচে থেকে রাশি রাশি সুন্দরী গাছের গোড়া উঠেছিল, সেদিনের বনানীর এইমাত্র প্রমাণ মহাকাল আমাদের কাছে রেখে গেছে।

তারপর কিন্তু জোবচার্নকের মত পাল্টে গেল। চিঠি গেল ইংলণ্ডে বোর্ড অব ডিরেক্টরসের কাছে উলুবেড়িয়া নয় কলকাতাই ইংরেজদের প্রধান শহর হবে, বাংলাদেশে। মঞ্জুরী এল ইংলণ্ড থেকে। ষোলশত নব্বই খ্রীস্টাব্দের চব্বিশে আগস্ট কলকাতার যাত্রা হল শুরু। এই কথাই যদি সত্যি হয়, তবে হায় কত বৃহৎ পরিকল্পনার বা সম্ভাবনার মূলে সময় সময় কত তুচ্ছ কারণই না থাকে।

১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের, ১০ নভেম্বর মনোহর দত্ত, রামচাঁদ, রামবাহাদুর, প্রাণমনোহর সিং-এর কাছ থেকে সুতানটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা কিনলেন কোম্পানি বাহাদুর মাত্র এক সহস্র তিনশত টাকায় (মতান্তরে পনেরো শত টাকায়)। ভাবী ইংরেজ রাজধানীর ভিত্তি স্থাপিত হল বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপণির একধারে নিঃশব্দে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকৃষ্ট স্থান বলে অচিরেই জনসমাগম শুরু হয়ে গেল। ধনী দরিদ্রে কলকাতা ভরে গেল, দারিদ্র্য এবং ঐশ্বর্যের অহঙ্কার পাশাপাশি

বেড়ে চলল।

এমনি সময় কলকাতার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল, বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে দখল করলেন। আজ কি ধারণা করা যায়, তিনি তাঁর শিবির স্থাপন করেছিলেন সার্কুলার রোডের পূর্বে। কোথায় তাঁর রচনাচাতুর্যের পরিচয় আজকের দিনের কোলাহলমুখরিত সার্কুলার রোডের বাতাসে? সেই বিপদের দিনেই কিন্তু ইংরেজদের প্রথম জরীপ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে।

এদিনকার পূর্বেও একটি জরীপ হয়েছিল কলকাতায় ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে কিন্তু তার কোন হিসেব জানা নেই। শুধু পাওয়া যাবে এর পরিচয় আপ্‌জনের ম্যাপে। আপ্‌জন ১৭৪২ সনের ম্যাপে ১৭৫৬ সনের কলকাতার ছবি এঁকে সিরাজদ্দৌলার আক্রমণের দৃশ্য দেখিয়েছেন। আপ্‌জনের ম্যাপ তৈরির সময় হল ১৭৮৪-৮৫ এবং ১৭৯২-৯৩। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে যে মানচিত্র তৈরি হয়েছিল, তার স্কেল ছিল ভূমির ১ মাইল ম্যাপের ৩$\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সার্ভেয়ারের নাম আমরা জানি না। কলকাতার সেই দুর্দিনে তাঁর নাম হারিয়ে গেছে।

আপ্‌জনের ম্যাপে দেখতে পাওয়া যায় বর্তমান বৌবাজার স্ট্রীট, প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, গভর্নরের প্রাসাদ, উর্মিচাঁদের বাগানবাড়ি, সিরাজদ্দৌলার শিবির, মারাঠা ডিচ্, গোবিন্দ মিত্রের বাগান, গোবিন্দপুর, পঞ্চান্নগ্রামের অনুন্নত জমি প্রভৃতি। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের এই মানচিত্রই কিন্তু কলকাতার প্রথম মানচিত্র বলে মনে হয়। অনেকের আবার ধারণা ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে লেফটেন্যাণ্ট উইলসন-কৃত কলকাতার মানচিত্রই প্রথম মানচিত্র। এতে পূর্বোক্ত বাড়িঘরের সঙ্গে গঙ্গা নদী এবং সল্টলেকের সংযোগ দেখানো হয়েছে এক খাল দিয়ে, যার পরিচয় বহন করছে ক্রীক রো ও ডিঙাভাঙা লেন।

কলকাতার পৌরাণিক যুগের ম্যাপও অনুমান করে আঁকা হয়েছে, তবে সেটা হল অনুমান এবং কাগজপত্রের ভরসায় আঁকা।

এই ম্যাপে কলকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর দেখান হয়েছে। এবং ত্রিভুজপ্রায় এই ভূভাগের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (বা গোবিন্দ) মহেশ্বরের মন্দির ছিল, মধ্যে কালীমন্দির। কালক্রমে কালীমন্দির সরে সরে বর্তমান কালীঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে, এর কারণ হল, আদি-গঙ্গার ক্রমশ সরে যাওয়া এবং মায়ের মন্দির আদিগঙ্গার তীরে রাখবার প্রয়াস। এই মানচিত্রে দেখা যায় বর্তমান বেলেঘাটা তখন সল্টলেকের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই কলকাতার প্রথম জরীপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এরপর যখন কলকাতার জরীপ শুরু হল তখন কলকাতার ভবিষ্যৎও মেঘমুক্ত হয়ে শুক্লপক্ষের চাঁদের মতোই হাসছে। পরবর্তী জরীপগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল লেফটেন্যান্ট কর্নেল মার্ক উডের জরীপ। উডের জরীপের সময় হল ১৭৮৪-৮৫খ্রীঃ। পরের বছর জরীপ করেন কলকাতার প্রধান ইঞ্জিনীয়ার টিকল।

কলকাতা কিন্তু এদিকে বেশ বেড়েই চলেছে। সমস্যা দাঁড়াল এই যে, এ বছর যে ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে, দ্রুত জনবসতির ফলে সে ম্যাপ কয়েক বছর পরে কোন কাজেই লাগছে না। মানুষ বাড়িঘর তৈরি করে, গাছপালা কেটে, জমির চেহারা পাল্টে দিচ্ছে।

এরপর ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে মিঃ আপ্‌জন ফোর্ট উইলিয়াম এবং চতু-স্পার্শ্বের ম্যাপ তৈরি করেন। এই ম্যাপ খুব নির্ভুল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়েছিল। এর স্কেল ছিল ম্যাপে আট ইঞ্চি জমির এক মাইল। এই ম্যাপটি বাংলায় ব্রিটিশ অধিবাসীদের নামে উৎসর্গ করা হয়। এই ম্যাপে দেখা যায় কলকাতার ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, শিয়ালদহ, কলেজ স্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে আইল দিয়ে ঘেরা কত ধানের জমি বা প্লট ছিল; আজকের প্রাসাদ বাড়িঘরের চিহ্নমাত্র সেদিন ছিল না।

এর দু'বছর পরে এনসাইন ব্লাস্ট সাহেব যে ম্যাপ তৈরি করেন সেটিই হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ জরীপ এবং মানচিত্র। কলকাতা এদিকে উত্তরে, পূর্বে এবং দক্ষিণে সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছে।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার টপোগ্রাফিকাল সার্ভে করা হয়, সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে। এর তিন বছর পরে ইংরেজরা স্থির করলেন, কলকাতার উন্নতি করতে হবে লটারি করে। ঠিক যেমন এখন কোন মিশনারি স্কুলে উন্নতির মানসে লটারি করা হয়। লটারি কমিটি স্থির হল। মেজর জে. এ. সক, ব্রিজ এবং ক্যানাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটি ম্যাপ তৈরি করলেন। এরপর ক্যাপ্টেন প্রিনসেপ এই ম্যাপের কিছু সংশোধন করে দ্বিতীয় ম্যাপ তৈরি করলেন লটারি কমিটির জন্য। কিন্তু হায়রে, কলকাতার উন্নতি! দু'একবার লটারি হল ঠিক কথা, কিন্তু কলকাতার নীতিবাগীশরা এতে ঘোরতর আপত্তি তুললেন, জুয়ার সাহায্যে ব্রিটিশ রাজধানীর উন্নতি করা কখনও ঠিক হবে না। অতএব এ পথ পরিত্যাগ করা হল। লটারি কমিটির দ্বারা কলকাতার সামান্য কিছু উন্নতি করা হয়েছিল যেমন স্ট্রাণ্ড রোড। তা ছাড়া এই কমিটি জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন তার প্রমাণ এখনও রাজভবনের দুই পাশের (পুব ও পশ্চিমে) ড্রেন।

কলকাতার প্রথম লার্জ স্কেল সার্ভে বলতে হলে মিঃ এফ. ডব্লু. সিমসের জরীপকে বোঝায়। এই জরীপ ১৮৩৭ খ্রীঃ থেকে তিন বছর চলেছিল। ২৪ পরগনায় রেভিনিউ সার্ভেয়ার মিঃ স্মিথ ১৮৫৩ খ্রীঃ কলকাতার এবং শহরতলীর নকশা তৈরি করেন। স্মিথ অবশ্য এ ব্যাপারে সিমসের ম্যাপেরই সাহায্য নিয়েছিলেন। এদিকে ডেপুটি কালেক্টর মিঃ হেসাম, সিমসের ম্যাপের ওপর আর একটি নকশা তৈরি করেন। এ ম্যাপে তিনি কলকাতার বাড়িঘর প্রভৃতির সীমানা দেখিয়ে দেন।

১৮৬৯ খ্রীঃ মিঃ বিলন্ পঞ্চান্নগ্রামের ম্যাপ তৈরি করেন। পঞ্চান্ন-

গ্রামের সীমানা ছিল বর্তমান টালিগঞ্জের কাছ থেকে সমস্ত পূর্বাংশ জুড়ে বরানগর এস্টেট পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। সমস্ত পঞ্চান্নগ্রামই আজকে প্রকৃতপক্ষে কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে চলে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ জরীপ করেন সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। এই জরীপ চলে ১৮৮৭ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত। এ জরীপের স্কেল ছিল ম্যাপের এক ইঞ্চি জমির পঞ্চাশ ফুট। এতে কলকাতার অভ্যন্তরীণ সম্পত্তির সামারেখা প্রভৃতি দেখানো হয়নি। এই জরীপের সার্ভেয়ার ছিলেন উইলকিনস সাহেব (Wilkins)। স্বল্পপরিসরে কলকাতার প্রথম জরীপ এবং বিগত শতাব্দীর প্রাচীন জরীপগুলির কাহিনী আলোচিত হল।

সেদিন কলকাতার শৈশবে হুগলির ফৌজদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইংরেজরা বর্তমান কলকাতায় তাদের প্রধান শহর স্থাপন করেন। তারপর কতদিন গেছে, কত মৃত্যু, বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোন, এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গেছে ইংরেজদের এবং কলকাতার ওপর দিয়ে। কলকাতা কিন্তু ধীরে ধীরে এই সমস্ত বিপদ কাটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরীরূপে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' তার দেওয়া এবং নেওয়ার সার্থক ফল হিসেবে গড়ে উঠেছে আজকের আমাদের মহানগরী কলকাতা। আজও তাই সে স্বপ্ন দেখে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধবল অবয়বের মধ্যে প্রাচ্যের নির্মল ভাবধারার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। প্রাচ্য, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য, এ দুইয়ের কখনও মিলন হবে না কিপলিংয়ের এই উদ্ধৃত উক্তির যোগ্যতম এক প্রতিবাদ সে।

আদি গঙ্গার আদি পথ

রামায়ণ-মহাভারতে আছে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সগর যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ সুরু করেন, তখন ইন্দ্রের খুব ভয় হয়েছিল, পাছে তাঁর ইন্দ্রত্ব চলে যায়। অশ্বমেধের ঘোড়ার ভার ছিল সগরের মহাপরাক্রম ষাট সহস্র পুত্রদের উপর। ইন্দ্র কৌশলে ঘোড়াটিকে চুরি করে বেঁধে রেখে এলেন কপিলমুনির আশ্রমে পাতালে (সাগরে)। সগরের ষাট সহস্র পুত্ররা যখন ঘোড়া খুঁজতে কপিলমুনির আশ্রমে এলেন, তখন দেখেন ঘোড়া সেখানে বাঁধা রয়েছে। মুনিকে তাঁরা চোর মনে করে তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করে দিলেন ফলে মুনির রোষানলে সগরের পুত্ররা ভস্ম হয়ে গেলেন। সগরের ত্যাজ্যপুত্র অসমঞ্জের ছেলে অংশুমান কপিল মুনিকে সন্তুষ্ট করে ঘোড়া ফিরিয়ে এনে দিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন হয়। কপিলমুনি বলেছিলেন অংশুমানের পৌত্র মহাদেবকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনবে, সেই পাবত্রধারা এই ভস্মরাশির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলেই তাদের হবে মুক্তি।

হিমালয়ের জটিল জটার বন্ধন থেকে গঙ্গার ধারাটি অংশুমানের পৌত্র, দিলীপের পুত্র সত্যিই একদিন বের করে এনেছিল। সমগ্র আর্যাবর্তের ওপর দিয়ে সেই সুপেয় জলের ধারাটি সুন্দরবনের নোনা জলের এলাকায় এনে ভগীরথ তার পূর্বপুরুষদের মুক্ত করেন।

এ পুণ্য-কাহিনী কি শুধুই কাহিনী, না লবণাক্ত সমুদ্রজলে ধ্বংস-প্রাপ্ত সুন্দরবনে মিষ্টি জলের ধারা এনে কৃষি ও জনপদের পুনরুজ্জীবন? সে কাহিনী অবশ্য এখানে বিচার্য নয়।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ভারতবাসীদের মন গঙ্গার তীর গঙ্গায় পুণ্যস্নান কামনা করেছে। কালীঘাটে যখন দেখা যায় নোংরা আবর্জনা পরিপূর্ণ গঙ্গার ক্ষীণ ধারাটিতে ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশের লোকেরা

ভক্তিভরে স্নান করছে তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন আসে, গঙ্গা কালীঘাটে এত ক্ষীণা কেন? আউটরামঘাট, ফলতা, ডায়মণ্ডহারবারের নিকট যে গঙ্গা সে তাহলে কোন্ নদী?

গঙ্গা কালীঘাটে এত ছোট কেন এ প্রশ্নে এক অধ্যাপক প্রাচীন কোনো পণ্ডিতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে শুনিয়েছিলেন, যতদূর মনে পড়ে—

"কালীঘাটে কলৌকালে, কালী চ কল্মষনাশণে।
সপত্নি বিভবং দৃষ্টা, গঙ্গা চ মলিনা কৃশা॥"

অর্থাৎ কলিকালে কালীঘাটে কালীই পাপহরা। সপত্নী কালীর বিভব ঐশ্বর্য দর্শনে গঙ্গা হিংসাতে মলিনা ও কৃশা হয়ে গেছেন। কিন্তু এ তো সদুত্তর নয় এ হল কবির কবিত্ব। তখন উত্তর পাইনি, পরে শুনেছি এই হল আদিগঙ্গা এবং এপথেই ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করে গঙ্গা নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার 'পরে আজ এই ধারাটি অবলুপ্ত। আর যে নদী সমুদ্রের মুখ থেকে ডায়মণ্ডহারবার ফলতা হয়ে গঙ্গায় মিশেছে সে হল হুগলি নদী। ইংরেজরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য হুগলি নদী গঙ্গার সঙ্গে কেটে মিশিয়ে দেয়। আদি গঙ্গার ধারাটি কিন্তু তার আগে থেকেই শুকিয়ে আসছে। উত্তর সুন্দরবনের বিরাট পরিবর্তন এবং খালগুলি মজে যাওয়ায় আজ আর সহজে ভগীরথের আনীত গঙ্গার শেষ প্রবাহটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন নির্ভর শুধু জনশ্রুতি আর পুরানো গ্রন্থগুলি।

সপ্তদশ শতাব্দীর কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' বইতে প্রথম পাই এ অঞ্চলের গঙ্গার উল্লেখ। এতে আছে, গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে চিৎপুর, সালখা, বেতাই, বেলিয়াঘাট, কালিঘাট, রসা, নাচনঘাটা (অথবা গাছা), বৈষ্ণবঘাটা, কল্যাণপুর গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে।

কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' এবং 'চৈতন্য ভাগবত' লেখা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই দুই গ্রন্থে গঙ্গার গতি নিম্নভূমিতে উল্লেখ প্রসঙ্গে যে

সমস্ত গ্রামগুলি গঙ্গার তীরে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি বর্তমান মানচিত্রে মিলিয়ে নিয়ে গঙ্গার আদি ধারাটি বেশ কল্পনা করে নেওয়া যায়। উল্লিখিত দুই গ্রন্থে বারুইপুর, সাধুঘাট, সূর্যপুর, মুলতি, দক্ষিণ বারাসত, বহড়ু, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, বড়াশী, খাড়ি, কাশীনগর, ধামাই, বেতাই, মগরা গ্রামগুলির কথা উল্লেখ আছে। ধামাই এবং বেতাই ছাড়া সমস্ত গ্রামগুলিই মোটামুটি পরিচিত। ধামাই এবং বেতাই গ্রাম দুটি মনে হয় সাগরে, তবে তাদের অস্তিত্ব এখন খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাহলে কালীঘাটের গঙ্গা থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত গঙ্গার গতিপথের মানচিত্র সহজে আঁকা যেতে পারে।

গঙ্গার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে নানা উপায়ে। বিষ্ণুপুরে, রায়দিঘির পাকা সড়কের কাছে যে বিশাল দিঘিটি আছে তার পাড়ে এখনও পুরনো আমলের একটি শ্মশান আছে। গঙ্গা এখানে প্রবাহিত হয়ে ছত্রভোগ খাড়ি কাশীনগর হয়ে দক্ষিণে গিয়েছিল বলে লোকে মনে করে, এখানে মৃতদেহ দাহ করলে গঙ্গার পাড়েই দাহ করা হত। ঢোলাহাট, রায়দিঘি, কৃষ্ণচন্দ্রপুর প্রভৃতি বহু দূরান্ত থেকে লোক এখানে মৃতদেহ দাহ করতে নিয়ে আসে।

বিষ্ণুপুরের পরে গঙ্গা ছত্রভোগ, লালুয়া, খাড়ি, কাশীনগর পার হয়ে রায়দিঘি বাঁয়ে রেখে যাত্রা করেছিল কাকদ্বীপের পথে। বাঁয়ে রইল গদামথুরা, যোগেন্দ্রনগর, তারপরে কাকদ্বীপের কাছে বারাতলা অথবা মুড়িগঙ্গার মধ্য দিয়ে সাগরদ্বীপে গিয়ে পড়ল। লালপুর, লালুয়া, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ছত্রভোগের লোকেরা এখনও নজির দেখায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত খুলে, যেখানে লেখা আছে—

"এইমত বহু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্বলোক করি সুখী॥

গঙ্গার বিরহে শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল ছিল অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিলাইল॥..."

আরও দেখা যায় গঙ্গার বক্ষ যেখানে যেখানে ছিল, সেখানে গঙ্গারই মতো বালুকামাটি, তীরে তীরে তার বড় বড় জীর্ণ বাড়ি, মন্দির, পুরানো দিঘি প্রভৃতি অতীতের ঐশ্বর্যের চিহ্ন রয়েছে। বালি পরিপূর্ণ নদীতটে যেমন বড় বড় তরমুজ, বাঙ্গি, ফুটি ফলে এখানেও তেমনি জন্মায় সেই সমস্ত ফল। চৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে, পুরী যাবার পথে নিমাই গঙ্গাপারে ছত্রভোগে এক ব্রাহ্মণের গৃহে এক রাত্রি অতিবাহিত করে যান। সেই ব্রাহ্মণ কে আমরা জানি না, কিন্তু তার ভিটার ওপর বর্তমানে নিমাইয়ের পদচিহ্ন অঙ্কিত একটি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। নিমাই এখানে থাকাকালীন ত্রিপুরেশ্বরী ও অন্ধ মুনির দুটি বিগ্রহ স্থাপন করে যান। এসব কথা তো চৈতন্য চরিতামৃতেই লেখা আছে।

১৮৪৭-৫১ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্মিথ্ যে রেভিনিউ জরীপ করেন তাতে তিনি সুন্দরবনের জরীপের ম্যাপগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন (যেমন মরিসন্, প্রিন্সেপ্, হজ ও লয়েডের ম্যাপ, ১৮১২-৩০ খ্রীঃ)। এই ম্যাপে 'গঙ্গাধারা' বলে যে এলাকা এবং গ্রামটির উল্লেখ আছে সেটি কৃষ্ণমঙ্গলের গঙ্গাধারার সঙ্গে অভিন্ন। এই ধারাই যে কাকদ্বীপের পথে রওনা হয়েছে, তারও উল্লেখ আছে এই ম্যাপে 'চড়াগঙ্গা' বলে। কৃষ্ণরামের গ্রন্থেও তার সমর্থন মেলে।

১৮২২-২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব যে উনপঞ্চাশ নং পতিতাবাদ তালুকের ম্যাপ তৈরি করেছিলেন তাতেও দেখা যায়, চোরা গঙ্গাধারা এবং মালাবাকলগার (গুঞ্জাখাল) উল্লেখ আছে। এতে এই প্রমাণ হয় যে খাড়ির পরে গঙ্গার ধারাটি বর্তমান গোবাড়িয়া গাঙ এবং ঘিবাটি

গাঙের পথেই কাকদ্বীপের দিকে গিয়েছিল।

কাকদ্বীপে কিন্তু এখনও মকর সংক্রান্তিতে, গঙ্গাসাগর মেলার দিনে একটি মেলা হয় এবং অনেক লোক এই খালে স্নান, দান-ধ্যান করে পবিত্র হয়। সেই প্রাচীন ধারাটি নেই, কিন্তু বংশপরম্পরায় জনশ্রুতিটি রয়েছে গঙ্গা একদিন এই পথেই সাগরসঙ্গমে গিয়েছিল।

বারাতলা অথবা মুড়িগঙ্গা অতিক্রম করে গঙ্গা দক্ষিণে সাগর-দ্বীপে প্রবেশ করেছিল। মুড়িগঙ্গা নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে এটা গঙ্গারই এক অংশ, গঙ্গার মুড়ি অর্থাৎ মাথা থেকে উৎপত্তি।

সাগরদ্বীপ পূর্বে অনেকগুলি দ্বীপে বিভক্ত ছিল। মুড়িগঙ্গা থেকে সাগরদ্বীপে যেখানে আদিগঙ্গা মিশেছিল, তার যে চিত্র বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি তৈরি করেছিল, তার সঙ্গে মেজর রেনেলের (১৭৭৮ খ্রীঃ) সাগরের নদীপথের ছবির গভীর মিল রয়েছে।

আদিগঙ্গার ধারা তাহলে সাগরদ্বীপের ভেতরে শিকারপুর খাল, খাড়ি খাল, রুদ্রনগর (বামে), বিষ্ণুপুর (বা গোলকপুর), নতেন্দ্রপুর, নারায়ণী আবাদ (ডাইনে) রেখে মগরাখালে গিয়ে মিশেছিল। এই মগরাখালই তো বর্তমানের গঙ্গাসাগর মেলার খাল। এই হল মোটামুটি আদিগঙ্গার পথ।

আদিগঙ্গার ধারাটি আজ অবলুপ্তপ্রায় কিন্তু যে সমস্ত গ্রামগুলির বা মাঠের মধ্যে দিয়ে পবিত্র আদিগঙ্গা প্রবাহিত ছিল তার অবশিষ্টাংশ খাল, পুকুর প্রভৃতিতে জনসাধারণ এখনও ভক্তিভরে প্রণাম করে (যেমন জয়নগর, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ প্রভৃতি স্থানে)।

১৯২৪-৩৩ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগনার সেটেলমেণ্ট অফিসার বার্জ (B. E. J. Burge) সাহেব নানা নথিপত্র ঘেটে আদিগঙ্গার পথের একটি নকশা তৈরি করেছিলেন। তিনিও অবশ্য মরিসন, প্রিন্সেপ, হজ ও লয়েড ও স্মিথ সাহেবের ম্যাপগুলির ওপর নির্ভর করেছিলেন।

বহু সহস্র বৎসর আগে ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি ভগীরথ একদিন

এই পথে শঙ্খধ্বনি করতে করতে গিয়েছিলেন, পিছনে মকরবাহিনী গঙ্গা কুলুকুলুরবে সাগরের পথে চলেছিল। গঙ্গার মকরের মতোই, এই কথা আজ প্রায় জনশ্রুতিতে পর্যবসিত হয়েছে। এ পথ দিয়ে হাঁটতে গেলে গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর এবং সেই সবুজ বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ বাংলার গ্রামগুলির পুরাতন কথা মনে করে মন উদাস হয়ে যায়।

সেবারে মকর সংক্রান্তির দু'একদিন আগে ডায়মণ্ডহারবারে কবাটি হাটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সরকারের পক্ষ থেকে সাগরযাত্রীদের কলেরা ইনজেকশন দেওয়া। ছেলেমেয়েরা ভয়ে কান্নাকাটি দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই দূরদূরান্তরের মানুষ, বহুমাস থেকে পদব্রজে যাত্রা করেছে গঙ্গাসাগরে স্নানের পুণ্য সঞ্চয় করবে বলে।

একজন দীর্ঘদেহী সাধু ইনজেকশন নিয়ে এসে কম্বল বিছিয়ে মেডিকেল ইউনিটটার পাশে। ডাক্তার তার সঙ্গে নানান কথা বলছিলেন, শুনলাম তার বাড়ি দারভাঙ্গায় এবং সমস্ত পথটা সে পদব্রজেই এসেছে। ডাক্তারকে বললে, 'আপনি যাবেন না?'

তারপর আবৃত্তি করল :

"সব্ তীরথ্ বার্ বার্,
গঙ্গাসাগর একবার।"

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন, মানে তিনি যেতে পারবেন না।

আমার কিন্তু মনে হয় সাধু ভুল করেছিল এবং আমরাও অন্যান্য দশটা রূপকের মতন এর ভুল ব্যাখ্যা করে এসেছি। আমি যেন দেখছিলাম ইক্ষ্বাকু বংশীয় নরপতি সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের অভিলাষ। মেঘের দেবতা ইন্দ্র দেখলেন মেঘবর্ষণের ফল হয় না, এই লবণাক্ত অঞ্চলে। কৃষিকাজ এখানে অসম্ভব। সগরবংশীয়রাই পারে শুধু এই অঞ্চলে মিষ্টি জলের ধারা আনতে। তা পারলেই তো সগরের ইন্দ্রের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে। ইন্দ্রেরই কৌশলে কপিলমুনির

আশ্রমে পাতালে (সাগর) ভস্মীভূত হল সগরের ষাটসহস্র পুত্র মুনির রোষানলে। মুনি অংশুমানকে জানান তার পূর্বপুরুষদের মুক্তির উপায়। বিরাট একাজের ক্ষমতা হবে মাত্র নরপতি ভগীরথের। তার কষ্টকর সাধনায় ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গার ধারা এ অঞ্চলের মুক্তি এনে দিল। লবণবারি আর সূর্যকিরণদগ্ধ জনপ্রান্তরের মুক্তি হল জাহ্নবীর মিষ্টিজলের করুণাধারাটি পেয়ে। ঐ মকর সংক্রান্তির দিনে তাই কপিলমুনির আশ্রমের মাঠে সমগ্র হিন্দু সমাজ পুণ্যস্নান করে। রামায়ণ মহাভারতের সেই মধুর কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষির পুনরুজ্জীবনের কথাটিও পরোক্ষে স্মরণ করে বৈকি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত সেচবিদ্যাবিশারদ স্যার উইলিয়ম উইলকক্সের ১৯৩০ খ্রীঃ প্রাচীন সেচ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের সুফল বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

চৌরঙ্গী

চৌরঙ্গীর মসৃণ তেল-চকচকে পিচের রাস্তা, আর বিরাট বিরাট দৈত্যাকার বাড়ি, রাস্তার পাশের সুদৃশ্য দোকান এবং সুন্দর গড়ের মাঠ দেখে কয়েক যুগ আগের চৌরঙ্গীর কথা মনে করা অসম্ভব। সেদিনের ঘন জঙ্গল, সাপ, বাঘ, গণ্ডারও নেই, দিনরাত্রি মশকের গুঞ্জন এবং ডাকাত ও নরকাপালিকদের সে বিভীষিকাও আর নেই। আজকের অসংখ্য মোটর এবং বাস-ট্রামের প্রবাহ দেখলে প্রাক্-ইংরেজ যুগের চৌরঙ্গীর কথা কল্পনাতেও আনা অসম্ভব।

খুব প্রাচীন পুঁথিপত্তর ঘাঁটলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীতে' যে-সব স্থানের বর্ণনা রয়েছে, তাতে কলকাতা, সালখে, চিৎপুর প্রভৃতির কথা থাকলেও চৌরঙ্গীর নাম উল্লেখ নেই। আদিগঙ্গা সে সময়ে মজা শুরু করেনি। গোবিন্দপুর গ্রামের পশ্চাতে লুকানো ঐ গ্রাম তখন এমনি ঠাসা জঙ্গলে পরিপূর্ণ যে সে-স্থানের উল্লেখ করার মতন কারণ কবি খুঁজে পাননি।

ইংরেজের কলকাতা আগমন এবং জোব চার্নকের এখানে বসবাসের সময় ঠিক হয় ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে, তাঁর তৃতীয়বার আগমনে। বাংলার নবাব তখন ইব্রাহিম খাঁ।

যে তিনটি গ্রাম ইংরেজরা কেনে সেগুলি হল, সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা। তিনটি নামেরই উৎপত্তি দেবতার নাম থেকে। গোবিন্দপুর মৌজা ছিল বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়মের মাঠ বা গড়ের মাঠ; তারই পূর্বপ্রান্তে এই চৌরঙ্গী মৌজার অস্তিত্ব ছিল পাইকান ও কলকাতা পরগনার মধ্যে। জমিদার ছিলেন সাবর্ণ মজুমদাররা। এঁদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, মহারাজ মানসিংহকে প্রতাপের বিরুদ্ধে সাহায্য করে লাভ করেন এই জমিদারী। কর্নওয়ালিশ প্রচলিত চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের প্রসিডিং-এ তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে জোব চার্নকের মৃত্যুর পরে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে শুরু করে। বাংলার নবাব এবং মুঘল কর্মচারী-দের কাছে ক্রমাগত ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে ইংরেজরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মুঘল আমলাদের হাত এড়ানোর জন্য কোম্পানি মনস্থ করলেন কলকাতার নিকটস্থ ৩৮টি গ্রাম তাঁরা কিনবেন। ভারত-সম্রাট তখন ফারুকশায়ার। কোম্পানি জন সারমানকে দূত হিসেবে দিল্লি পাঠালেন। গ্রামগুলি হল: (১) বাঁটরা (২) হাওড়া (৩) শালিখা (৪) রামকৃষ্ণপুর (৫) কাসুন্দিয়া (৬) শুঁড়া (৭) কুলি (৮) দক্ষিণবাড়ী (৯) কলিম্বা (১০) উল্টাডিঙ্গি (১১) ধলন্দা (১২) বেলগাছিয়া (১৩) তপসিয়া (১৪) বিরজি (১৫) চিৎপুর (১৬) ইন্টালী (১৭) ট্যাংরা (১৮) সপগাছি (১৯) কাঁকুরগাছি (২০) তিলজলা (২১) মিরজাপুর (২২) দক্ষিণ পাইকপাড়া (২৩) হোগলাকুড়ি (২৪) শ্রীরামপুর (২৫) বাহির দক্ষিণবাড়ি (২৬) মাকন্দ (২৭) শিয়ালদহ (২৮) জলাকলিম্বা (২৯) গন্দলপাড়া (৩০) গোবরা (৩১) চৌরঙ্গী (৩২) সিমলা (৩৩) কামার-পাড়া (৩৪) বাহির-শুঁড়া (৩৫) চৌবাগ (৩৬) বাগমারী (৩৭) শেখ-পাড়া (৩৮) আরকুলি। এখানে উইলিয়াম হ্যামিলটন সার্জেন হিসেবে দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং বাদশাহ ফারুকশায়ারের কুষ্ঠ রোগ তিনি আরোগ্য করেছিলেন। সেজন্য ফারমান পেতে সুবিধে হয়। হ্যামিলটনের সমাধিও জোব চার্নকের সমাধির সঙ্গে কলকাতায় সেণ্ট জন চার্চে সমাহিত আছে। এদের দলে ছিলেন ৪ জন। জন সারমান, এডওয়ার্ড স্টিফেনসন, সার্জেণ্ট হ্যামিলটন এবং আর্মেনিয়ান খোজা সারহদ। আটত্রিশটি (৩৮) গ্রাম কিনবার অনুমতি মিলল, ফারমান পাওয়া গেল। কলকাতায় আনন্দ উৎসব হল, বাজি পুড়ল কিন্তু বাংলার নবাব মুরশিদকুলী খাঁর সঙ্গে বিবাদের জন্য কেনা আর হয়ে উঠল না। সময়টা হল ইংরেজি ১৭১৭। এই আটত্রিশটি গ্রামের

মধ্যে চৌরঙ্গীও ছিল। এই মৌজার অবস্থান দেখানো হয়েছে কলকাতা এবং পাইকান পরগনার জলপূর্ণ ভূভাগের মধ্যে। খাজনা ছিল চৌরঙ্গী পাইকান পরগনার জন্য ৭৪৸৵, ঐ কলকাতা পরগনার জন্য ১৪৸৵৫ পাই।

সে সময়ে চৌরঙ্গীর উত্তরে ছিল কলিম্বা মৌজা (বর্তমান মেট্রো সিনেমার কাছে) এবং তালপুকুর মৌজা তার উত্তরে ধর্মতলা স্ট্রীট। ধর্মতলা স্ট্রীটের উত্তরে ডিঙ্গাভাঙ্গা এবং ডিহি কলকাতা। প্রাচীনকালে হেস্টিংস স্ট্রীট বরাবর একটি খাল ছিল, খালটি ডিঙ্গাভাঙ্গা, বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রীক রো হয়ে বেলেঘাটা সল্ট লেকে গিয়ে মিশেছিল। এপথে অনেকে চৌরঙ্গী আসত নৌকো করে। আর একটি পথ ছিল কলকাতার উত্তর থেকে কালীঘাট পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের রাস্তা। এপথে হেঁটে চৌরঙ্গী আসা যেত, তবে দিনে, রাত্রে নয়। কারণ, ও-পথে জঙ্গলে ঠ্যাঙাড়েদের, ডাকাতের এমনিধারা উপদ্রব ছিল যে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কেউ ওদিকে গেলে মূল্যবান পোশাক, দামি আংটি বোতাম খুলে রেখে যেত। পাল্কি বেহারাদের সন্ধের পর ও মুল্লুকে যেতে হলে দ্বিগুণ ভাড়া না দিলে বেঁকে বসত। এমনি ছিল চৌরঙ্গীর অবস্থা।

চৌরঙ্গীর সত্যকার উন্নতি শুরু হয় সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পর। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা যখন কলকাতা আক্রমণ করে বসলেন তখন কলকাতার গভর্নর ড্রেক সাহেব কৃতিত্বের সঙ্গে জাহাজে করে ফলতায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেদিনের প্রকৃত কলকাতা হল বর্তমান জি-পি-ও এবং কাস্টমস্ হাউস নিয়ে ফেয়ারলি প্লেস পর্যন্ত বিস্তৃত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ এবং তার কাছাকাছি কয়েকটি বাড়িঘর। এর চেহারা ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের ক্যাপ্টেন উইলসনের মানচিত্রে আঁকা রয়েছে।

যুদ্ধ খুব একটা হল না। আর ইংরেজদের তখন নাভিশ্বাস অবস্থা।

যুদ্ধ করবে কি! যা হল লালদিঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণের রাস্তায়, নবাব সেনাপতি মানিকচাঁদের সঙ্গে। ঐ গলিটির নাম পরে রণমত্তা লেন বা রণমুদি গলি হয় এবং বর্তমান নাম বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে আপজন রচিত ম্যাপে এই রাস্তাটি ঐ নামে পরিচিত।

আসল কথা হল এই যুদ্ধের ফলেই চৌরঙ্গীর বরাত ফিরল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারল যে, কেল্লার কাছাকাছি শহর থাকাটা খুব নিরাপদ নয়। সিরাজের কামানের গোলার আঘাতে বহু লোক পরলোকের পথে পা দিয়েছিল এবং বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ সময় স্থানীয় কোম্পানি কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্ত নিলেন যার জন্য বর্তমান কলকাতার চেহারা ভিন্নরূপ নেয়। প্রথমত, কলকাতা মৌজা থেকে কেল্লা সরিয়ে নেওয়া, দ্বিতীয়ত, কেল্লার সামনে প্রচুর ফাঁকা জমি যুদ্ধের জন্য রাখা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বেসামরিক গৃহগুলি সরিয়ে নেওয়া।

জঙ্গল কেটে ইংরেজরা ধর্মতলা, তালপুকুর, ডিঙ্গিভাঙ্গা, চৌরঙ্গী প্রভৃতি মৌজায় সরে আসতে থাকে। ওদিকে গোবিন্দপুর মৌজায় কেল্লার কাজের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের তুলে দেওয়া হয়। চৌরঙ্গী প্রভৃতি মৌজার উন্নতি শুরু হল। তবুও একথা বলতেই হবে, চৌরঙ্গীর উন্নতি একদিনে হয়নি। কলকাতার গুরুত্ব যত বেড়েছে ততই চৌরঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গিয়েছে।

সে সময়ে চৌরঙ্গীর মৌজার চৌহদ্দি ছিল এই রকমের: উত্তরে কলিঙ্গা তালপুকুর মৌজা। দক্ষিণে ডিহিব্রিজি মৌজা পূর্বে মারাঠা ডিচ্ এবং পশ্চিমে গোবিন্দপুরের মাঠ, যাকে লোকে বলত ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ এবং তার আগে চৌরঙ্গী মৌজার অধিকাংশই মাঠ বাঁশবন, বাগান, ডোবা, ধানের জমির সমারোহ। রাস্তাঘাট সবই কাঁচা। এ. আপজন ১৭৯২-১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা এবং তার চারপাশের যে মানচিত্র তৈরি করেন তাতে এ সময়কার চৌরঙ্গীর প্রকৃত চিত্র চমৎকার পরিস্ফুট। এই মানচিত্রে প্রদর্শিত অঞ্চল ছিল বাগান,

পুকুর পরিপূর্ণ এক ভূভাগ মাত্র। বাস্তুবাড়ির সংখ্যা খুবই কম।

১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খাস কলকাতা ছিল কুড়িটি মৌজা নিয়ে। যেমন ডিহি কলকাতা, বাজার কলকাতা, সুতানটি, চৌরঙ্গী প্রভৃতি। এর বাইরেটা ছিল পঞ্চান্নগ্রামের অনাবাদী জমি। তারপর একসময়ে উন্নতির প্রবল টানে কলকাতার কুড়িটি গ্রাম এবং পঞ্চান্ন-গ্রাম কলকাতা নামে পরিচিত হয়ে উঠল। গ্রামগুলি কোন স্থানে রাস্তার নামে কোন স্থানে পাড়ার নামের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কোনমতে বেঁচে রইল। চৌরঙ্গীর নামও রাস্তার নামে আশ্রয় করে কোনমতে বেঁচে ছিল কিন্তু বর্তমানে সে নামও পরিবর্তিত।

আজ চৌরঙ্গীর ভিন্ন এক রূপ আমরা দেখছি। অসংখ্য প্রাসাদ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকান, সিনেমা, মেট্রো রেলের ঐশ্বর্যে চৌরঙ্গী কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশগুলির একটি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছে। রাতের চৌরঙ্গীর রূপে লোকে বিমুগ্ধ। সে-যুগের যে-কোন লোককে আজ চৌরঙ্গীতে উপস্থিত করলে সে অবাক হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। এ এক আশ্চর্য রূপান্তর।

ভারতবর্ষে প্রথম বিমান-জরীপ

মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় আছে গগনপথ থেকে সমুদ্র উপকূলবর্তী পৃথিবী কেমন দেখায়। মহাভারত-রামায়ণে আছে দিব্য রথের ব্যবহার, কিন্তু কোনখানে ভূপৃষ্ঠের বর্ণনা পড়েছি বলে মনে পড়ে না। এই শতাব্দীতে মহাকাশ বিজয়ী য়ুরি গ্যাগারিন যখন রকেটে চড়ে অনন্ত শূন্য পাড়ি দিয়েছিলেন, তখন তিনি বিলীয়মান পৃথিবীর গোলাকার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বর্ণনা করেছেন পৃথিবীর সৌন্দর্য। তিনি হয়ত প্রথম মানুষ, যিনি পৃথিবীকে সর্বপ্রথম গোলাকার দেখেছেন।

সে যাই হোক, ভূপৃষ্ঠের চেহারা আকাশ থেকে যে পরিষ্কার দেখা যায়, একথা বিমানে যাঁরা চড়েছেন তাঁরাই বলেন। বিমান থেকে পৃথিবীর মাঠ, ঘাট, নদী, পাহাড়, পথ প্রভৃতি যে ছোট ছবির মতো দেখা যায়, এর থেকেই বিমান থেকে পৃথিবীর জরীপের সম্ভাব্যতার কথা নিশ্চয়ই মানুষের মনে এসেছিল। এবং ভারতবর্ষের জরীপের ইতিহাসের পুরাতন ধারার মধ্যে, প্রথম বিমান-জরীপ যে বাংলাদেশের মালদা জেলায় হয়, একথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এত দেশ থাকতে প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়-পাণ্ডুয়া কেন যে বিমান-জরীপের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল, সে কথা বলা খুব শক্ত।

সেটেলমেণ্টে যে ধরনের জরীপের ব্যবহার হয় তাকে বলা হয় ক্যাডাস্ট্রাল জরীপ অর্থাৎ রেভিনিউ বা রাজস্ব জরীপ। ভারতের ইতিহাসে প্রথম রাজস্ব জরীপ হয় শেরশাহের আমলে। মোগল আমলে প্রথম রাজস্ব জরীপ করেন সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে। এ জরীপের নাম হল 'আসলি জমা তুমার' এবং এ জরীপের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন মহারাজ তোডরমল্ল। মোগল আমলে আরও দুটি জরীপ হয়, একটি করেছিলেন শাহজাহান পুত্র, বাংলার তদানীন্তন

সুবাদার শাহ সুজা এবং সর্বশেষটি হয় সম্রাট মুহম্মদশাহর রাজত্ব-কালে, ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে। বাংলার শাসনকর্তা তখন মুর্শিদকুলি খাঁ।

ইংরেজ রাজত্বে জরীপের ইতিহাস বড় বিচিত্র। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর, কালেক্টররা তৌজি বিলি ও বণ্টন করার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত জরীপের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন। এর আগে বাংলার তামাম নদীগুলির গতিপথ নির্ণয় করে রেনেল সাহেব ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে একটি ম্যাপ তৈরি করেন। এ ম্যাপটি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে হয়েছিল এবং রাজস্ব জরীপ তো একে বলাই চলে না। সুতরাং বাংলাদেশে প্রথম রাজস্ব জরীপ আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই জরীপই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত জরীপ। মালদা জেলায় রেভিনিউ সার্ভেয়ার ছিলেন মিঃ পেম্‌বারটন্।

রেভিনিউ সার্ভেতে মৌজার বিশদ ম্যাপ এবং প্লটের চেহারা তৈরি হয়নি। সরকারের তৌজীগুলির সীমানা নির্ণয় এবং হিসেবের জন্যই এ জরীপের অনুষ্ঠান হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ অনুসারে জেলা জরীপ শুরু হল। প্রজাদের জন্য মৌজা ম্যাপগুলি এবং খতিয়ান তৈরির উদ্দেশ্যে ডিসট্রিক্ট সেটেলমেণ্ট একের পর এক শুরু হতে থাকে। চট্টগ্রাম দিয়ে এই জেলা জরীপ শুরু হয় (১৮৮৯-১৮৯৩ খ্রীঃ) এবং শেষ হল হাওড়া হুগলি জেলা জরীপ দিয়ে (১৯৩৮ খ্রীঃ)। এই সেটেলমেণ্টগুলির মূলসূত্র হল, প্রথম ট্রাভার্স অর্থাৎ থিওডলাইটের সাহায্যে মৌজার সীমান্তে বাঁশের খুঁটি পুঁতে মৌজার কঙ্কাল তৈরি করা।

তারপর হল কিস্তোয়ার। দলে দলে আমিন গিয়ে ম্যাপের কাগজে (**P-70 sheet**) তোলা ঐ খুঁটির চিহ্ন নিয়ে মৌজার ম্যাপ রচনা করে। এই ম্যাপ সৃষ্টিতে আমিনরা বাঁশ, চেন, ডিভাইডার, স্কেল প্রভৃতির সাহায্যেই কাজ করে থাকে। এরপর ঐ ম্যাপের প্লটের নম্বর এবং কালি দেওয়া হলে তার উপর রেকর্ড সৃষ্টি হয়। যাকে সেটেল-

মেন্টের ভাষায় বলে খানাপুরী, বুঝারত এবং পরে তজদিগ (Attestation)। এইভাবেই প্রাথমিক রেকর্ড সৃষ্টি হয়।

সে যাই হোক, মাঠে গিয়ে এই ম্যাপ তৈরি করতে বহু লোকের সম্মিলিত পরিশ্রম এবং বহু অর্থের প্রয়োজন। এক একটি সেটেলমেণ্টে প্রয়োজন বহুশত লোক এবং লক্ষাধিক টাকা। বর্তমান শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে বিমানযানের উন্নতি হতে থাকে। ইউরোপের দেশগুলি দেশের জরীপে বিমান ব্যবহারের কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিল। আমাদের দেশে, মালদায় সেটেলমেণ্ট শুরু হয় ১৯২৮ সনে। এ সময়ে ২৪-পরগনায় সেটেলমেণ্ট চলছিল। সেখানকার চার্জ-অফিসার, এম. ও. কার্টার সাহেব এলেন মালদার সেটেলমেণ্ট-অফিসার হয়ে। ২৪-পরগনা টাউন জরীপে এবং কলকাতা গল্‌ফক্লাবের গোলমাল মীমাংসায় তিনি সেবার খুব নাম করেছেন। সরকার ঠিক করলেন, মালদার জরীপে বিমানের সাহায্য নেওয়া হবে। কার্টার সাহেবও এই নতুন কাজের আহ্বানে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিলেন।

চুক্তি হল 'এয়ার সার্ভে' কোম্পানির সঙ্গে। চুক্তি অনুমোদন করতে সরকার দেরি করে ফেললেন। তবু তাড়াহুড়ো করে আরম্ভ করা গেল। প্রথমে চাই পরীক্ষা। সেজন্য বেছে নেওয়া হল মালদার হবিবপুর ও বামনগোলা থানা, প্রায় একশত বর্গমাইল এলাকা। পরীক্ষা শুরু হল যখন, তখন ১৯২৮ সনের শীতকাল এবং শেষ হল ১৯২৯ সনের বসন্ত-কালে।

নির্দিষ্ট জমিকে উত্তরে দক্ষিণে লম্বা করে কতকগুলি ভাগ করে ফেলা হল (স্ট্রিপ)। মাটিতে দশফুট লম্বা করে ট্রেঞ্চ ক্রসের মতো করা হল, এগুলি হল কন্ট্রোলিং পয়েণ্ট। বিমান থেকে এগুলি দেখে বিমান ঠিক মতো উড়বে। অত্যাবশ্যক কাজে বিমান অবতরণের জন্য মথুরাপুর গ্রাম নির্দিষ্ট রইল। ঠিক হল, বিমান সোজা উত্তর-দক্ষিণ স্ট্রিপের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে নিচের মাটির ছবি তুলবে, তারপর একটি স্ট্রিপ শেষ হলে ঘুরে

অন্য স্ট্রিপে গিয়ে ফটো তুলবে।

প্রথম দিন। প্লেন রেডি। ক্যামেরাম্যান ক্যামেরায় ফিল্ম পুরতে গিয়ে দেখে, ইংলণ্ড থেকে যত ফিল্ম এসেছিল, সব ভারতীয় উষ্ণ আব-হাওয়ায় গলে গিয়েছে। কাজ আবার পিছিয়ে পড়ল।

ইংলণ্ড থেকে আবার নতুন অর্ডার মতো আবহাওয়া-উপযোগী ফিল্ম এল। এবার সেই ফিল্ম নিয়ে এয়ার সার্ভে কোম্পানির বিমান ৬ হাজার ফুট উপর দিয়ে ছবি তুলল। প্রথম ব্যাচ ছবি মালদা হয়ে কলকাতা গেল। সেখানে নেগেটিভগুলি জোড়া দিয়ে ফটোর প্রিণ্ট-তোলা এবং তারপরে রেভিনিউ জরীপের ম্যাপে মৌজাগুলির সীমারেখা এঁকে দিয়ে মালদায় ফেরৎ পাঠানো হল। এখন দেখা প্রয়োজন, ম্যাপের স্কেল ঠিক আছে কিনা। কার্টার সাহেব তাঁর টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার নলিনী-কিশোর গুপ্তকে নিয়ে হবিবপুর থানার মাঠে গেলেন। প্রথমে তাঁরা চেষ্টা করলেম, তাঁরা যে প্লটটিতে দাঁড়িয়ে আছেন সেটি চিনবার

বহুকষ্টে তাঁরা বের করলেন কোন্ প্লটে তাঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু দেখা গেল, ছবির সঙ্গে সরেজমিনের মিল হচ্ছে না। আকাশ-জমিন ফারাক হচ্ছে স্কেলে। কোম্পানি তখন নিজের খরচে আবার ট্রাভার্স করলে সমগ্র এলাকা এবং ট্রাভার্সের অঙ্কগুলি কলকাতার বেঙ্গল ড্রইং-রুমে পাঠান হল। বিমান থেকে যে ছবি তোলা হয়েছিল, সেটা হল ৬ ইঞ্চি স্কেলে (অর্থাৎ ম্যাপের ৬ ইঞ্চি, জমিতে এক মাইল) একে বলা হত কনট্যাক্ট প্রিণ্ট। মৌজা ম্যাপ হবে ষোল ইঞ্চি স্কেলে, সুতরাং রূপান্তর করা প্রয়োজন। একটা কথা বলা প্রয়োজন, সাধারণত বিমান-জরীপে ট্রাভার্স প্রয়োজন হয় না, এক্ষেত্রে করা হয়েছিল ছবির স্কেলের বিশুদ্ধ-তার জন্য। যাই হোক, এয়ার সার্ভে কোম্পানির ট্রাভার্স অঙ্কগুলি নিয়ে এবং নানা রকমের প্রক্রিয়ার সাহায্যে জমি, ছবির ভুলের পার্থক্য অনেক কমিয়ে ফেলা হল। আরও অনেক খুঁত হচ্ছিল, যেমন ছবি তোলার সময়ে বিমান যদি একটু কাৎ হত বা বাম্পিং হত তাহলে

ম্যাপে ভুল হত। অথবা নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট তোলার সময়ে যদি একটু কুঁচকে থাকত কাগজ, তাহলেও স্কেলের ভুল হত।

এদিকে বিমান পরীক্ষায় সময় কেটে যাচ্ছে,—অথচ একখানাও ম্যাপ বেরুচ্ছে না দেখে পুরাতনপন্থী অফিসাররা নাক কুঁচকোলেন। তাঁরা চাপ দিলেন যে, মালদাকে দুভাগে ভাগ করে অন্তত এক ভাগ ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করলে হত দেরি হচ্ছে দেখে বোর্ড থেকে সেই রকমই অর্ডার বেরুল। মালদা জেলার ৮০২ বর্গমাইল এলাকায় সাধারণ জরীপ শুরু হয়ে গেল। বাকি ৭৮৩ বর্গমাইল রইল বিমান-জরীপের জন্য। মালদার প্রকৃত আয়তন ১৯৮৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৪০১ বর্গমাইল দিয়ারা চর। এই সেটেলমেণ্টে যা মাপ হয়নি।

অবশেষে ১৯২৯ সনের এপ্রিলের শেষাশেষি পরীক্ষান্তে কোম্পানি দেখলেন যে, ভুল অনেক কমে এসেছে, এবার কাজ চালানো যেতে পারে। এবারে তাড়াতাড় দুই থানার জমিকে ৭টি ভাগে ভাগ করে, এক-একজন কানুনগোর চার্জে দিয়ে দেওয়া হল। ম্যাপ তো পূর্বেই হয়েছে, এবার খতিয়ান তৈরির প্রাথমিক কাজও (খানাপুরী) জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেল

১৯৩০ সন সার্ভের ইতিহাসে নিশ্চয়ই একটি বিখ্যাত বছর। এই বছরই পুজোর পর মালদার বাকি এলাকায় বিমান-জরীপের কাজ শুরু হল। মালদায় তখন কৃষকেরা আমন ধান লাগিয়েছে, হেমন্তের দিন-গুলিতে সে ধান মালদার মাটির ঐশ্বর্য প্রকাশ করে জমি আবৃত করে রয়েছে।

ডিসেম্বরে ধান কাটা শেষ হয়ে গেল। বিমান গুঞ্জন করে মালদার আকাশে উঠল ছবি তোলার জন্য। প্রতিদিন ৮০ বর্গমাইল করে ছবি তোলা হতে লাগল। ১৯৩১ সনের মধ্যে মালদার বাকি জমির বিমান-ছবি এবং খানাপুরীও শেষ হয়ে গেল। এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মালদার সেটেলমেণ্টে ভারতবর্ষের প্রথম বিমান-জরীপের কাজ শুরু হয়। এর আগে চট্টগ্রাম-সেটেলমেণ্টে চট্টগ্রামের বনময় ভূভাগ বিমান থেকে আট ইঞ্চি স্কেলে ছবি তুলে ম্যাপ তৈরি হয়। কিন্তু তাকে সেটেলমেণ্টের মৌজা ম্যাপ বলা চলে না। সুতরাং, প্রথম বিমান-জরীপের গৌরব বাংলাদেশের মালদারই প্রাপ্য।

এর পরে দিনাজপুর সেটেলমেণ্টে (১৯৩৪-৪০) এবং রংপুরের সেটেলমেণ্টে (১৯৩১-৩৮) এই বিমান-জরীপ পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ হয়েছিল, তখন অবশ্য এই পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়েছে। পরে কিন্তু বাংলাদেশের জরীপ বিভাগে সেটেলমেণ্ট অপারেশন আর কোনদিন বিমানের সাহায্যে হয়নি। কেন হয়নি তা কে জানে!

এয়ার সার্ভে কোম্পানি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাঁদের মালদার জরীপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেটেলমেণ্টের ডিরেক্টরের রিপোর্টে দেখা যায়, সাধারণ নিয়মের চেয়ে সরকার এই পদ্ধতিতে লাভ করেছিল প্রতি বর্গমাইলে সাঁইত্রিশ টাকা।

এ আলোচনার যবনিকা টানার পূর্বে এইটুকু বলা হয়ত প্রয়োজন যে, বিমান-জরীপের পদ্ধতি এখন আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় আরও উন্নত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, চেন, বাঁশ, টেবিল নিয়ে শত-শত লোকলস্কর, আমিন, কানুনগো মাঠে পাঠিয়ে সনাতন পদ্ধতিতে জমির ম্যাপ তৈরি করার চেয়ে বিমান-জরীপ অনেক সহজসাধ্য এবং লাভজনক। অনেকে বিমান-জরীপ সম্পর্কে আজও সন্দেহ করেন; কিন্তু তাঁরা সময়ের অগ্রগতির কথা বিস্মৃত হন। দেশ যখন নতুন নিয়ম, নতুন বিজ্ঞানের অবদানের পলিমাটিতে ভরে উঠেছে, তখন পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রেখে কি লাভ?

২৪ পরগনা জেলা জরীপ

২৪ পরগনার জেলা জরীপ (District settlement) শুরু হয়েছিল ইংরেজি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে আর শেষ হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে। নানাদিক দিয়ে এই জেলা জরীপটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য।

এই জরীপে ২৪ পরগনার রায়ত, কোর্ফা, মধ্যস্বত্বাধিকারি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর জমির দখলকারদের হাতে সে সময়কার ইংরেজ সরকার নির্ভুল মৌজা মানচিত্র, এবং জমি-জমার খতিয়ান বা স্বত্বলিপি তৈরি করে তুলে দিয়েছিলেন।

এই প্রথম এই জেলার বিস্তারিত মৌজা ম্যাপ তৈরি হল এবং তাতে দাগ বা প্লট নম্বর (C. S. Plot), আলামত চিহ্ন ইত্যাদি অঙ্কিত হল। এই জেলা জরীপের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে 'সুন্দরবন জরীপ' এবং 'জমিদারি গ্রহণ আইনে'র (১৯৫৩ খ্রীঃ) রূপায়ণে রিভিশনাল জরীপ (Revisional Settlement) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আগের একটি নিবন্ধে আমরা বলেছি যে জেলা জরীপের পূর্বে এই জেলায় দুটি জরীপ হয়েছিল। প্রথমটি 'থাক্ সার্ভে' (Thak Survey), দ্বিতীয়টি হল 'রাজস্বজরীপ' (Revenue Survey)। এই জরীপ দুটির উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল তৌজি বা (Estate)-এর সীমানা ইত্যাদি চিহ্নিত করা। মৌজা-ম্যাপ বা কৃষকদের জমিজমার ব্যাপারে উপরি-উক্ত জরীপে কোন কাজ হয়নি।

সে যাই হোক, ২৪ পরগনার এই জেলা জরীপ শুরু হয়েছিল খুলনা জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার ফকাস সাহেবের (L. R. Fawcus, I C.S.) নেতৃত্বে, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে। ফকাস সাহেব একবছর দু' মাসের কিছু বেশি সময় এ জেলার দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনিই এই জরীপের প্রারম্ভিক কাজকর্ম শুরু করেছিলেন।

জেলা জরীপ শুরু হল, সে সময়কার বাংলা সরকারের রেভিনিউ বিভাগের ১০,৫৩৯ এল. আর. তাং ২০।১১।১৯২৩ নম্বর আদেশ পত্র অনুযায়ী (Revenue Dept's order no. 10539 L. R. dated 20-11-23) ।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ (Bengal Tenancy Act 1885)-এর নির্দেশমতো এই জেলা জরীপের কাজ শুরু করা হল।

ফকাস সাহেবের পরে এই জেলার জরীপের কাজের ভার নিলেন মিঃ বার্জ (B. E. J. Burge, I.C.S)। এই ২৪ পরগনার জরীপের কাজকর্ম প্রকৃতপক্ষে বার্জ সাহেবই সমাপ্ত করেছিলেন। শুধু মাঝে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে বার্জ কয়েকমাস ছুটিতে থাকায় মিঃ হিল (K. A. L. Hill I. C. S.) সে সময়টুকুর জন্য সেটেলমেণ্ট অফিসারের কাজকর্ম চালিয়েছিলেন।

এরপর বার্জ একনাগাড়ে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করে ছুটি ভোগ করতে চলে যান। এরপর তিনি জরীপ বিভাগে আর কোনদিন ফিরে আসেননি। ছুটির শেষে তিনি মেদিনীপুর জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজে যোগদান করেন। সেই সময়েই তিনি স্বদেশীদের হাতে পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারান।

এই ঐতিহাসিক জরীপে অন্যান্য অফিসাররা ছিলেন, L. G. Pinnel I.C.S. / M.O. Carter I.C.S. / K. K. Chatterjee I. C. S.। এঁরা সকলেই ২৪ পরগনা জেলা জরীপের চার্জ অফিসার ছিলেন। সে সময়কার আই. সি. এস. অফিসারদের মধ্যে একমাত্র মিঃ কে. কে. চ্যাটার্জী ছিলেন ভারতীয় আই. সি. এস. আফসার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল মাত্র অল্প ক'দিন কাজ করে (৪ মাস) তিনি অসুস্থ হয়ে ছুটি নিয়ে বাড়িতে চলে যান। তিনি জরীপ বিভাগে আর ফিরে আসেননি, কারণ অসুস্থ অবস্থায় তিনি মারা যান।

জেলা জরীপে ১১ জন ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর, ৫ জন মুনসীফ্ এবং ২৯ জন সাব ডেপুটি কালেক্টর। রেভিন্যু অফিসার ছিলেন ২৩ জন (রাজস্ব-ক্ষমতাপ্রাপ্ত কানুনগো), ৯০ জন কানুনগো।

এই জরীপের আমিন, পেশকার, যাঁচ মোহরার (মুহুরি), চেন পিওন, পিওন প্রভৃতির বিরাট বাহিনীর সংখ্যা আজ আর বলা সম্ভব নয়। এঁদের সকলেই ভারতীয় ছিলেন এবং অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী।

জরীপের দীর্ঘ তালিকা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পি. আর. দাশগুপ্ত (P. R. Das Gupta), দীনেশ গুপ্ত পরবর্তী কালে বিভাগের ডিরেক্টর হ'তে পেরেছিলেন।

তাছাড়া কানুনগো হিমাংশু অধিকারী (ইনি দিনাজপুর অপারেশন থেকে এসেছিলেন) রিভিশনাল জরীপে ২৪ পরগনা জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

জেলা জরীপ যখন শুরু হয় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে, তখন ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস অ্যাণ্ড সার্ভে (D. L. R. & S.) ছিলেন Mr. A. K. Jameson, I.C.S. এবং শেষ যখন হয় তখন ডিরেক্টর ছিলেন Mr. J. B. Kindersely, I.C.S.।

জেলা জরীপের সময় ২৪ পরগনা জেলার আয়তন ধরা হয়েছিল ৪,৮৪৪ বর্গমাইল।

এর মধ্যে ১৬৭১.৬২ বর্গমাইল এলাকা জমি উপরি-উক্ত আইনের ক্ষমতা বহির্ভূত বলে এই জরীপের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। যেমন কলকাতা কর্পোরেশনের জমি, ব্যারাকপুর মিলিটারি ক্যাণ্টনমেণ্টের জমি, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বড় বড় নদী প্রভৃতি।

সবকিছু কাটছাঁটের পরে জেলা জরীপ শুরু হল ৩২৭৩.৩৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে। এই জরীপের প্রথম কাজ ট্রাভার্স (Traverse) শুরু হয়েছিল ১৯২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দে এবং শেষ

হল ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে।

ট্রাভার্স হল থিওড লাইটের (Theod Light) সাহায্যে ট্রাভার্স দল সরজমিনে (অর্থাৎ গ্রামে বা মৌজায়) মানচিত্রের কঙ্কাল রচনা করে দিয়ে আসে কতগুলি ছোট ছোট বাঁশের খুঁটি (Peg) পুঁতে দিয়ে এসে। এই খুঁটিগুলির সঠিক অবস্থান তারা P-70 নামক মানচিত্রের কাগজে অঙ্কন করে দেয়।

পরবর্তী জরীপের দল (আমিন, কানুনগো ইত্যাদিরা)—মাঠে খুঁটিগুলি খুঁজে বার করে মেপেজুকে দেখেন, খুঁটিগুলির পরস্পর দূরত্ব সরজমিনে এবং P-70 সীটে সমান হচ্ছে কিনা।

তারপর তাঁরা ঐ P-70 সীটে মানচিত্র রচনা করেন।

এই ট্রাভার্স দল সুন্দরবনের জলজঙ্গল পরিপূর্ণ অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের অসুবিধেয় পড়েছিল। সে সময়ে সুন্দরবনে ঐসব এলাকায় মানুষজনের বসতি না থাকায় মৌজা বা গ্রামের সীমানা দেখিয়ে দেবার লোক ছিল না। ফলে, ট্রাভার্স-দল (Traverse Party) গ্রামের বাইরের নানা শ্রেণীর Cross-Bundh-গুলিকে গ্রামের সীমানা ধরে বহুক্ষেত্রে ভুল করেছিল। আবার মিল্ ও ফ্যাক্টরির ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ট্রাভার্স-দল খুঁটি (Peg) পোতা নিয়ে অন্য রকম অসুবিধেয় পড়েছিল।

এইসব অঞ্চলে প্রচুর যানবাহন চলাচলের জন্য খুঁটিগুলি গভীর করে মাটির তলায় বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে কারখানা বা বাড়ির পার্শ্ববর্তী দেয়ালে খুঁটির নিশানা এঁকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

নানারকম অসুবিধে সত্ত্বেও জেলা জরীপের ট্রাভার্স দলের কাজকর্ম সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল।

কিস্তোয়ার (Kistwar) :

জরীপে ট্রাভার্সের পরবর্তী কাজ হল 'কিস্তোয়ার'। ট্রাভার্স করা P-70

Sheet (ম্যাপের কাগজ)-এর উপর আমিনরা কতকগুলি মোরব্বা বা বহুভুজ তৈরি করে গাণ্টার চেন, অপটিক্যাল স্কোয়ার (**Optical Square**) ইত্যাদির সাহায্যে মাঠের জমির চেহারা বা দাগ (**Plot**)-এর ছবি ম্যাপের কাগজের উপর হুবহু তুলে নেয়। ২৪ পরগনা জেলায় যেমন যেমন ট্রাভার্স শেষ হয়েছে, তেমন তেমন কিস্তোয়ার করা হয়েছে।

ভূপ্রকৃতির বৈচিত্রের জন্য জেলায় কিস্তোয়ার এক এক এলাকায় এক এক রকম করতে হয়েছিল। যেমন :

(১) সুন্দরবন এলাকায় বড় বড় নোনা নদী, খাল, বৃহৎ ক্রসবাঁধ, বকচর ইত্যাদির বাধা থাকায় নানারকম প্রযুক্তিকৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল।

(২) শহর ও শিল্পাঞ্চলে যেমন ব্যারাকপুর, নৈহাটি, বেহালা, প্রভৃতি এলাকায় খুব ঘন জনবসতির জন্য 'মানচিত্র' তৈরি করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। এসব অঞ্চলে জমির দাম খুব চড়া হওয়ায় মানচিত্র ৩২″ ও ৬৪″ স্কেলে (জমির ১ মাইল, মান. চিত্রের ১৬″ বা ৬৪″) তৈরি হয়েছিল।

(৩) বড় বড় বিল এলাকায়, যেমন বাসিরহাট মহকুমার বিল-বস্তীতে অন্যরকম সমস্যা দেখা গিয়েছিল।

(৪) সুন্দরবনের বিশাল বিশাল জলমগ্ন এলাকায় এবং বনাঞ্চলে ভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয়।

যেমন ৭০ ও ৭২ নং লটের (**Lot**) অংশ জরীপের আগে থেকে নোনা জলে পরিপূর্ণ ছিল।

সেখানে চাষের কোন সম্ভাবনা না থাকায় ভেড়ি মাছ চাষে (**Saline water fishery**) রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

ঐ সমস্ত দাগের প্রজারা অন্যত্র চলে যাওয়ায় তাদের দাগ (**Plot**) আর কিস্তোয়ার করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। ঐ সমস্ত বিশাল বিশাল জলাভূমির সীমানা শুধু ফুট্‌কি (**dot line**) দিয়ে মানচিত্রে

দেখানো হয়েছিল।

মানচিত্র তৈরি হলে পরে, পরের ধাপ হল খানাপুরি (Khanapuri)। মানচিত্র ও খতিয়ান ফর্ম নিয়ে কানুনগো ও আমিনরা মাঠে গিয়ে জমির শ্রেণী, দাগ নম্বর, মালিক, ইত্যাদি পূরণ করে নিয়ে আসত।

তারপরের ধাপ হল বুঝারত (Bujharat)। এখানে দক্ষ কানুনগো মাঠে গিয়ে ঐ খতিয়ানের বাকি গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি পূরণ করে আনত।

শেষে তসদিক (Attestation) কাজ শুরু হল রেভিনিউ অফিসারদের দিয়ে। তারপরের ধাপ হল বেঙ্গল টেনান্সী আইনের ১০৩ ধারা মতে তসদিক করা খতিয়ানে দাখিল করা আপত্তির বিচার। এই সমস্ত বিচার করেছিল মুনসেফরা।

২৪ পরগনা জেলা রিপোর্টে দেখা যায় সমস্ত ২৪ পরগনা জেলায় ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ১০৩ ধারায় মোট আপত্তি পড়েছিল ২৫,৯৯৭টি। রেকর্ড সংশোধন করতে হয়েছিল ৫১,৭৭৫টি।

এরপরে খতিয়ান (Record of right)-গুলি ও মানচিত্র ভালো করে পরীক্ষা করে সংশোধন করা হল। একে জরীপের ভাষায় বলা হয় যাঁচ্ (Janch) করা।

জেলা জরীপের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল বেঙ্গল ড্রইং অফিসের কাজ। এখানে মানচিত্র বা ম্যাপ ছাপা হবার আগে পরীক্ষা করে পার্শ্ববর্তী মৌজার সঙ্গে সীমানা মিলিয়ে দেখা হত। তাছাড়া এখানে মানচিত্রে রেললাইন, খাল বিল, নদী ইত্যাদি সব আলামত (Conventional signs) চিহ্ন ঠিকমতো তোলা আছে কিনা খতিয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হত।

এই সময় বেঙ্গল ড্রইং অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন নলিনীপ্রসন্ন গুপ্ত (১৯২৭ সন পর্যন্ত) এবং তারপর ছিলেন লালমোহন বসু (১৯৩০ সন পর্যন্ত)। জেলা জরীপের সর্বশেষ ধাপ ছিল মৌজা

মানচিত্র ও অন্যান্য মানচিত্র এবং খতিয়ানের ছাপার কাজ। পরে এই সকল মানচিত্র ও খতিয়ান জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি করা হয় ; যাতে করে তারা তাদের জমিজমার বিবরণ পেতে পারে।

২৪ পরগনা জেলা জরীপের কাজ নিয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা হল, তাতে একটি প্রশ্ন কৌতূহলীদের মনে জাগতে পারে।

প্রশ্নটি হল মৌজার বা মৌজাগুলির সীমানা কিসের ভিত্তিতে চিহ্নিত হয়েছিল।

এ সম্পর্কে সে সময়কার রিপোর্টে দেখা যায় যে রেভিন্যু সার্ভের (Revenue Survey, 1846) সময়ে যে গ্রাম বা অঞ্চলকে মৌজা (Mouza) বলে রেভিন্যু সার্ভের মানচিত্রে তোলা হয়েছিল, জেলা জরীপেও সেগুলিকেই মৌজা বলে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু কাজের সুবিধের জন্য তিন প্রকার ব্যতিক্রম করতে হয়েছিল, যেমন :

১. যেখানে দেখা গেছে যে রেভিন্যু জরীপের মৌজা খুব বড় আকারের সেখানে ঐ মৌজাকে ভেঙে দুই বা তিন মৌজাতে পরিণত করা হয়েছে।

২. যেখানে দেখা গেছে রেভিন্যু জরীপের মৌজা খুবই ছোট এবং মৌজার মোট জমির পরিমাণ ১০০ একরের কম, সেখানে ঐ মৌজা অন্যকোন পার্শ্ববর্তী মৌজার সঙ্গে সংযুক্ত (Amalgamation) করে দেওয়া হয়েছে।

৩. সুন্দরবনের যে সমস্ত অঞ্চলে রেভিন্যু সার্ভে হয়নি, এবং মৌজা বলে ঘোষিত হয়নি, সে সমস্ত এলাকার লট (Lot) গুলিকেই মৌজা বলে ধরা হয়েছিল।

২৪ পরগনার জেলা জরীপ শুরু হয়েছিল ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে এবং শেষ হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। দীর্ঘ নয় বৎসরের উর্ধকাল পর্যন্ত কাজ চলেছিল।

দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য আমিন, চেন পিওন, কানুনগো, রেভিন্যু অফিসার (রাজস্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত কানুনগো), মুনসিফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই জরীপ সুসম্পন্ন করেন। এঁদের ওপর ছিল বিদেশী অফিসারদের তীক্ষ্ণ পরিদর্শন।

জেলা জরীপ সম্পর্কে তৎকালীন হেডকোয়ার্টার অ্যাসিস্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার রায়সাহেব অনিলচন্দ্র লাহিড়ী সম্পাদিত সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যাবে। রিপোর্টটি খুব যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছিল এবং তৎকালীন বাংলার সবগুলি জেলা জরীপের রিপোর্ট থেকে এই পুস্তকটি উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়। রিপোর্টটি থেকে ২৪ পরগনা জেলার প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ, শহর ইত্যাদির বিবরণ, রাস্তাঘাট, নদনদী, কৃষি, শিল্প এবং মানুষ ও জমির শ্রেণী, জলবায়ু এমনকি সাইক্লোনের ইতিহাস পর্যন্ত জানতে পারি।

জেলা জরীপের ফলে অনেক মূল্যবান তথ্য আমরা পেয়েছি, যেমন ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পরে যে ২৪টি মহল / পরগনা নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি পেয়েছিলেন, তার আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গমাইল। অর্থাৎ, প্রায় বর্তমান ব্যারাকপুর, সদর (সুন্দরবন এলাকা বাদে) এবং ডায়মণ্ডহারবার (সুন্দরবন এলাকা বাদে) মহকুমার সমান এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ। পূর্বে কলকাতা এবং ২৪ পরগনার শাসন চলত একই সঙ্গে কলকাতা থেকে।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগনা থেকে কলকাতার এবং শহরতলির শাসনব্যবস্থা পৃথক করা হল।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা শহরের শাসনভারকে (পঞ্চান্নগ্রাম বাদে) ২৪ পরগনার শাসনযন্ত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে জেলা কালেক্টরেট তৈরি হল।

কিন্তু ২৪ পরগনা জেলার শাসন কলকাতা থেকেই চালানো হত।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগনার সদর দপ্তর প্রথম কলকাতা থেকে সরিয়ে বারুইপুর শহরে নিয়ে আসা হল। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার সদর দপ্তরকে পাকাপাকিভাবে আলিপুরে বসানো হল। সেই ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ২৪ পরগনা জেলার সদর দপ্তর আলিপুর শহরে আছে। বর্তমানে জেলা ভাগ হওয়ার ফলে (১মার্চ ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ) আলিপুর এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সদর দপ্তর। এ সময়কার জরীপের বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, পূর্বে বরানগর ও ফলতা কেল্লা অঞ্চল ওলন্দাজদের (Dutch) অধীনে ছিল।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ওলন্দাজরা দূরপ্রাচো কিছু বাণিজ্যিক সুবিধার বিনিময়ে এই দুইটি শহরের মালিকানা ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়। ক্রমে বরানগর ও ফলতা শহর দুটি ২৪ পরগনা জেলায় চলে এলো।

মজার কথা হল, গত শতকে বারাসত নামে একটি জেলার সৃষ্টি হয়েছিল, তার সদর দপ্তর ছিল বসিরহাট শহরের কাছে বাগুন্দি গ্রামে বা শহরে।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ঐ সদর দপ্তর (Head Quarter) তুলে আনা হল বারাসত শহরে। অনেকদিন পর্যন্ত বারাসত জেলা নামে একটি পৃথক জেলার অস্তিত্ব সগৌরবে বজায় ছিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে বারাসত জেলা লোপ করে, এটিকে একটি মহকুমা বলে ঘোষণা করা হল। এবং বারাসত মহকুমাকে ২৪ পরগনা জেলার একটি মহকুমা করা হল।

গত জেলা জরীপের রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, ২৪ পরগনা জেলার আয়তন ছিল ৪৮৫৬ বর্গমাইল। মহকুমা ৫টি, সদর / বারাসত / বসিরহাট / ডায়মণ্ডহারবার / ব্যারাকপুর, এবং থানা ছিল ৩৯টি। তৎকালীন জেলার নানা ধরনের তথ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, জেলার কর্ষণযোগ্য চাষের জমির পরিমাণ ছিল, ৩২৫৯·৭০ বর্গমাইল, তার মধ্যে ২১৯৮·০৩ বর্গমাইল জমিতে চাষ হত।

জমির শ্রেণী ছিল, শালি / ডাঙা / বাস্তু / রাস্তা / পথ / শ্মশান / কবরস্থান / মন্দির / মসজিদ / ভেরি মাছ চাষ / ঘেরি / নদী / খাল / বিল / পুকুর / ডোবা / বাঁধ ইত্যাদি।

ভারত সম্রাটের খতিয়ানের অধীন প্রজাদের স্বত্ব নিম্নরূপ ছিল :

মালিক / মধ্যস্বত্বাধিকারি / নিম্ন মধ্যস্বত্বাধিকারি / রায়ত স্থিতিবান / রায়ত দখলি স্বত্ববিশিষ্ট / রায়ত দখলি স্বত্বশূন্য / কোর্ফা / দখলকার যেমন জলকর, ফলকর, বনকর, ঘাসকর ইত্যাদি / দেবোত্তর / পীরোত্তর / ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি।

সে সময়কার রিপোর্টে সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক বিশদ বিবরণ থেকে থেকে আমরা জানতে পারি, কত পরিশ্রমে, কত যত্নে এবং অধ্যাবসায়ে সুন্দরবনকে বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছিল।

এ ছাড়া ধাপা অঞ্চল, ফ্রেজারগঞ্জ সমুদ্রাবাস, পোর্ট ক্যানিং, হ্যামিলটন সাহেবের কো-অপারেটিভ প্রভৃতি অঞ্চলের বিকাশের চমৎকার প্রচেষ্টার ইতিহাসও পাওয়া যায়।

এই জরীপকে বলা হত Plane Table Survey। জেলা জরীপে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল, তাদের নাম ছিল নিম্নরূপ :

থিওড্ লাইট / গান্টার চেন (২২ গজ বা ১০০ লিঙ্ক দীর্ঘ) / ডিভাইডার / গুনিয়া বা আইভরি স্কেল / অপটিকাল স্কোয়ার / একার কম্ব (acre comb.) / তিন পায়া টেবিল (Plane Table) / বাঁশের একটি নল / মেটাল স্কেল প্রভৃতি।

সে সময়কার জরীপে সরকারের মোট খরচ হয়েছিল, ৪৩,৭৯,৫১০ টাকা।

এই জরীপ যখন শুরু হয় (১৯২৪ খ্রীঃ) তার আগেই সেটেলমেণ্ট বিভাগ রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে উঠে এসেছে আলিপুরের নবনির্মিত সার্ভে বিল্ডিংয়ে। সে সময়ে ডিরেক্টর ছিলেন A. K. Jameson, I. C. S.

আর যখন শেষ হল ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে, তখন ডিরেক্টর ছিলেন J. B. Kindersley, I. C. S.।

এই জরীপে যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল সাইকেল / ঘোড়া নৌকা / মোটর লঞ্চ / পালকি ইত্যাদি।

মোটামুটিভাবে ২৪ পরগনা জেলার ডিসট্রিক্ট সেটেলমেণ্টের কথা এখানে আলোচিত হল।

সেদিনকার দিনে এই জরীপে জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই জরীপেই প্রথম গ্রাম বা মৌজার বিভিন্ন শ্রেণীর জমির নাম-করণ হয়ে দাগ নম্বর দেওয়া হল (C. S. Plot) এবং মৌজা ম্যাপে তোলা হল। প্রত্যেক প্রজার নাম-ধাম, জামজমার বিবরণ খতিয়ান বা বা স্বত্বলিপিতে (Record of Right) স্থান পেল। প্রজারা তাদের জমিজমার স্বরূপ জানতে পারল, মানচিত্র দেখে জমি সনাক্ত করতে শিখল।

সুতরাং তাদের উপর অত্যাচারের সম্ভাবনাও অনেক কমে গেল।

২৪ পরগনার এই জেলা-জরীপ বাংলা জরীপের ইতিহাসে নিঃ-সন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এরপর এই জেলায় যতগুলি জরীপ হয়েছে (যেমন সুন্দরবন জরীপ, ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে জমিদারী গ্রহণ আইনের জন্য রিভিসনাল জরীপ) সব-গুলিই জেলা-জরীপের রেকর্ডকে ভিত্তি করেই করা হয়েছে। কারণ এই জেলা জরীপ প্রায়-নির্ভুল একটি জরীপ হয়েছিল বলে সকলে মনে করেন।

২৪ পরগনা জেলা জরীপের (১৯২৪-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ) গৌরব তাই আজও অম্লান।

টালি সাহেবের নাম থেকে টালিগঞ্জ

জরীপ বিভাগের একজন অফিসারকে এক ভদ্রলোক জিগগেস করেছিলেন, মহাশয়ের নিবাস? তিনি রহস্য করে উত্তর দিয়েছিলেন, খাসপুর পরগনায়। প্রশ্নকর্তা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলেছিলেন, বুঝলাম, টালিগঞ্জ থানায়।

খাসপুর ওদের কারুরই অপরিচিত ছিল না কিন্তু অপরিচিত আমার মতো লোকের কাছে।

এতে অবাক হবার কিছু নেই—মরা অতীতের কথা কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে। তবে গত শতকের প্রথম দিককার যে-কোন লোককে প্রশ্ন করলে তারা খাসপুর সম্পর্কে সঠিক হদিস দিতে পারত।

সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে যে ঐতিহাসিক জরীপ করান, তাতে পরগনার তালিকার মধ্যে খাসপুরের নাম নেই। আজকের আদিগঙ্গার তখন এমনি দশা হয়নি—মনে হয় বর্তমান টালিগঞ্জের অধিকাংশই ছিল তখন গঙ্গাগর্ভে। আর বাকিটুকু ছিল সম্ভবত মেদনমল্ল (বারুইপুর, সোনারপুর থানার আংশিক এলাকা), মাগুরা (বর্তমান বিষ্ণুপুর, বেহালা মহেশতলার অংশ) এবং কলকাতা (ব্যারাকপুর, টিটাগড়, খড়দা, বরানগর, দমদম, রাজারহাট থানার অংশ) পরগনার মধ্যে। সম্রাট আকবরের সময়কার এই জরীপের নাম ছিল 'আসলি জমা তুমার'।

এর পরবর্তী জরীপ বাংলাদেশে হয়েছিল সম্রাট শাহজাহানের সময়, বাংলার শাসনকর্তা তখন শাহ সুজা। বিলাসিতা এবং ভ্রাতৃবিরোধের কাহিনীর মধ্যে ঢাকা পড়ে গেলেও, শাহ সুজার শাসন বাংলাদেশের পক্ষে সুসময়ই ছিল। তিনি যে জরীপ করেন সে সময়েও খাসপুরের নামগন্ধ পাওয়া যায়নি।

মুঘল আমলের সর্বশেষ জরীপ হয়েছিল সম্রাট আওরংজীবের মৃত্যুর

পরে। বাংলার শাসনকর্তা তখন মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭২২ খ্রীস্টাব্দ)। এই জরীপে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়। 'সরকার' ইউনিট ছেড়ে 'চাকলা' ইউনিট নেওয়া হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবিধের জন্য বাংলার অনেকগুলি পরগনা বেড়ে গেল এবং পরগনাগুলির আয়তন কমানো ও হেরফের করা হল। ঠিক এই সময় সম্ভবত খাসপুর পরগনার সৃষ্টি হয়েছিল। গঙ্গার চড়া থেকে উদ্ভূত সরকারের খাস দিয়ারার উপর নতুন সৃষ্ট খাসপুর পরগনা। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে রাখি, বাংলা এ সময়ে ১৩টা চাকলা এবং ১৬০০ পরগনায় বিভক্ত হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর জরীপের নাম ছিল 'জমাই কামিল তুমার'। এই জরীপের ৩৫ বছর পরে পলাশীর প্রহসনের পর ইংরেজরা লাভ করল কলকাতার চারপাশের চব্বিশটি মহল বা পরগনা। পরগনাগুলি হল—মাগুরা, খাসপুর, মেদনমল্ল, এক্তিয়ারপুর, বারিদহাটি, যুর (অংশ), খাড়ি, দক্ষিণসাগর, কলিকাতা (অংশ), পাইকান (অংশ), মানপুর (অংশ), আমিরাবাদ, আজিমাবাদ, মুড়াগাছা, পেচাকুলি, শাহপুর (অংশ), শাহনগর (অংশ), মহম্মদ আমিরপুর (অংশ), মেলাংমহল, হাতিয়াগড়, ময়দা, আকবরপুর (অংশ), বালিয়া (অংশ), বাসুন্দরি (অংশ)। মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধির সর্ত অনুযায়ী, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর নবাবের যে ৩ নং পরওয়ানা বের হয়, তারই নবম ধারায় ২৪টি পরগনার জমিদারী ইংরেজরা পেল একথা উল্লেখ আছে। এই থেকেই চব্বিশ পরগনা জেলার উৎপত্তি একথাও সকলেই জানেন।

প্রাচীন খাসপুর এমনি করে মুঘলদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে এল। কলকাতা নগরের স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে খাসপুর ক্রমে উন্নত হয়ে উঠছিল। খাসপুরের উন্নতির আর একটি কারণ ছিল, সে হল কালীঘাট। গঙ্গা ক্রমান্বয়ে সরে সরে আসার ফলে কালীমূর্তি কলকাতা থেকে ভবানীপুর হয়ে কালীঘাটে মরাগঙ্গার তীরে আশ্রয় নেন। কালিকা দেবীর জাঁকজমক বেড়ে উঠতে থাকে। সেইসঙ্গে খাসপুরও

অনেক ধর্মপ্রাণ এবং বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের বাসস্থান হয়ে উঠতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়তে থাকে। তখনও এর নাম কিন্তু খাসপুর।

খাসপুর যে কি করে টালিগঞ্জ নামে খ্যাত হল সে কাহিনী আরও মজার। লর্ড ক্লাইভের সৈন্যদলে একজন সেনাপতি ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ক্যাপ্টেন উইলিয়ম্ টালি। পলাশীর যুদ্ধের হাঙ্গামা মিটে যাওয়ার পর তিনি সুন্দরবনে গিয়ে এক কারখানা খুলে বসলেন। সময়টা হল ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দ। চাকরিতে উন্নতি করে তিনি মেজর উপাধি পান। সুন্দরবনে থাকাকালীন তিনি লক্ষ্য করলেন যে সুন্দরবনের বর্তমান ক্যানিং-জয়নগর অঞ্চল থেকে কলকাতায় মালপত্র নিয়ে আসা ভারি অসুবিধা। তখনও তো এমানধারা রেল বা মোটরপথ তৈরি হয়নি। নৌকাপথই ভরসা। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা নৌকা করে কলকাতায় আসতে হলে মাতলা দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত, সেখান থেকে হুগলি নদী দিয়ে কলকাতায় পৌঁছত। পথে ডাকাতের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাইক্লোনের ভীত, তা ছাড়া খরচ এবং সময় লাগত বিস্তর। টালি সাহেব দেখলেন, বিদ্যাধরী নদীতে যখন জল আছে, তখন মরা গঙ্গা কেটে যদি বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যায়, তাহলে পুব-দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এপথে কলকাতার সঙ্গে চলতে পারে। আর এতে বেশ কিছু আয়ও হতে পারে।

যেমন কথা তেমনি কাজ, টালি সাহেব খালের জমির বন্দোবস্ত নিয়ে নিলেন এবং খাল কেটে আদিগঙ্গাকে বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিশিয়ে ছাড়লেন [১৭৭৬ খ্রীঃ]। ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণে খিদিরপুরের কাছ থেকে আদিগঙ্গা, কালীঘাট গড়িয়া হয়ে বর্তমান ক্যানিং-শিয়ালদহ রেললাইনের কালিকাপুর স্টেশনের পূর্বে তাড়দা মৌজার কাছে এসে বিদ্যাধরীতে পড়ল। খাসপুর মৌজায় একটা টোল বসল। এই খালের দৈর্ঘ্য হল মোটামুটি সতেরো মাইল। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। মেজর টালির প্রচেষ্টা সফল হল। বলা বাহুল্য ইংরেজ

সন্তানটির পকেটও টাকা-সোনা-দানায় ভর্তি হতে লাগল।

মেজর টালির নামে এই খাল টালির নালা নামে খ্যাত হল, এবং এর পাশে খাসপুরও টালিসাহেবের গঞ্জ টালিগঞ্জ নামে খ্যাত হয়ে পড়ল।

এর পরের ইতিহাস সকলেই জানেন। সুতানুটি কলকাতা গোবিন্দপুর আর পঞ্চান্নগ্রামের সঙ্গে টালিগঞ্জেও বিরাট বিরাট প্রাসাদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ভরে উঠতে লাগল। প্রাচীন খাসপুর চাপা পড়ে গেল টালিগঞ্জের নামের নীচে। তারপর মারাঠাভীতি গেল, মারাঠা ডিচ্ কাটা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল। কলকাতা একদিন ভারতবর্ষের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল—এখানে রেল, মোটর, বিমান এল; টালিগঞ্জও সে উন্নতির ভাগ নিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষে হায়দার আলির ব্যাঘ্রপুত্র টিপুসুলতান একবার চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজদের পরাজিত করতে, কিন্তু ইংরেজদের ভাগ্যে তখন জোয়ার এসেছে। তিনি হেরে গিয়ে নিহত হলেন তাঁর প্রাসাদ শ্রীরঙ্গপত্তমে। ইংরেজরা তাঁর এগারোজন পুত্র এবং কয়েকজন আত্মীয়কে এনে রাখলেন এই টালিগঞ্জে। তাঁদের জমি দিলেন, মাসিক বৃত্তি দিয়ে বিলাসী করে তুললেন। টালিগঞ্জে তাঁদের বংশধররা আজও বেঁচে আছে কালের সঙ্গে কোনমতে যুদ্ধ করে। ইংরেজরা তাঁদের রাজত্বকালে পরগনা ইউনিট ছেড়ে থানা ইউনিট গ্রহণ করেন। এ সময় টালিগঞ্জ থানা স্থাপিত হয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টালিগঞ্জ সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ছিল। ঐ বছরই টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচয়ের পাতায় এল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে টালিগঞ্জ থানার লোকসংখ্যা ছিল ১৮,৪৩৩ জন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে লোকসংখ্যা বেড়ে হল ৩৯,৭১১ জন এবং ১৯৩১ সনে ৪৩,৬৩৮। পরবর্তী সেনসাসে লোকসংখ্যা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে একথা বলাই বাহুল্য। টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি কয়েক বছর পূর্বে কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে মিশে

গেছে ; শুধু কিছু অংশে ইউনিয়নবোর্ডের শাসন ছিল, সেখানে এখন পঞ্চায়েত কায়েম হয়েছে।

বর্তমান টালিগঞ্জে অনেক সিনেমা স্টুডিও, গলফ ক্লাব, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের আকর্ষণ রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও টালিগঞ্জের উল্লেখ-যোগ্য কোন উন্নতিই হয়নি। সেই কবে টালি সাহেব কর্নেল পদে উন্নীত হয়ে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে জাহাজে করে রওনা হন কিন্তু পথেই তিনি মারা যান (কলকাতা গেজেট, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৭৮৪)। তারপর অবশ্য কিছুদিন তাঁর স্ত্রী মেরী অ্যানা টালির খাল বিলি করে সংসার চালান। শেষে এই খালের কর্তৃত্ব ২৪ পরগনার কালেক্টর গ্রহণ করেন।

সেসব তো বহুদিনের কথা ! আজ টালিগঞ্জের দুটো রূপ দেখতে পাই। এক হল সিনেমা তারকাদের আনাগোনা, ফিল্ম শিল্পের গৌরবে গৌরবময়ী টালিগঞ্জ। সেজন্য অনেকে একে আদর করে টলিউড্ বলে থাকেন। আর এক রূপ হল রাতের মশক-গুঞ্জরিত, হ্যারিকেন আলোয় অনুজ্জ্বল, নোংরা কলোনি পরিপূর্ণ টালিগঞ্জ। যেখানে বর্ষার জল জমে, কাদার সৃষ্টি হয়, ব্যাঙ ডাকে এবং সেই টালি সাহেবের হারানো দিনগুলিই স্মরণে আনে। একদিন মোগল শাসনতন্ত্র-রচিত খাসপুর, টালিগঞ্জ নামে খ্যাত হয়েছিল। আজ যুগপরিবর্তনে স্বাধীন ভারতে টালিগঞ্জ উন্নত এবং অনেক উচ্চাশার স্বপ্ন বুকে নিয়ে স্তিমিত নেত্রে বসে রয়েছে। তার সে স্বপ্ন কবে সফল হবে কে জানে !

২৪ পরগনার পরগনা পরিচয়

২৪ পরগনা জেলায় কতটি পরগনা। এ কৌতূহলী প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। চট করে এক কথায় উত্তর দেওয়াও সহজ কথা নয়,—মাথা চুলকোতে হয়।

উত্তরটা হল, এক কালে পরগনা ২৪টি ছিল বটে, তবে পরে বেড়ে বেড়ে বাষট্টিটি হল, স্বাধীনতার (১৯৪৭ খ্রীঃ) পরে পরগনার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয়েছে।

জেলা ২৪ পরগনার জন্ম হল পলাশী যুদ্ধের পরে। ইংরেজ কোম্পানি এবং নবাব মীরজাফরের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল ১৫ই জুলাই ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে, তার ৯নং ধারাতে বলা হয়েছিল,

"All the lands lying to the south of Calcutta, as far as Kulpi, shall be under the Zemindary of the English Company, and all the officers of those parts shall be under their jurisdiction.

The reveune to be Paid by them (the Company) in the same manner with other Zeminders."

এই সন্ধিকে সমর্থন করে বের হল নবাবের ৩নং পরওয়ানা ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে, শীতকালে।

এই পরওয়ানাতে যে ২৪ মহলের উল্লেখ ছিল তার থেকেই এই জেলা ওই নামে আখ্যাত হয়ে আসছে। যদিও পরগনার সংখ্যা দিন দিনই বেড়েছে। সে সময়কার পরগনাগুলির নাম হল :

১. মাগুরা, ২. খাসপুর, ৩. মেদনমল্ল, ৪. এক্তিয়ারপুর, ৫. বুরজুট্টি বা বারিদহাটি, ৬. ঘুর (অংশ), ৭. খাড়ি, ৮. দক্ষিণ সাগর ৯. কলিকাতা (অংশ), ১০. হাওড়া (অংশ), ১১. মানপুর (অংশ), ১২.

আমিরাবাদ (অংশ), ১৩. আজিমাবাদ (অংশ), ১৪. মুড়াগাছা (অংশ), ১৫. পেঁচাকুলি, ১৬. শাহপুর (অংশ), ১৭. শাহনগর (অংশ), ১৮. মহম্মদ আমীরপুর (অংশ), ১৯. মেলাংমহল, ২০. হাতিয়াগড় (অংশ), ২১. মেদিয়া বা ময়দা, ২২. আকবরপুর (অংশ), ২৩. বালিয়া (অংশ), ২৪. বাষুন্দ্রি (অংশ)।

এ সময়কার ফার্দসাওয়াল থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরগনার সংখ্যা ২৭টি। এতে হাবেলিশহর বা হালিশহরের এবং বালিয়াজুড়ির নাম আছে, তাছাড়া আছে দুটি আবওয়াব ফৌজদারী মহলের কথা লেখা। —ফার্দসওয়ালে অবশ্য বালিয়া এবং বাষুন্দ্রি (২৩-২৪নং) পরগনাকে একটি পরগনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সন্ধির কাগজপত্রে ২৪ পরগনা উল্লেখ হওয়াতেই এর নাম হয়ে গেল ২৪ পরগনা।

মুর্শিদাবাদে সেই বিশৃঙ্খলার সময়ে প্রকৃতপক্ষে সরজমিন দেখে পরগনা ও মহলের নাম পরওয়ানা বা ফার্দসাওয়ালে লেখা হয়নি এটা বেশ বোঝা যায়।

উপরি-উক্ত ২৭টি পরগনার ১৫টি ছিল দেরুবাস্ত্ বা পূর্ণ পরগনা, বাকি ১২টি কিসমেতিয়া বা আংশিক পরগনা।

তাহলে দুর্ঘটনাই বলি আর যাই বলি সেই থেকে এই জেলার নাম ২৪ পরগনাই চলে আসছে। ওই সময়ে ঐ এলাকার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নবাবকে খাজনা দিতে হত ২,২২,৯৫৮৷৷৮ ১ পয়সা এই জেলার আয়তন ছিল তখন ৮৮২ বর্গমাইল।

তৎকালীন ২৪ পরগনা জেলার আয়তন মোটামুটি ধরা যেতে পারে বর্তমান আলিপুর সদর মহকুমা, ব্যারাকপুর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা। অবশ্য সদর এবং ডায়মণ্ডহারবারের সুন্দরবন অংশটুকু বাদ দিয়ে। লর্ড কর্নওয়ালিশ যখন ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) প্রবর্তন করলেন, সে সময়ের পূর্বপর্যন্ত

সুন্দরবন অঞ্চল লবণ বা নুনমহল হিসেবে হুগলির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে সুন্দরবনকে ২৪ পরগনার সঙ্গে যুক্ত করে উন্নতির চেষ্টা করা হয়, কারণ সুন্দরবনের বহু জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে ছিল।

বহু বিচিত্র ইতিহাস এই ২৪ পরগনার। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে হুগলি নদীর পশ্চিমপাড়ে নদীয়া জেলার যে সমস্ত পরগনা ছিল, সেগুলি নিলামের সুবিধার জন্য ২৪ পরগনার সঙ্গে যুক্ত করা হল।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা এবং ২৪ পরগনার শাসনকার্য কলকাতা কালেক্টরেট থেকেই চলত। লর্ড ময়রা (১৮১৩—২৩ খ্রীস্টাব্দ) যখন ভারতে বড়লাট তখন ২৪ পরগনার জন্য একটি পৃথক কালেক্টরেট (Collectorate) গঠন করা হয়। জেলার সদর দপ্তর কলকাতাতেই রইল। সুতরাং ২৪ পরগনা জেলায় প্রথম কালেক্টরেট হয়েছিল ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে। ইংরেজি ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে সুন্দরবনকে উন্নত করার জন্য একজন সুন্দরবন কমিশনার নিযুক্ত হলেন। ২৪ পরগনা থেকে সুন্দরবন অংশ কেটে নেওয়া হল। সুন্দরবনের প্রথম কমিশনার ছিলেন মিঃ ডি. স্কট্ [D. Scott]।

এতদিন পর্যন্ত বরাহনগর এবং ফলতা শহর দুটি কার্যত ডাচ্‌দের (Dutch) অধীনে ছিল। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের দ্বিপাক্ষিক এক সন্ধির ফলে ঐ দুটি স্থান ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে চলে এল। পরিবর্তে ডাচরা দূরপ্রাচ্যে অন্যান্য সুবিধা ইংরেজদের থেকে পেয়েছিল। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া জেলা থেকে আনোয়ারপুর (অংশ) এবং বালন্দা পরগনা ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে আনা হল। এর উদ্দেশ্য শাসনকার্যের সুবিধা করা (এই দুটি পরগনা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জমিদারির মধ্যে ছিল। এখানে উত্তর কাশীপুর মৌজায় যে প্রাচীন কালীবাড়িটি আছে সেটির দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের।)

লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩—২৮) যখন বড়লাট সে সময়ে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ব্যারাকপুরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল। এই বিদ্রোহ

ইংরেজ সরকার তাদের গোলন্দাজ বাহিনী দিয়ে নির্মমভাবে দমন করেছিল। এই বছরই বড়লাটের নির্দেশে ২৪ পরগনার সদর দপ্তর কলকাতার বাইরে আনা হল বারুইপুর শহরে। এরপর ২৪ পরগনা জেলার সদর দপ্তর আর কোনদিন কলকাতায় ফিরে আসেনি। ঐ ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দ ২৪ পরগনা জেলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই বছর বারাসত, বসিরহাট এবং সাতক্ষীরা মহকুমার অংশ, ২৪ পরগনা জেলাভুক্ত হয়ে গেল। বারাসত, বসিরহাট ইতিপূর্বে ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে ছিল না। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে একজন জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বসিরহাট শহরের নিকট বাগুন্দি গ্রাম থেকে সাতক্ষীরা এবং বসিরহাটের শাসনকার্য চালাতেন। তাকে বলা হল, তুমি বাপু বারাসত মহকুমার কাজও দেখবে।

১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ) যখন বড়লাট, সে সময়ে সদর দপ্তর বারুইপুর ছেড়ে আলিপুরে (Alipur) চলে এল (জেলার প্রায় মধ্যবর্তী স্থান বলে)। আজও সদর দপ্তর আলিপুরেই রয়ে গেছে। বর্তমানে যে সাতক্ষীরা মহকুমা বাংলাদেশে ইছামতী নদীর পূর্বপাড়ে আছে, তার প্রকৃত জন্ম ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে [খুলনা জেলার সৃষ্টি হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে]। ঐ বছরে গোটা সাতক্ষীরা মহকুমাকে ২৪ পরগনা জেলা থেকে বিযুক্ত করে নদীয়া জেলার অঙ্গবৃদ্ধি করা হল।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে বড়লাট ছিলেন লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-৬২ খ্রীঃ), সে সময়ে আবার ভিন্ন কথা উঠল, ভিন্ন প্রস্তাব পাশ হল। মহকুমা সাতক্ষীরাকে আবার ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে নিয়ে আসা হল। সাতক্ষীরা মহকুমাকে নিয়ে এমনি টানাপোড়েন চলেছিল প্রায় কুড়ি বছর।

তারপর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে উদারপন্থী বড়লাট লর্ড রিপনের সময় (১৮৮০-৮৪ খ্রীঃ) স্থির হল যে খুলনা (Khulna) জেলা তৈরি হবে এবং সাতক্ষীরা মহকুমা ঐ জেলারই একটি মহকুমা বলে গণ্য হবে। তাই হল। সাতক্ষীরা মহকুমাকে নিয়ে আর কোন ঝামেলা স্বাধীনতা

প্রাপ্তিকাল (১৯৪৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত ঘটেনি।

এরপর বহুদিন ২৪ পরগনার সীমানা অদলবদল করা হয়নি। শুধু মাত্র নদীয়া জেলার দুটি গ্রাম ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে একটি কথা বলা হয়নি, সে হল ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে ব্যারাকপুর মহকুমা গঠিত হয়েছিল। বেশ কিছুদিন পরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ঐ মহকুমা বিলুপ্ত করা হল।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ব্যারাকপুর আবার তার মহকুমার মর্যাদা (Status) ফিরে পায়। বারাসত কিন্তু সেই জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে স্বাধীন জেলার মতনই কাজ করে চলেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট বাগুন্দি গ্রাম থেকে বারাসত জেলা শাসন করতেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে বারাসত জেলার সদর দপ্তর বাগুন্দি থেকে বারাসত শহরে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা আবার বারাসত জেলাকে অবলুপ্ত করে দিল এবং সে মহকুমার মর্যাদা নিয়ে ২৪ পরগনার অঙ্গবৃদ্ধি করল। ২৪ পরগনায় যে জরীপগুলি হয়েছিল, তার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য জরীপ করেছিলেন ক্যাপ্টেন আর. স্মিথ (Capt. R. Smythe)। এই জরীপকে বলা হয় রেভিন্যু-সার্ভে।

এই জরীপে গ্রামের প্রকৃত সীমানা এবং তৌজীর সীমানা অঙ্কিত হয়েছিল মানচিত্রে; কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরীণ প্লট, বাড়িঘর, রাস্তা ইত্যাদির ছবি মানচিত্রে আঁকা হয়নি।

১৯২৪-৩৩ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগনায় জেলা জরীপ (District Settlement) হয়েছিল।

এই জরীপের উদ্দেশ্য হল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে (Bengal Tenancy Act 1885) প্রজাদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল সেইমতো জেলা জরীপ করে প্রজাদের হাতে তাদের জমিজমার পর্চা ও মানচিত্র তুলে দেওয়া, যাতে তারা (প্রজারা) তাদের অধিকার বুঝে নিতে পারে।

২৪ পরগনায় এই বিখ্যাত জরীপ শুরু করেন তৎকালীন খুলনার সেটলমেন্ট অফিসার এল. আর. ফকাস (L. R. Fawcus) এবং শেষ করেন মিঃ বার্জ (B. E. J. Burge), যিনি মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন স্বদেশীয়দের হাতে প্রাণ হারান।

এই জরীপে বাঙালিদের মধ্যে রায় সাহেব অনিলচন্দ্র লাহিড়ী এবং দীনেশচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এই জরীপে ৫টি মহকুমা নিয়ে ২৪ পরগনার আয়তন দেখানো হয়েছিল ৪৮৫৬ বর্গমাইল।

মহকুমাগুলি হল আলিপুর সদর, ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক পূর্বে ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে জরীপ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তা শেষ হয়নি।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে (২৪ পরগনা সহ) একটি ব্যাপক জরীপ শুরু হয়েছিল। এই জরীপের নাম ছিল পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইন, ১৯৫৩। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য ছিল দুটো :

(১) রায়ত এবং সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা।

(২) অতিরিক্ত সরকারে বর্তানো (Vested) জমি বের করে এনে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা, যাতে তাদের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

একদিন ২৪ পরগনা নিয়ে যে জেলার সৃষ্টি হয়েছিল, কালক্রমে দেখা গেল অনেক ভাঙাগড়ার ফলে পরগনার সংখ্যা বাড়ল আবার কমলও। আজ যেমন 'থানা', মুসলমান যুগে 'পরগনা' ছিল তেমনি।

সম্রাট আকবরের জরীপে দেখি রাজস্ব আদায়ের ইউনিট 'মহল' দাঁড়িয়েছে, আর 'পরগনা' হল শাসনকার্যের ইউনিট।

কালক্রমে ইংরেজ যুগে 'পরগনা' ভাগ হতেও দেখা গেল (কোন জমিদার হয়ত খাজনা না দিতে পেরে অর্ধেক 'পরগনা' বেচে দিয়েছেন ইত্যাদি)।

অবশেষে 'পরগনা', 'মহল' এসব 'ইউনিট' পরিত্যক্ত হয়ে ইংরেজ যুগে 'তৌজী' (Revenue Paying Estate) হল খাজানা বা রাজস্ব আদায়ের ইউনিট।

ইংরেজদের ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রাপ্ত জমিদারী ২৪ পরগনার সঙ্গে সম্রাট আকবরের 'আসলি জমা তুমার'-এর তালিকার সঙ্গে নিম্নলিখিত পরগনাগুলির মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন : মাহ্রা, মেদনমল্ল, বারিদহাটি, খাড়ি, কলিকাতা, মুড়াগাছা, আকবরপুর, বালিয়া।

বলাবাহুল্য, এগুলি সে সময়ে ১৮নং সাতগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ জেলা শহর ছিল সাতগাঁও। কেবল ইংরেজদের তৎকালীন ২৪ পরগনার বাষুন্দ্রি ছিল ১৭নং সেলিমবাদ সরকারের মধ্যে, অর্থাৎ বর্তমান হুগলি জেলায়।

সম্রাট শাহজাহান (বাংলার শাসনকর্তা তখন শাহ সুজা) এবং নবাব নাজিম মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে যে দুটি জরীপ হয়েছিল তাতে নতুন নতুন অনেক পরগনার সৃষ্টি হয়। এ সত্য ২৪ পরগনা রেভিন্যু সার্ভেয়ারের পরগনার তালিকা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে।

২৭ পরগনা জেলা ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়েই যে বড় হয়েছে এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

বর্ধিত অংশগুলি মূলত যশোর, নদীয়া জেলারই পরগনা বা পরগনার অংশবিশেষ।

বর্তমান ২৪ পরগনাস্থিত কতকগুলি পরগনা যেমন, বালন্দা, উখড়া, পাইকহাটি, আনোয়ারপুর ইত্যাদি আগে কিন্তু চাকলা হুগলির মধ্যেই ছিল, পরে নদীয়া রাজ্যের জমিদারীভুক্ত হয়, অবশেষে ২৪ পরগনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

২৪ পরগনা জেলার রাজস্ব জরীপের সময় (১৮৪৬-৫২ খ্রীস্টাব্দ) কর্নেল আর. স্মিথের (R. Smythe) সময় পর্যন্ত পরগনাগুলির কথা জনসাধারণ বিস্মৃত হয়নি। স্মিথ সাহেব আমাদের ৬২টি পরগনার

একটি মূল্যবান তালিকা দিয়েছেন। সেইসঙ্গে একটি মানচিত্রও তিনি রেখে গেছেন।

তখন অবশ্য সম্রাট আকবরের ১৮নং সাতগাঁও সরকারের পরগনা-গুলি বা মুর্শিদকুলি খাঁর জরীপের পরগনাগুলিই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

তার কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

স্মিথ সাহেবের বর্ণিত পরগনাগুলি হল ঃ

(১) আগরপাড়া (২) আগরপাড়া বালিয়া (৩) মাইহাটি (৪) বালন্দা (৫) পারসুলিয়া (৬) রাজপুর (৭) ধুলিয়াগড় (৮) বালিয়া মাইহাটি (৯) কাটশালি (১০) হোগলাবাদ (১১) বাজিতপুর (১২) মুড়াগড় (১৩) সুন্দরবন (১৪) পাইকহাটি (১৫) নারায়ণগড় (১৬) মাগুরা (১৭) মুড়াগাছা (১৮) আনোয়ারপুর (১৯) আমিরাবাদ (২০) সরফরাজপুর (২১) উখড়া-হাবেলিশহর (২২) আরসা (২৩) ধরসা (২৪) শায়েস্তানগর (২৫) খুসদা (২৬) স্বস্তুয়ননগর-আমিরপুর (২৭) মুলঘর (২৮) সড়ক-রাজপুর-আমিরপুর (২৯) নুরনগর (৩০) বুড়ন বা বোড়ন (৩১) সরফরাজপুর (৩২) হিক্কি (৩৩) আমিরাবাদ (৩৪) কলারোওয়া-হোসেনপুর (৩৫) কলারোওয়া (৩৬) কাটুলিয়া (৩৭) উখড়া খুসদা (৩৮) চৌরাশী (৩৯) উখড়া-চৌরাশী (৪০) বালিয়া (৪১) বালিয়া আমিরপুর (৪২) ধুলিয়াপুর (৪৩) পরধুলিয়াপুর (৪৪) আজিমাবাদ (৪৫) বারিদহাটি (৪৬) খাসপুর (৪৭) কলিকাতা (৪৮) হাবেলিশহর (৪৯) পঞ্চান্নগ্রাম (৫০) হাতিয়াগড় (৫১) দক্ষিণ সাগর (৫২) শাহপুর (৫৩) শাহনগর (৫৪) মেদনমল্ল (৫৫) ঘুর (৫৬) পেঁচাকুলি (৫৭) খাড়ি (৫৮) বালিয়া কাটুলিয়া (৫৯) আমিরপুর (৬০) উখড়া (৬১) জামিরা (৬২) খোসলপুর। হাণ্টার সাহেব তার একটি রিপোর্টে অবশ্য বলেছেন পরগনার সংখ্যা হবে ৬৫টি।

পরিশেষে হাণ্টার সাহেব আর একটি কথা বলেছেন যে এ ছাড়া

আরও ৪টি পরগনা বা মহল আছে (Fiscal Unit) যেগুলি স্মিথের রিপোর্টে অথবা বোর্ড অব রেভিন্যুর পরিসংখ্যানে উল্লেখ নেই, যেমন—গুণতালকাটি, রামচন্দ্রপুর, সলিমাবাদ, সয়িদপুর। হাণ্টারের হিসেব মতন ২৪ পরগনার সংখ্যা গত উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ছিল ৬৯টি।

আবার (১৯২৪-৩৩ খ্রীঃ) জেলা জরীপের সময় আমরা দেখতে পাই ২৪ পরগনার পরগনা সংখ্যা হল ৫৬টি, যেমন,

(১) আনোয়ারপুর (Anwarpur), (২) আগড়পাড়া (Agarpara). (৩) আমিরাবাদ (Amirabad), (৪) আমিরপুর (Amirpur), (৫) মহম্মদ আমিরপুর (Muhammad Amirpur), (৬) আরসা (Arsha), (৭) আজিমাবাদ (Azimabad), (৮) বালিয়া (Balia), (৯) বালণ্ডা (Balanda), (১০) বারিদহাটি (Baridhati), (১১) বুড়ন (Buran), (১২) বাজিতপুর (Bajitpur), (১৩) বরাহনগর (Barahnagar), (১৪) বালিয়াজোড় (Baliajore), (১৫) কলিকাতা (Calcutta). (১৬) চৌরাশী (Chourasi), (১৭) দক্ষিণ-সাগর (Dakshin Sagar), (১৮) দাতিয়া (Datia), (১৯) ধরসা (Dharsa), (২০) ধুলিয়াপুর (Dhuliapur), (২১) ধুলিয়াগড় (Dhuliagar), (২২) ঘুর (Ghur), (২৩) হালিশহর (Halisahar), (২৪) হাসনাবাদ (Hasnabad), (২৫) হাতিয়াগড় (Hatiagar), (২৬) হলদা (Halda). (২৭) হিলকি (Hilki), (২৮) জামিরা (Jamira), (২৯) কাটশালি (Katsali), (৩০) খাসদহ (Khasdaha), (৩১) কাটুলিয়া (Katulia), (৩২) খাসপুর (Khaspur), (৩৩) খাড়ি (Khari), (৩৪) খোসলপুর (Khosalpur), (৩৫) কলারোওয়া-হোসেনপুর (Kalaroa-Hossainpur), (৩৬) মাগুরা (Magura), (৩৭) মেদনমল্ল (Medun Mulla), (৩৮) ময়দা (Mayda), (৩৯)

মাইহাটি (Maihati), (৪০) মূলঘর (Mulghar), (৪১) মুড়াগাছা (Muragacha), (৪২) মুড়াগড় (Muragarh), (৪৩) নুরনগর (Nurnagar), (৪৪) পাইগ্‌হাটি (Paighati), (৪৫) পেঁচাখালি (Penchakhali), (৪৬) পরধুলিয়াপুর (Parduliapur), (৪৭) পাজানুর (Pajanur), (৪৮) পঞ্চান্নগ্রাম (Panchannagram) (৪৯) রাজপুর (Rajpur), (৫০) সৈদাপুর (Saidapur), (৫১) শাহানগর (Sahanagar), (৫২) শায়েস্তানগর (Sayestanagar), (৫৩) শাহপুর (Sahapur), (৫৪) সরফরাজপুর (Sarfarajpur), (৫৫) সুন্দরবন (Sundarban), (৫৬) উখড়া (Ukhra)।

জেলা জরীপের সময় (১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ) স্মিথের (R. Smythe) যে ছয়টি পরগনা (১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ) বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল :

পারমুলিয়া, হোগলাবাদ, নারায়ণগড়, বালিয়া কাটালিয়া, বালিয়া আমিরপুর, বালিয়া মাইহাটি।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি পরগনা খুঁজে পাওয়া যায়নি, ৭৪।৭৫ বৎসর পরে তাদের অস্তিত্বের সন্ধান করা সম্ভব হয়নি।

শেষ তিনটি পরগনা বাদ দেওয়ার কারণ হল, এদের অংশগুলি আগেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

মোটামুটিভাবে এই জেলার পরগনাগুলির ইতিহাস আলোচিত হল। ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশের পরগনার জন্ম মুসলমান অধিকারের শুরু থেকেই। ইংরেজ রাজত্বের সময় থেকে সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে থানার (Police Station) জন্ম নিতে থাকে। তবুও গত জরীপে (১৯২৮-৩৩ খ্রীস্টাব্দে) পরগনাগুলির নাম মৌজা রেকর্ডে (খতিয়ানে) উল্লেখিত হয়েছে, বোধ হয় ঐতিহাসিক কারণে। প্রয়োজনে মানচিত্রে রঙ দিয়ে পরগনার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্টের পরে যশোর জেলার দুটি থানা

(র‍্যাডক্লিফের অ্যাওয়ার্ডে) বনগাঁ, গাইঘাটা যুক্ত হয় এবং ২৪ পরগনার পরগনা সংখ্যা আরও বেড়ে যায়।

তবে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই দুই থানার রেকর্ড পশ্চিম-বঙ্গ সরকারকে না পাঠানোতে বর্ধিত পরগনার সংখ্যা জানা যায় না।

বর্তমানে ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে বামফ্রন্ট সরকার ২৪ পরগনা জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, সে কথা এখানে আলোচ্য নয় (১ মার্চ ১৯৮৬ খ্রীঃ)।

(Vide Calcutta Gazette, notification no. 212 LR. dt. 17. 2. 86)

বর্তমানে দুই ভাগের নাম উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সদর দপ্তর বারাসত শহর। তার এলাকা হল বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ, ব্যারাকপুর মহকুমা।

আর দক্ষিণ ২৪ পরগনার সদর দপ্তর রইল আলিপুর। এর এলাকা হল আলিপুর সদর, ডায়মণ্ডহারবার দুটি মহকুমা।

পরগনার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। পরগনার প্রয়োজন এবং ব্যবহার ভারতবর্ষে প্রায় ছশো বছর অটুট ছিল (১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দেরও বেশিকাল)। ক্রমে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় এবং আজকাল পরগনার সীমানা, কোন্ গ্রাম কোন্ পরগনায় তা খুঁজে বার করাই দুঃসাধ্য—এবং বৃথা কাজ বলেই মানুষে মনে করবে। তবুও ইতিহাস-পাগল ছাত্রছাত্রীরা যদি ২৪ পরগনা ইতিহাস এবং সরজমিনে তাদের অস্তিত্ব খুঁজে মিলিয়ে দেখতে চায়, তাহলে তারা পরগনার মানচিত্র, মৌজা রেকর্ডের শীর্ষদেশে পরগনার নাম দেখে অনেকখানি বুঝে নিতে পারবে।

কলকাতার অনেক নাম

হাজার দুই আড়াই বছর আগে কলকাতার অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা পণ্ডিতরা বলে থাকেন। আজকের এই ব্যস্ত মহানগরীর জীবনযাত্রা, আলোকোজ্জ্বল দোকান সৌধ প্রভৃতি সমস্ত যে অতীতে একদিন জলের তলায় ছিল সে কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

ধীরে ধীরে চড়া পড়ে দিয়ারা হয়ে ভূমির সৃষ্টি হল, তখনও সেই ভূভাগ কলকাতা নামে পরিচিত ছিল না—তাকে বরং বলা যায় বুরুনিয়ার দেশ। বিপ্রদাসের মনসাকাব্য থেকে জানা যায়, গঙ্গার বক্ষে চড়া পড়ে প্রথম যে জমি আকাশ দেখল তার নাম হল বালিয়াখাটা। নদীর পাড়ের বালুকাপূর্ণ চেহারায় এমন নামকরণই হয়ত কলকাতার প্রথম নামকরণ।

তারপর ধীরে ধীরে আরও মাটি আত্মপ্রকাশ করতে থাকল, তারপর ঝোপঝাড় জঙ্গল গজিয়ে উঠতে শুরু করল এবং মানুষও আসতে শুরু করল জমি দখলের জন্য।

কলকাতার এই দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানীয় আদিবাসী, যেমন জেলে-বাগদী, কাঠুরে প্রভৃতিদের সঙ্গে ভারতের আর্যদের একটা লড়াই বা বোঝাপড়ার যুগ গেছে। কিন্তু ভারতের জল হাওয়ার গুণে সে বিবাদ মিটে গিয়ে একদিন আত্মিক মিলনের পালা শুরু হল। অনার্যদেবী কালী প্রবেশ করলেন আর্যদের উপাস্যা হয়ে। সেদিনের ঐ ভূভাগের ঘন জঙ্গলের মধ্যে শ্বেত সভ্যতার প্রতীক শিবকে পদতলে নিয়ে কালিকা দেবী জিহ্বা বিকশিত করলেন। শিব ও কালীর মিলনে সূচিত হল আর্য ও অনার্য ভাবধারার মিলন। ষোড়শ শতকের কবি কবিরামের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে পাওয়া যায়, এই যে প্রদেশ এর নাম তখন ছিল কিল্‌কিলা প্রদেশ এবং এর আকৃতি ছিল ত্রিভুজাকৃতি। এই

ত্রিভুজের তিন শীর্ষে ছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের মূর্তি আর কেন্দ্রে ছিল স্বয়ং কালিকা দেবী।

কলকাতার আদি নামকরণ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় এই সমস্ত দেব দেবীরই নামকরণ থেকে। এমনি করে কোন অংশের নাম হল চিৎপুর (চিত্রেশ্বরীর মূর্তি থেকে), সুতানটি (ছত্রনাট), গোবিন্দপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট, লালদিঘি, লালবাজার, বিরজি, এবং বিরজিতলা, ষষ্ঠীতলা, পঞ্চাননতলা, শিবতলা, কালীতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, বড়বাজার, রাধা-বাজার, চৌরঙ্গী, চড়কডাঙ্গা, রথতলা ইত্যাদি। এই নামকরণগুলির আধুনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে সাহিত্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

এরপর যত দিন যেতে শুরু করল লোকবসতিও তত বাড়তে লাগল। দেবদেবীর নামে স্থানের নামকরণের ঝোঁকও কমতে শুরু করল। এর পরবর্তী যুগে গাছপালা থেকে নামকরণের আগ্রহ বাড়ল। ফলে কলকাতার কিছু স্থান পরিচিত হল বটতলা, নিমতলা, নেবুতলা, কদমতলা, বেলতলা, বৈঁচিতলা, বাঁশতলা, গাবতলা, ঝাউতলা, আমড়া-তলা, বাদামতলা, তালতলা, চাঁপাতলা, ডালিমতলা—ইত্যাদি নামে। এই নামকরণ যে পরে হয়েছে সে প্রমাণ হল উপরোক্ত নামগুলির হিন্দু পুরাণে উল্লেখ নেই! আর তাছাড়া ঐ স্থানগুলিতে জনবসতিও অনেক পরে হয়েছে।

সবচেয়ে মজার কথা হল কলকাতার ঐ প্রাচীন নামগুলি কিন্তু আজও বেঁচে আছে কোন কোন রাস্তার নামে। যেমন ধরুন বটতলা স্ট্রীট এবং থানা, নিমতলা, নেবুতলা, বাঁশতলা, আমড়াতলা এবং তালতলা প্রভৃতি। কদমতলা ঘাটের মধ্যে দিয়ে কদমতলা নাম আজও অম্লান রয়েছে যদিও সেই গাছগুলির অস্তিত্ব আজ আর নেই।

পদ্ম পরিপূর্ণ পুকুর থেকে যে স্থানের নামকরণ হল তাকে আমরা পদ্মপুকুর বলে থাকি। গঙ্গার যে খাল ক্রীক রো বরাবর এসে বালিয়া-

ঘাটায় মিশেছিল সেখানে অসংখ্য হিন্তাল গাছের নাম থেকে স্থানের নাম হল হিন্তালী বা ইণ্টালি। শিমূল গাছের চাষের খ্যাতি নিয়ে কোন স্থান হল শিমূলিয়া। হোগলকুঁড়িয়া গ্রামের নাম এল ঐ গ্রামের অধিবাসীদের হোগলার চালের কুঁড়ে থেকে, এ কথা ১৯০১ সনে কলকাতার সেনসাস রিপোর্টেও উল্লেখ আছে। তেমনি নামাঙ্কিত হল নারকেলডাঙা।

কলকাতার আদি জঙ্গলময় দিনে বৃক্ষ থেকে এরকম নামকরণ খুবই স্বাভাবিক। জনবসতি তখন শুরু হলেও তেমন বেশি হয়নি। জনসমাগম এবং বসতি যতই অগ্রসর হতে থাকল, ততই স্থানের বিশেষত্ব থেকে কতকগুলি নামকরণ হতে থাকল।

গোলতলা এবং গোলপুকুর নাম দুইটি ঐ স্থানের গোলাকৃতি জলাশয় থেকেই পেয়ে থাকবে। মিরজাপুর নামটি মুসলমান যুগের নয় এবং কোন মির্জা সাহেবের নাম থেকেও নয়। এর প্রাচীন নাম ছিল মৃৎজাপুর বা যে গ্রামের বাড়িঘরগুলি মাটি থেকেই শুধু তৈরি হয়েছিল। এর পশ্চিমের গ্রাম ঠনঠনিয়ার নামকরণ হয়েছিল ঠন ঠনে বা শক্ত ধরনের মাটির থেকে। তারও দক্ষিণে পটলডাঙা মৌজার নাম হয় এর পটল চাষের উপযোগী জমি থেকে। তেমনি ঝামাপুকুর, কাঁটাপুকুর প্রভৃতি অঞ্চলের নামও ঐ রকম প্রাকৃতিক কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

উত্তরের হেদুয়া নামটি হুদেরই ভগ্নাংশ মাত্র। উল্টাডিঙ্গি নামটিও সুপ্রাচীন এবং এ অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালে প্রবহমানা খালে কোন নৌকা দুর্ঘটনার সঙ্গেই বিজড়িত। যদিও উচ্চারণবিভ্রাটে নামটি উল্টোডাঙায় পরিণত হয়েছে।

সপ্তগ্রামের পতনের পর মুসলমান যুগে কলকাতার লোকবসতি আরও বেড়ে ওঠে। সে সময়ে কলকাতার কতকগুলি অঞ্চল স্থানীয় লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন থেকে নামকরণ হয়। যেমন নিকারিপাড়া ও মেছুয়াবাজার, কলিঙ্গা, (নুন ব্যবসা থেকে) মলাঙ্গা ও

নিমকপোতা। মুচিপাড়া এবং মুচিবাজার নাম দুটি চর্মকারদের ব্যবসা-বৃত্তি থেকেই উদ্ভূত।

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এদেশে পর্তুগিজরা এসেছিল। জোব চার্নক যখন কলকাতায় বসলেন তখন পর্তুগিজরা মুরগি পুষত বলে তাদের হিন্দুপাড়া থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। কালক্রমে স্থানটি মুরগিহাটা এই বিচিত্র নামে পরিচিত হয়ে গেল।

তেমনি আর্মানিদের বাসস্থান হল আর্মানিটোলা। আর এক জোড়া বাঁধানো সাঁকোর খ্যাতি বুকে করে বিখ্যাত হয়ে গেল জোড়াসাঁকো।

পলাশী যুদ্ধের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধের জন্য কলকাতার জনবসতি দ্রুত বেড়ে চলল। এই সময় কোম্পানির ডিরেক্টররা সভা করে এক প্রস্তাব করলেন যে কারিগরদের তাদের বৃত্তি অনুযায়ী একটা করে নির্দিষ্ট দিকে বসবাস করতে দেওয়া হোক। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কলকাতার তদানীন্তন কালেক্টর কর্ম অনুসারে কুমোর, কলু, জেলে, ডোম প্রভৃতিকে শহরের এক একদিকে প্রেরণ করলেন। ফলে কলকাতার কোন দিক হল কুমারটুলি, কলুটোলা, জেলিয়াটোলা, ডোমটুলি, গোয়ালটুলি, আহিরীটোলা, পটুয়াটোলা, শাঁখারিটোলা, আবার কোন দিক হল বেপারিটোলা, কম্বুলিটোলা (দিশি কম্বল), হরিপাড়া (মেথর), কাঁসারিপাড়া, কামারপাড়া, মুসলমানপাড়া, উড়িয়াপাড়া, দরজিপাড়া, খাসাসিটোলা, তেলিপাড়া ইত্যাদি নামে পরিচিত।

এমনি করে কলকাতা তার বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরণ করে নেয়। জনসমাগমে কলকাতার হাটবাজার বাড়তে থাকে এবং কতকগুলি স্থানের নামকরণ ঐ হাটের বিকিকিনি দ্রব্য থেকেই হয় যেমন দর্মা-হাটা, দর্মাগলি, দয়েহাটা, সবজিহাটা, ময়রাহাটা, সুতাহাটা, চিনিপট্টি, ময়দাপট্টি, চাউলপট্টি ইত্যাদি।

মানিকতলার নামকরণ হয় সে যুগের হিন্দু-মুসলমানের সমান আস্থাভাজনকারী পীর মানিকের নাম হতে। আরও আছে, যেমন মুঘল

যুগের বাংলা সুবার এক প্রধান শহর ছিল হুগলি। হুগলির ফৌজদার তখন কলকাতার ভারতীয় অধিবাসীদের বিচার করতেন সেই মুঘল বিচারশালা ছিল কলুটোলা স্ট্রীটের সঙ্গে লোয়ার চিৎপুরের সংযোগ-স্থলের একটু উত্তরে। ওখানকার নাম আজও তাই ফৌজদারী বালা-খানা। এর উত্তরের বাজারই ছিল তখনকার দিনের একমাত্র বড় বাজার, তার নামও হয় তাই সুবাবাজার বা শোভাবাজার।

ইতিহাসের ছাত্ররা হয়ত খুঁজলে আরও ইতিহাস বার করতে পারবেন। এ নামকরণ থেমে নেই। ইংরেজ যুগেও নতুন নতুন নামকরণ হয়েছে, যেমন ডালহৌসি স্কোয়ার, ক্যানিং স্ট্রীট প্রভৃতি। হয়ত ভবিষ্যতেও আরও নতুন নাম সৃষ্টি হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতা তার প্রথম এবং প্রাচীন যুগের দেওয়া নামগুলিকে ভুলে যায়নি; তারা কলকাতার অঙ্গে অঙ্গে আজও জড়িয়ে রয়েছে। তাদের ভোলা সত্যিই বড় কঠিন।

রাজা বানানো রাস্তা

আজ একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, একদিন এই ফলতাই ছিল ইংরেজদের বিপদের দিনের একমাত্র আশ্রয়দাত্রী। বিশে জুন ১৭৫৬ সালে সিরাজদ্দৌল্লার আক্রমণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কলকাতার গভর্নর ড্রেক সমস্ত কলকাতাকে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে গঙ্গাবক্ষে জাহাজে আশ্রয় নিলেন। নগরীর সাদা-কালো লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে পিছন থেকে ড্রেককে তাক্ করে গুলি ছুঁড়েছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। সিরাজ সেদিন কলকাতায় রাত্রিবাস করেন, আর ড্রেক রাত কাটান গোবিন্দপুরের কিছু দূরে গঙ্গাবক্ষে। তিনি চেষ্টা করেছিলেন গঙ্গা দিয়ে পগারপার হতে; কিন্তু ফোর্ট তাল্লার (বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে) কামান গর্জন করে ওঠার ফলে সেটা আর হল না। এই ফলতায় অবশ্য পরে তাঁরা যেতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং এই ফলতায়ই মেজর ক্লিপার্টিক্ এবং লর্ড ক্লাইভ তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন।

ফলতা থেকে কলকাতাগামী এই রাস্তাটির বর্তমান নাম হল ডায়মণ্ডহারবার রোড এবং তখন অর্থাৎ পলাশীর পর এর নাম হয়েছিল 'রাজা রোড'। এ রাস্তাটি তখন অবশ্য কাঁচা ছিল, এখনকার মতন ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে ছিল না, কিন্তু তাহলেও ফলতা থেকে ইংরেজদের আগমনের এটিই ছিল সেদিন একমাত্র রাস্তা।

সেযুগে ইংরেজদের মুঘলদের সঙ্গে আরবী-ফার্সীতে কথা বলতে হত এবং কাজ করতে হত। এমনকি প্রথম প্রথম ইংরেজদের মুঘল শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত হুবহু মেনে নিতে হয়েছিল। সেদিন শোভাবাজারের রাজা ছিলেন ইংরেজদের ফার্সী মুন্সি। তাঁর এই সহায়তার জন্য ইংরেজরা তাঁর উপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তাই জমিদারী প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই

১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা হঠাৎ একটি সনদ বার করে, এ রাস্তাটি শোভাবাজারের রাজাকে চিরতরে নিষ্কর বন্দোবস্ত দিলেন। রাজার একটু স্বার্থ ছিল সেটা হল এ রাস্তা দিয়ে রাজার গ্রাম পচাগাঁও যাওয়া যেত।

এরপর ফলতা-দুর্গ যখন তৈরি হল, তখন ফলতা থেকে ঘন-ঘন কলকাতা যাবার প্রয়োজন হওয়াতে, সীতারামপুর থেকে ফলতা পর্যন্ত একটি মিলিটারি রোড তৈরি হল এবং একে বর্তমান সিরাকোলের কাছে রাজার রোডের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল। পরে অবশ্য দ্রুত বর্ধিত মিলিটারি প্রয়োজনে কলকাতা থেকে সিরাকোল পর্যন্ত অংশের কর্তৃত্ব ইংরেজ সরকার নিজেই নিয়ে নেন, কিন্তু সিরাকোল থেকে কুলপি পর্যন্ত অংশটুকু রাজার নামেই থেকে যায়। ঐ অংশের ভার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর পাবলিক ওয়ার্কসের ওপর ন্যস্ত ছিল। ঐ সময়ে ১৯২০ সালে কালীঘাট-ফলতা রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড ঠাকুরপুকুর থেকে সিরাকোল পর্যন্ত এ রাস্তার অংশ রেললাইন পাতার জন্য সাতশত একটাকা এবং কয়েক আনা বাৎসরিক খাজনায় একটি চুক্তি করেন।

গত জেলা জরীপে এ রাস্তার মালিকানা নিয়ে সরকার এবং শোভাবাজার রাজাদের মধ্যে বাঘে-সিংহে লড়াই হয়ে যায়। কিন্তু তাতে এ রাস্তা সরকারের হাতেই থেকে যায়। তারপর বহুদিন কেটে গেছে, কালীঘাট-ফলতা রেলপথ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে এ রাস্তা দুপাশের সৌন্দর্যময় সবুজ বৃক্ষরাজি নিয়ে বেহালা, শখেরবাজার, ঠাকুরপুকুর, আমতলা, রাজারহাট, সিরাকোল, সরষে, ডায়মণ্ডহারবার হয়ে কাকদ্বীপের পথে পাড়ি দিয়েছে। আরও দূরে সেখান থেকে দেহ প্রসারিত করে সে নামখানা ফ্রেজারগঞ্জে চলে গেছে। আজ ভ্রমণকারীরা মোটরবাসে চেপে এই পথ দিয়ে ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ বেড়িয়ে আসেন। কিন্তু এ পথই যে একদিন প্রথম ইংরেজ-

দের মিলিটারি রোড ছিল এবং এ পথ দিয়েই যে ইংরেজরা এসে হৃত কলকাতা পুনরায় উদ্ধার করে রাজা হয়ে বসল সেকথা কি কেউ একবারও মনে করেন ?

মানুষের মনের অতলে এই ঐতিহাসিক তথ্য আজ চাপা পড়ে গেছে।

অথচ এই পথেই লর্ড ক্লাইভ প্রথম বাংলার ভূমিতে পদার্পণ করেন, তারপর কলকাতা দখল এবং পলাশীর যুদ্ধ জিতে নেন। এই তথ্যই ডায়মণ্ডহারবার রোড যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

জরীপের শতবর্ষ

১৯৮৩ সাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অবিভক্ত বাংলার জরীপ বিভাগ তার শতবর্ষের সীমা অতিক্রম করেছে। এটা আর কিছুই নয়, ১৮৮৪ সালে বাংলাদেশে বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসে যে জমি জরীপ অধিকার ও কৃষি অধিকার একসঙ্গে স্থাপিত হয় তারই স্মরণোৎসব। এই জমি জরীপ প্রথার ইতিহাস নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

সে সময়ে কলকাতা ছিল সারা ভারতবর্ষের রাজধানী। বাংলাদেশ তখন ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়নি। আর সারা ভারতে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্বের রথ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছিলো। সেটা ছিলো ১৯২৩ সাল—ইংরেজ আমল। এই সময় কলকাতায় আলিপুরে তৈরি হয় লাল রঙের সার্ভে বিল্ডিংটি—এ. কে. জেমসনের (A. K. Jameson) পরিচালনাধীনে। সুষ্ঠু পরিচালনার ফলে এবং ইংরেজ অফিসারদের নেতৃত্বে সে সময় জমি জরীপের কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হয়। তাই অনেকে মনে করেন জরীপের কাজ ইংরেজরাই প্রথম চালু করে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। সুদূর অতীতে হিন্দু যুগেও ভূমি পরিমাপ বিভাগ ছিলো। সে ইতিহাস পরিষ্কারভাবে আমাদের জানা না থাকলেও মুসলমান যুগে শেরশাহের আমলে (১৫৪০ খ্রী) প্রজাদের বা রায়তদের সুবিধার জন্য 'পাট্টা কবুলতি' প্রথার প্রচলন (যার মাধ্যমে জমিদার প্রজাকে জমি পাট্টা দিয়ে স্বীকার করবে "বন্দোবস্ত দিলাম" এবং প্রজাও কবুলতি লিখে স্বীকার করবে "বন্দোবস্ত নিলাম")—জমি জরীপ প্রথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজস্বমন্ত্রী 'তোডরমল্ল'কে দিয়ে সারা ভারতের জমি সেটেলমেণ্ট করিয়ে বাংলাদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগনায়

ভাগ করেন এবং নির্দেশ দেন যে বাংলাদেশ দিল্লীকে মোট ১ কোটি ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার উনসত্তর টাকা খাজনা দেবে।' এসব কথা আমরা তৎকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' বই থেকে জানতে পারি। মুঘল আমলের বাংলাদেশে পরবর্তী জরীপের কাজ হয় সম্রাট শাহজাহানের সময়। তখন বাংলাদেশের শাসনকর্তা সম্রাট পুত্র শাহসুজা। এই জরীপের সময় সুন্দরবনের অনেকখানি জঙ্গলময় জমি উদ্ধার করে বাংলার দেয় খাজনা চব্বিশ লক্ষ টাকার মতো বাড়ানো হয়। মুঘল আমলে কৃষি ও কৃষকদের উপর যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হত এবং খাজনা ধার্য হত জামর শ্রেণী হিসাবে। মুঘল যুগের শেষ জরীপের কাজ সম্পন্ন হয় সম্রাট মুহম্মদ শাহ-এর সময় যখন বাংলার শাসক মুর্শিদকুলী খাঁ। 'জমা-ই-কামিল তুমার' নামের এই শেষ জরীপটি ছিল প্রধানত পরিবর্তন-ভিত্তিক। যে বাংলা প্রদেশ এযাবৎ 'সরকারে' (জেলার মতো এলাকা) বিভক্ত ছিলো তাকে নতুন করে 'চাকলায়' বিভক্ত করা হয়। আর 'পরগনার' সংখ্যা ৬৮২ থেকে ১৬৬০টি করা হয় এবং ১৯টি সরকারকে ১৩টি 'চাকলাতে' পরিণত করা হয়। শুধু তাই নয়, বাংলার দেয় খাজনার পরিমাণও প্রায় ১২ লক্ষ টাকার মতো বাড়িয়ে এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার একশত ছিয়াশি টাকা ধার্য করা হয়েছিলো।

মুঘল যুগে প্রজাদের জমির কোন মানচিত্র ছিল না, ছিল শুধু খতিয়ান (বিবরণ)। এই মানচিত্রের আমদানি হয়েছে পরবর্তীকালে য়ুরোপীয়দের দ্বারা। পর্তুগীজ গভর্নর ভ্যানডেন ব্রুক বৃহত্তর বাংলার জন্য সর্বপ্রথম মানচিত্র তৈরি করেন। সেটা ছিলো সম্রাট আরঙ্গজীবের আমল। তারও পরে ইংরেজ শাসন যখন শুরু হল তখন ফোর্টউইলিয়মের গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট বাংলা প্রেসিডেন্সীর সার্ভেয়ার জেনারেল হিসাবে জেমস রেনেল নামের এক সাহেবকে নিযুক্ত করে তাঁকে দিয়ে বাংলা-

দেশের নদীসমূহের গতিপথের এক সুস্পষ্ট মানচিত্র করিয়েছিলেন। সেটা ছিল ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দ। ১৭৯৩ সালে হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আর বাংলায় রাজস্ব জরীপ শুরু হয়েছিলো প্রথমে মেদিনীপুর জেলার হিজলিতে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে। কলকাতাই তখন ভারতের রাজধানী। ২৪ পরগনার রাজস্ব জরীপ শুরু হয়েছিল ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে। বর্তমান মহাকরণে ১৮৮৪ সালে প্রথম সেটলমেণ্ট বিভাগ স্থাপিত হয়। সে সময় এর সঙ্গে কৃষি বিভাগ যুক্ত ছিলো। এই সময় থেকে অবিভক্ত বাংলার সব জেলাতেই রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে যোগ্য ইংরাজ অফিসারদের নেতৃত্বে শুরু হয় গ্রামের মানচিত্র ও প্রজাদের নামে খতিয়ান তৈরির মাধ্যমে জেলা জরীপের কাজ, যার উপর ভিত্তি করে ১৯৫৩ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন প্রস্তুত করা হয়েছিলো। এর পরবর্তী কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যতগুলি রিভিসনাল জরীপ আমাদের দেশে হয়েছে তার সবগুলিই সেই জেলা জরীপকে অবলম্বন করে।

আজ আধুনিকীকরণের ফলে জরীপ বিভাগের কাজ অনেক সহজ-সাধ্য হলেও তৎকালীন যুগে কিন্তু এই বিভাগের কাজ ছিলো অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও কষ্টসাধ্য। শত শত ভারতীয় শ্রমিক প্রকৃতির রুদ্ররোষকে অগ্রাহ্য করে জল, জঙ্গল, পাহাড়, নদীতে জরীপের কাজ করেছে। কিন্তু শতবর্ষেও এদের দুঃখদুর্দশার কথা কোথাও লেখা হয়নি।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভাঙাগড়ার ইতিহাস

অবশেষে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অবলুপ্তি ঘটল।

জেলাকে দুটি ভাগে ভাগ করে নাম দেওয়া হল উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর।

গত ৩০শে জানুয়ারী ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছোট্ট একটি সংবাদে প্রথম এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি এইরকম,—**The Chief minister has formally sanctioned the Proposal to bifurcate West Dinajpur district.**

The new districts will have their headquarters at Balurghat and Raiganj.

এই ঘোষণায় খুশি হল রায়গঞ্জ এবং ইসলামপুর মহকুমার সাধারণ অধিবাসীরা।

কারণ সরকারি এবং বেসরকারি কাজে বালুরঘাটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে তাদের যেমন হত অর্থব্যয়, তেমনি হত পরিশ্রম এবং হয়রানি।

কিন্তু ক্ষুব্ধ হল বালুরঘাট শহরের নাগরিকরা। তারা মনে করলো যে তাদের শহর জেলাশহর থাকলেও তার গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেল।

বিদায়, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বিদায়! এই বাণী উচ্চারণের আগে এই জেলার অতীত ইতিহাস একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা খণ্ডিত করার তারিখ হল ১লা এপ্রিল ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দ।

মাত্র ৪৭ বৎসর সাড়ে সাত মাস আয়ুষ্কাল। গত ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারাতে তার জন্ম, আর ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল তার অবলুপ্তি হল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর এক আদেশে।

এত স্বল্পায়ু কোন জেলার ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

ভারতের স্বাধীনতার সময়ে (১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ খ্রীঃ) স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ বাংলা এবং পঞ্জাব প্রদেশের বাঁটোয়ারা-কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলা ভাগের রিপোর্টে (Annexure —A) তিনি বলেছিলেন,

A line shall then be drawn from the point where the boundary between the thanas of Haripur & Raiganj in the district of Dinajpur meets the border of the Province of Bihar to the point where the boundary between the district of 24 Parganas & Khulna meets the Bay of Bengal.

The line shall follow the course indicated in the following Paragraphs.

The line shall run along the boundary between the following thanas :

Haripur & Raiganj, Haripur & Hemtabad, Ranisankail & Hemtabad, Pirganj and Hemtabad, Pirganj and Kaliaganj, Bochaganj and Kaliaganj, Biral & Kaliaganj, Biral & Kushmundi, Biral & Gangarampur, Dinajpur & Gangarampur, Dinajpur & Kumarganj, Chiribandar & Kumarganj, Phulbari & Kumarganj, Phulbari & Balurghat.

It shall terminate at the point where the boundary between Phulbari and Balurghat meets the North-south line of the Bengal Assam Railway in the eastern corner of the thana of Balurghat,

The line shall turn down the western edge until it meets the boundary between the thanas of Balurghat Panchbibi. From that point the line shall run along the boundary between the following thanas : Balurghat & Panchbibi, Balurghat & Joypurhat, Balurghat & Dhamairhat, Tapan & Patnitala, Tapan & Porsha.

সৃষ্টি হল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা, পুরাতন দিনাজপুর জেলা থেকে।

সদর দপ্তর হল পূর্বতন বালুরঘাট মহকুমার সদর দপ্তর বালুরঘাট শহরে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে বালুরঘাট মহকুমা শহর হিসেবে মর্যাদা পেয়েছিল ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে।

ইংরাজী ৯।১০।১৯৪৭ তারিখে কলকাতা গেজেটে নতুন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সৃষ্টি সম্পর্কে নিম্নরূপ ঘোষণা করা হল,

Creation of a new Zilla to be styled the district of West Dinajpur,

Notification on 9485 Jur dated 27. 9. 47

নতুন গঠিত এই জেলার মহকুমা হল একটি, বালুরঘাট। আর থানার সংখ্যা হল দশটি। যেমন,

বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, তপন, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, বংশীহারি, কুশমুণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার।

গেজেটের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হল,

The notification shall be deemed to have effect and to have always have effect as it had been issued on 17. 8 1947

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই সময়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের দেশ বিভাগের পরে পশ্চিম বাংলার মোট বিভাগ ছিল দুটি, প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং বর্ধমান বিভাগ।

কলকাতা গেজেটের 9487 dt 27. 9. 1947 সংখ্যক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল,

The Presidency division in the state of West Bengal shall be deemed to have comprised and shall comprise the Town of Calcutta, the district of Darjeeling & Murshidabad, this new district of Malda, Jalpaiguri, Nabadwip & West Dinajpur as as respectively constituted under notification no 9482 Jur/9483 Jur/9484 Jur/9485 Jur dt 27. 9, 47 and the district of 24 Paragans as constituted under notification no 9486 Jur dt 27. 9, 47,

[Calcutta Gazette dt 9, 10, 47, part I page 219]

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে যখন জলপাইগুড়ি বিভাগ সৃষ্টি করা হল, তখন থেকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে জলপাইগুড়ি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হল। গেজেটের বিজ্ঞপ্তি ছিল নিম্নরূপ :—

The new Jalpaiguri division comprising of the district, (1) Darjeeling, (2) Jalpaiguri, (3) Cooch-

Behar, (4) Malda & (5) West Dinajpur.
[Notification on 998 G A dt 4. 3. 1963, Published in the Calcutta Gazette 1963 part page 55]

সেই থেকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা জলপাইগুড়ি বিভাগেই আছে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সৃষ্টির পুরাতন কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক।

হিলি থানার সৃষ্টি হল ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে। কলকাতা গেজেট নোটিফিকেশান নম্বর হল, 1150 PL dt. 8.5.1948।

এই সময় পর্যন্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মোট থানার সংখ্যা ছিল ১১টি এবং মহকুমা একটি, বালুরঘাট সদর মহকুমা।

রায়গঞ্জ মহকুমার জন্ম হল ১৪ই জুলাই ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে।

কলকাতা গেজেট নোটিফিকেশান নম্বর হল, 1029 GA dt 11. 4. 1949

এই সময় থেকে জেলার মহকুমার সংখ্যা দাঁড়াল দুইটি, বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জ।

রায়গঞ্জ মহকুমা বা সাবডিভিশানের থানার সংখ্যা হল ৬টি।

যেমন—রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, বংশীহারি, কুশমুণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ এবং ইটাহার।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আয়তন বৃদ্ধি কিন্তু থেমে রইল না।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে State Reorganisation Commission-এর রায়ে বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলার থেকে ৪টি থানা ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, করণদিঘি, চোপরা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হল। প্রথমে এই থানাগুলিকে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পরে এদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হল।

এই চার থানা নিয়ে ইসলামপুর মহকুমা তৈরী হল।

সে সময়ে কলকাতা গেজেটে নোটিফিকেশান ছিল এইরকম :

To make on and from 21 day of March 1959 a new subdivision of West Dinajpur district to be styled as Islampur subdivision comprising police stations, namely,

(i) Chopra as constituted by notification no 1177 GA dt. 20|3|1959

(ii) Karandighi,

(iii) Islampur,

(iv) Goalpokhor,

পরবর্তী সময়ে শাসনকার্যের সুবিধের জন্য গোয়ালপোখর থানাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হল—গোয়ালপোখর থানা, এবং চাকুলিয়া থানা।

১৯৫৫ জমিদারি অধিগ্রহণ আইনে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে জরীপ করা হয়।

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের সেনসাস্ রিপোর্টে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থা ছিল এইরকম :

মহকুমা তিনটি, বালুরঘাট সদর, রায়গঞ্জ, ইসলামপুর।

থানার সংখ্যা ১৬টি।

বালুরঘাট মহকুমার থানা ৫টি, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, হিলি, তপন, গঙ্গারামপুর।

রায়গঞ্জ মহকুমায় থানা হল ৬টি, রায়গঞ্জ, ইটাহার, কুশমুণ্ডি হেমতাবাদ, বংশীহারি, কালিয়াগঞ্জ।

ইসলামপুর মহকুমায় থানার সংখ্যা হল ৫টি, যেমন—চোপরা, ইসলামপুর, করণদিঘি, গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়া।

জেলার আয়তন : ৫৮৫৮ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ২,৪০৪,৯৪৭।

পুরুষ : ১,২৪১,৬১১।

স্ত্রী : ১,১৬৩,৩৩৬।

মোট গ্রামের সংখ্যা : ৩১৩৮টি।

শহরের সংখ্যা : ৮টি।

শিক্ষিতের হার শতকরা : ২৭ জন।

জেলাটি কৃষিপ্রধান, রায়গঞ্জ মহকুমায় শিল্পবাণিজ্যের কিছু প্রসার ঘটেছে।

জেলায় একটিমাত্র চা বাগান আছে, ইসলামপুর মহকুমার চোপরা থানায় মহানন্দা নদীর অদূরে।

চা বাগানের নাম দেবীঝোড়া টি এস্টেট।

এবারের নতুন আদেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন, উত্তর দিনাজপুর জেলা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা।

উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর দপ্তর হল রায়গঞ্জ।

মহকুমা দুটি, রায়গঞ্জ সদর এবং ইসলামপুর।

থানার সংখ্যা রায়গঞ্জ মহকুমাতে ৪টি, যেমন—রায়গঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ।

ইসলামপুর মহকুমায় থানার সংখ্যা হল ৫টি, যেমন—ইসলামপুর, চোপরা, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মহকুমার সংখ্যা একটি, বালুরঘাট সদর।

থানার সংখ্যা হল ৮টি, যেমন—বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ, তপন, গঙ্গারামপুর, বংশীহারি, হরিরামপুর, কুশমুণ্ডি।

কলকাতা গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর হল, 177 L, R date 28. 3. 1992

দীর্ঘ বিচিত্র এই পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। এর দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নেই।

গুরুতর এর সীমান্ত সমস্যা। প্রায় গোটা জেলার অধিকাংশ থানাই বাংলাদেশের সঙ্গে সীমানাযুক্ত হওয়াতে—চোরাচালানি, ডাকাতি, ইত্যাদি নানা অপরাধমূলক কার্যকলাপের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাছাড়া জেলার সদর দপ্তর জেলার একপ্রান্তে হওয়ায় জনসাধারণের যেমন অসুবিধের অন্ত ছিল না, তেমনি জেলা পর্যায়ের অফিসারদের ইসলামপুর মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির উপর নজর রাখা দুরূহ ব্যাপার ছিল। এই সমস্ত কথা চিন্তা করেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রায়গঞ্জের কাছে কর্ণজোড়া নামক স্থানে জেলা শহর পত্তন করেছিলেন। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট সব কিছু তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন বালুরঘাট-বাসীদের প্রবল গণ-আন্দোলনে জেলার সদর দপ্তর বালুরঘাট থেকে কর্ণঝোড়ায় সরানো সম্ভব হয়নি।

অবশেষে ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জেলাকে দুটি ভাগে ভাগ করে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করলেন।

দুটি নতুন জেলার জন্ম হল,—উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর।

এই সঙ্গে ভাগ হল পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নদ-নদী, কৃষিক্ষেত্র, পুকুর, স্কুল-কলেজ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হাট, মেলা, মানুষজন সব কিছু।

ভবিষ্যতের মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যাবে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কথা।

তারা জানবে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর দুটি পৃথক জেলাকে।

অথচ ৪৪ বৎসরের অধিককাল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভারতের মানচিত্রে সত্য ছিল।

কিন্তু দুঃখ করে কোন লাভ নেই। কারণ জনসাধারণের বর্ধিত প্রয়োজনে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তনের জোয়ার আসে তার ছাপ তো দেশের মাটির উপর পড়বেই।

এ সত্য তো আমরা ইতিহাসে অনেকবার দেখেছি।

—

গ্রন্থপঞ্জী

1. Indian Land System Ancient Mediaeval & Modern : Radha Kumud Mukherjee
2. The Agrarian System of Moslem India : W. H. Moreland.
3. Ain-I-Akbari of Abul Fazal-I-Allami Translated by Colonel H. S. Jarrett, Corrected by Jadunath Sarkar.
4. Mughal Rule in India : V. D. Mahajan.
5. Mughal Empire : A. L. Srivastava.
6. History of Bengal (Mediaeval) : Dr. R. C. Mazumdar.
7. The Delhi Sultanate Vol. VI Published by Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay.
8. ভারতবর্ষের ইতিহাস : ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী।
9. পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত : ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।
10. The Final Report of Survey & Settlement operation in 24 Parganas, 1924-33 by Rai Bahadur A. C. Lahiri.
11. The Centenary Volume (1884-1984) : Published by Directorate of Land Record & Survey, West Bengal.
12. শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ : ড. দীনেশচন্দ্র সরকার।
13. রানী ভবানী : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সম্পাদনা : নিশীথরঞ্জন রায়।
14. মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি (২য় ভাগ) : কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
15. Old Surveys : F. C. Hirst.
16. Final report on the survey and settlement operation in the district of Dinajpore : F. O. Bell. I. C. S.
17. Final report on the survey and settlement operation in the district of Khulna : L. R. Fawcus.
18. Census of India 1901 vol VII Calcutta and Suburbs : A. K. Roy.
19. Old Calcutta survey : F. C. Hirst.
20. James Rennel : F. C. Hirst.

21. Journal : James Rennel.
22. Bengal District Gazetteer, 24 Parganas : O' Malley
23. Bengal District Gazetteer, Khulna : O' Malley.
24. Revenue History of Sundarban : F. E Pargiter.
25. Revenue History of Sundarban surveys : Ascoli.
26. Affairs of East India Company : Firminger.

নির্ঘণ্ট

অংশুমান ১২৮
অগ্রদ্বীপ ২৭
অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী ১০৪
অনিলচন্দ্র লাহিড়ী ১৫৩
অন্ধমুনি ১৩১
অযোধ্যা ৫৯
অরিংবেড়ী খাল ৯০
অসমঞ্জ ১২৮

আইন-ই-আকবরী ২, ১১২
আওরংজীব, সম্রাট ১৬, ১৫৭
আকবর সম্রাট ১২
আকবর নগর ১৯
আকবরপুর ৩, ৬
আগ্রা ৫৯
আগ্রা ফোর্ট ৪
আজমীর ৫৯
আজিমাবাদ ৬
আজিমুশ্বান ১৮
আটপুর ৮০
আড়িয়াদহ, আর্যদ্বীপ ২৮
আদিগঙ্গা ৮১, ১২৮, ১২৯
আদিশূর ২৯
আনোয়ারপুর ১৬৪
আপজন্, এ ১২৪
আবদুল মজিদ (খাজা) ৫৯
আবুল ফজল ২, ১১২
আমল গুজার ৬৪, ৬৭
আমহার্স্ট লর্ড ১৬৪
আমিরপুর ৬
আমিরাবাদ ৬, ৮৪
আমিল (Aumil) ৬৮
আয়ার ৮৪
আরমানি টোলা ১৭৬
আরমেনিয়ান সৈন্য ৮১
আলমগীর দ্বিতীয় ৯৫
আলাউদ্দিন খিলজী ৩৪
আলিপুর ৮১
আলিবর্দী, নবাব ২০
আলেকজাণ্ডার কিড্ ৮৭
আসেকুর ৯২
আহম্মদনগর ৫৯
আহম্মদাবাদ ৫৯

ইংরেজ ৫
ইকতা ৪৩
ইকতাদার ৫৬
ইছামতী নদী ৯২
ইন্টালী ১৭৫
ইনডেক্স ম্যাপ্ ৯৩
ইন্দ্র ১৩৩
ইব্রাহিম খাঁ, সুবাদার ৭৮, ৮৩
ইসলাম খাঁ, সুবাদার ১৬
ইসলামাবাদ ১৯
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৭

উইলকিনসন (রেভিনু সার্ভেয়ার) ৮
উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, লর্ড ১৬৫
উইলিয়াম, সম্রাট ৮০
উইলিয়াম, উইলকক্স ১৩৪
উইলিয়াম নারস ৮০
উইলিয়াম হ্যামিলটন ১৩৬
উইলসন লেফটন্যান্ট (ক্যাপ্টেন) ১২৪, ১৩৭
উইলসন ৭৬
উড়িষ্যা ১৯
উদমবর (তান্দা) ৭১
উধুয়ানালা প্ল্যান ৯৩
উমাকান্ত সেন ১১৮
উমিচাঁদের বাগানবাড়ি ১২৪
উলুবেড়িয়া ৮২
উল্টাডিঙ্গি ১৭৫

এক্তিয়ারপুর ৬
এয়ার সার্ভে কোম্পানী ১৪২, ১৭৩
এলাহাবাদ ৫৯
এলাহিগঞ্জ ৬৫

ওয়াকিয়া নবীশ ৬৭
ওয়ালশ ৮৪
ওয়ারেন হেস্টিংস ১১০, ১১৫
ওয়েস্টল্যাণ্ড কলস্ ১৮২৫ খ্রী ১১৭
ওয়েস্টল্যাণ্ড কলস ১৮৫৩ খ্রী ১১৮
ওলন্দাজ (Dutch) ১৬৪, ১৫৪

কটক ৭২
কড়াইবাড়ি ১৯
কপিলমুনি ১২৮
কবিরাম ২৫, ১৭৩
কবুলতি ৫৩
কর্নওয়ালিশ, লর্ড ৭, ৭৬, ১৩৫
করিজড়ি (খাড়ি) ৬, ১০২
কলকাতা, কলিকাতা ৩, ৬, ২৯, ১৭৩
কলিঙ্গ ৭১
কলিঙ্গা / কলিঙ্গা ১৩৭, ১৭৫
কাকদ্বীপ ১৩২
কাজি ৬৭
কাজি ফজিলত ৫৬
কানুনগো ৫, ১৩, ৫৭
কান্দী ১৭
কামদেব ব্রহ্মচারী ৭৪
কামরূপ ২৮
কারকুন ৩৩, ৫৭
কারটার, এম.ও. ১৪২, ১৪৭
কালিঘাট ৭৭, ১২৮
কালিঞ্জর দুর্গ ২
কালী ৭৬
কালীক্ষেত্র ২৯
কালীঘাট ফলতা রেলওয়ে কোম্পানী ১৭৯
কালেক্টর ৭, ৮৬
কাবুল ৫৯
কাশিমবাজার ৮১
কাশী ১৬
কাশীনগর ১৩০
কিনড়ারস্লি, জে. বি. ১৪৮
কিলকিলা প্রদেশ ২৫, ১৭৩
কিল্লাদার ৫৬
কিসমেৎ-ই-গল্লা ৫২
কিস্তোয়ার ১৪৯

কিস্তিমারিয়া ৯১
কেল্প ১১৮
কুতুবুদ্দিন আইবক ৩১
কুমারখালি ৯২
কুলপী ৫
কুষ্টিয়া ৯০
কূর্ম ২৫
কোতোয়াল ৬৭
কৃষ্ণরাম ১২৯
কৃষ্ণচন্দ্রপুর ১৩০
ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ১০
ক্যানিং, লর্ড ১৬৫
ক্রীক্ রো ১২৪, ১৭৪
ক্লাইভ লর্ড ৭, ৮৭, ৯৭

খড়দা ২৬, ২৭
খতিয়ান / স্বত্বলিপি ১৫৬
খতিয়ান বই ৩৯
খাজনাদার ৬৮
খাজা আবদুল মজিদ ৫৯
খান-ই-আজম (কোকা) ৭০
খান-ই-জাহান (হুসেন কুলী খাঁ) ৭০
খান্দেশ ৫৯
খারাজ ৩১, ৫৮
খারের / খাড়ি / খাড়িজুড়ি / করিজুড়ি ৪, ৬, ১০২, ১৩০
খালসা জমি ৩, ১২, ৪৫
খাসপুর ৫, ৬, ১৫৮
খিদিরপুর ১৫৯
খুৎ ৩৪

গঙ্গা (নদী) ১৯, ২৭
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ২১
গঙ্গানগর দ্বীপ ৯১
গঙ্গাসাগর ১৬৩
গলফ্ ক্লাব, কলকাতা ১৪২
গল্লাবক্স ৬১, ৭১
গাইঘাটা ১১
গাণ্টার চেন ২, ১৫৫
গিয়াসুদ্দিন বলবন ৩৩
গুজরাট ৬০
গুবিকুন্দপুর ৯০
গুনিয়া ১৫৫
গের্দা হাভেলি ১৬
গোবিন্দপুর ২৬, ৮৩
গোমেজ ১১৯
গোলতলা, গোলপুকুর ১৭৫
গৌরাঙ্গ সিংহ ২১
গ্যাগারিন, য়ুরি ১৪০
গ্যাব্রিয়েল বাউটন ৮১
গ্রাম পঞ্চায়েত ৫৭

ঘুর, ঘোর ৬
ঘোড়াঘাট ১৯

চট্টগ্রাম ১০, ৭১, ৮৩
চন্দনা নদী ৯২
চন্দ বন্দ ১১৩
চন্দ্রদ্বীপ ১১৩
চব্বিশ পরগনা ৩, ১৪৬
চরবাঘাট ৯০
চাকলা ৫, ১৯
চাকদা / চক্রদ্বীপ ২৭
চাচর ৬৪

চার্লস ক্রফোর্ড ৮৭
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৭
চিৎপুর ১৭৪
চিত্রেশ্বরীর মূর্তি ১৭৪
চুঁচড়া ৮১
চৈতন্য ভাগবত ১০৪, ১২৯
চোরা গঙ্গা ধারা ১৩১
চোর মদ ভাঙ্গা ৯১
চৌকিদার ৫৭
চৌধুরী ১৩, ৪৬
চৌরঙ্গী ৭৭, ১৩৫
চৌরঙ্গ স্বামী ৭৭
চ্যাটার্জী কে. কে. ১৪৭

ছত্রভোগ ১৩০

জন গারষ্টিন ৮৭
জন গোল্ডসবরো ৮৪
জন্নতাবাদ (গৌড়) ৭১
জমা ৬৪
জমা-ই-কামিল তুমার ৫, ১৯
জরীব ৬৬
জরীবি প্রথা ৫২
জয়নারায়ণ কানুনগো ২০
জয়ানন্দ মজুমদার ৭৩
জলেশ্বর ৭২
জলদস্যু ১৬
জাফরাগঞ্জ খাল ৯১
জাবতি ৬১, ৭১
জায়গীরদার ৪৩
জাহাঙ্গীর, সম্রাট ৪, ১৬
জাহাঙ্গীর নগর ১৯
জিয়া গাঙ্গুলি ৭৩
জেমসন, এ. কে. ১০, ১৪৮
জেলা জরীপ ৭৩
জিয়া গাঙ্গুলি ৭৩
জৈনদ্দিন খাঁ / জুদি খাঁ ৮৪
জোব চার্নক ৮০, ৮১, ৮৩, ১৩৫
জ্যোতি বসু ১৯১

থ্যাক্ সার্ভে ৯
থিওড লাইট ১৪১

দক্ষ ২৮
দক্ষিণ রায় ১০৬
দক্ষিণ সাগর ৬
দখলি স্বত্ব ৫০
দলিলউদ্দিন আহমেদ ১১১
দর্পনারায়ণ কানুনগো ১৭
দশশালা বন্দোবস্ত ৭
দস্তুর ৫৪
দায়ুদ খাঁ ২, ১০৫
দ্বারকানাথ ঠাকুর ২৭
দাম (Dam) ৭২
দাশগুপ্ত, পি. আর. ১৪৮
দিনাজপুর সেটলমেন্ট ১৪৫
দিগ্বিজয় প্রকাশ ২৫, ১৭৩
দিল্লি ৬, ৫৯
দিয়ারা ২৭
দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ১৬৭
দেওয়ানী ৭
দেবী ঝোড়া টিএস্টেট ১৯০
দেহাত / মৌজা ৩২
দৈবকীনন্দন ১৭

ধলেশ্বরী নদী ৯২
ধামাই ১৩০

নদীয়া, নবদ্বীপ ২৭
নদীজরীপ ৮৭
নমক ৬৫
নিমাই ১০৪
ন্যায়করণিক ৩২

টমাস কল ৮৭
টালিগঞ্জ ১৫৭
টালি, উইলিয়াম ১৫৯
টিপু সুলতান ১৬০
টিকিয়া দ্বীপ ৯১

ঠনঠনিয়া ১৭৫

ডাইরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস ১৫
ডাকার্ণব ১০৩
ডাচ ৮১
ডাভে ৮
ডালহৌসী স্কোয়ার ৭৯
ডাহাপাড়া ১৯
ড্যামপীয়ার ১১৭
ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ১২০
ডি ব্যারোস ৮০
ডোন থ্যাকি ৯৩
ডোল ১১৭
ডোনাল্ড সাণ্ডার ১১৯
ডোম্মন পাল ১০৪

ডালিপুর / ঢালিয়াপুর ৪
ঢোলাহাট ১৩০

তপশিল ৮৫
তরাই ৩১
তাজমহল ৪
তাড়দা মৌজা ১৫৯
তান্না (কেল্লা) ৮০, ৮২
তাম্রলিপ্ত ২৮
তোডরমল্ল মহারাজ ২, ১২, ৬০, ৭০, ১৪০
তৌজী ৮, ১৬৮

ত্রিবেণী ৮০
ত্রিপুরেশ্বরী ১৩১
পাত্তনিদার ৯
পদ্মা ৯০
পদ্মপুকুর ১৭৪
পঞ্চান্নগ্রাম ১০৮
পরগনা ৩, ৩২, ১৬২,
পর্তুগীজ ১৭৬, ৮০, ১৬
পরোয়ানা ৫
পলাশী ৫, ৬
পশ্চিম দিনাজপুর ১৮৪
পাইকান ৬, ৮৪, ১৩৫
পাঁচু গাঙ্গুলী ৭৩
পাঁচুর ৯১
পাট্টা কবুলতি ২, ১৮১
পাটনা ৮১
পাটোয়ারী ১৩, ৩২, ৪৫, ৬৯
পানহালা দুর্গ ৮০
পারজিটার ১১৩
পারৌতি ৬১

পি-৭০ সীট ১৪১
পিকুলি ৬
পিনেল এল জি ১৪৭
পীঠস্থান ২৮
পীঠমালা ২৯
পীর মানিক ১৭৬
পুখুরিয়া ১৬
পুণ্ড্র ২৮
পুরা/পুঁড়া ৪
পুর্ণিয়া ৭১
পুস্তপালস ৩২
পেমরবাটন ১৪১
পোলজ ৬০
পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ৩০
পৃথ্বীরাজ ৩১
প্রতাপাদিত্য ৭৭, ৮০, ১৩৫
প্রাণ ৮৪
প্রিনসেপ, এনসাইন ১১৬, ১৩১
প্রেসিডেন্সি বিভাগ ১৮৭

ফ্রকাস, এল আর ১০, ১৪৬
ফকিরের স্থান ৭৬
ফতাবাদ ৭১
ফরিদ খাঁ ৫১
ফার্গুসান ২৭
ফার্মান ১৫
ফার্মিঙ্গার ১৩
ফারুকশায়ার, সম্রাট ১৩৬
ফিমুকেন এম ৯
ফিরোজ তুঘলক ৪০, ৪১
ফিরিঙ্গি বাজার ৯২
ফোজেদার ৫৭, ৬৮
ফোর্ট উইলিয়াম ২৬, ৭৯
ফৌজদার ৬৭
ফৌজদারী বালাখানা ১৭৭

বকশী ৬৭
বকুলতলা ১০৩
বঙ্গবিনোদ মিত্র ১৫
বঙ্গবিভাগ ১১
বঙ্গাধিকারী ১৫
বঙ্গোপসাগর ১১৩
বড়খাঁ গাজী ১০৬
বর্ধমান ১৯
বর্ধমান বিভাগ ১৮৭
বনগা ১১, ১৭২
বরিশাল ১১২
বরানগর/বরাহনগর ২৮
বরকাবাদ ৭১
বল্লাল সেন ২৯
বসন ডহরি/বাসুন্দি ৬
বসিরহাট ১৬৫
বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি ১০৬
বাংলা ভাগের রিপোর্ট ১৮৫
বাউধেন/বুরণ ৪
বাকলা ৭১
বাখরগঞ্জ ১০
বাগুন্দি ১৬৫
বাগদা ১১
বাজুহা ৭১
বানজর্ ৬১
বার্জ, বি. ই জে ১০, ১৩২, ১৪৭
বাবর, সম্রাট ৪২
বারমুখুটি/বারিদহাটি ৩, ৬

বারুইপুর ১৬৫
বারবকপুর ৩
বালিণ্ডা, বালণ্ডা ৩
বালেশ্বর ৮১, ১৯
বালেয়া, বালিয়া ৮, ৬
বামফ্রন্ট সরকার ১০২
বারাতলা ১৩০, ১৩২
বারাসত ১৬৫
বাঁশবেড়িয়া ২৬
বাসুদেব ১০৪
বাহলুললোদি ৪২
বাহাদুর খাঁ ৮৩
ব্লাস্ট এনসাইন ১২৬
ব্লানফোর্ড ম্যানুয়েল ২৭
বিঘা ৬৫
বিজাবা ৭১
বিতিকিচি ৬৮
বিদ্যাধরী নদী ১৫৯
বিধানচন্দ্র রায় ১৬৭
বিমান জরীপ ১৭০
বিপ্রদাস ১৭৩
বিবাদী বাগ ৫৭
বিলন ১১০, ১২৬
বিশওঁয়া ৬৫
বিশওঁয়ানশা ৬৫
বিষয় ৩২
বিষ্ণুচক্র ১১৩
বিহার ৫৯
বুড়িগঙ্গা ১৯, ৯২
বুন্দারকুল্লা ৯১
বুরজুট্টি ৬
বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট ৯, ১৪৭
বেতোর ৮১
বেরার ৫৯
বালিয়াঘাটা ১৭৩
বেহালা ৮০
ব্লেন সাহেব ১১৬
ব্যবহারিক শব্দকোষ ৭৫
ব্যারাকপুর (মহকুমা) ১৬৪, ১৬৬
ব্যাসদেব শর্মা ১০৭
ব্রাহ্মণসর্বস্ব (গ্রন্থ) ২৯

ভগবান মিত্র ১৪, ২৪
ভগীরথ ১২৮, ১৩৯
ভট্টবাটি ১৯
ভবানন্দ মজুমদার ৭৩
ভাটপাড়া ২৬
ভাটি ১১২
ভারতচন্দ্র (কবি) ৭৫
ভুক্তি ৩৩
ভূষণা ১৯
ভ্যানডেন ব্রুক ৮০
ভ্যান্সিটার্ট ৮৯, ১৮২

মকর সংক্রান্তি ১৩৩, ১৩৪
মগ ১৬
মজুমদার ৭৩
মধ্যস্বত্বাধিকারী ৯
মনসুদাবাদ ৯১
মণ্ডলগ্রাম ১০৪
মনসবদার ৭, ৬৬
মনসামঙ্গল কাব্য ১৭৩
মনোহর দত্ত ৮৪
মমতাজ ৪

ময়ূর সিংহাসন ৪
মরিসন সাহেব ১১৬, ১৩১
মহম্মদ আমিরপুর ৬
মহম্মদ আনিস ৯৮
মহল ৪৩
মহেন্দ্র নারায়ণ ২১
মহাদেব ২৮
মহম্মদাবাদ ৭১
মাতলা ৮০, ১৫৯
মানিকতলা ১৭৮
মানসিংহ, মহারাজ ৭০, ৭৩, ১০৫, ১৩৫
মানপুর (অংশ) ৬
মান্দারণ ৭১
মারাঠা ডিচ্ ১২৪
মার্ক উড্ ৮৭, ১২৫
মালাবাক্‌লাগার গুপ্তাখাল ১৩১
মালাটাচ্ ৯৩
মালব ৫৯
মালদা ১৭
মায়হাটি/মাইহাটি ৪
মিত্রইমূল/মেদনমল্ল ৪, ৬
মিরজাপুর ১৭৫
মীরজাফর ৭, ৯৫
মুকুন্দ দাস ১
মুকুন্দরাম ১২৯
মুকোওরা/মাগুরা ৩
মুকোন্দম ৬৯
মুজাফর তুরমতি খাঁন ৫৯, ৭০
মুদগাছা/নুড়াগাছা/মুরাগাছা ৪, ৬
মুনতাখাব ৬৩
মুনসীফ ৫৬
মুনসীফ্-ই-মুনসীফান ৫৬
মুরাদ খাঁ ১১৪
মুলতান ৫৯
মুল্লোপাড়া ৯১
মুর্শিদাবাদ ১৮, ১৯
মুর্শিদকুলী খাঁ ৪, ৭২, ১৩৭
মুহম্মদ ঘুরি ৩১
মুহম্মদ তুঘলক ৩৮
মুহম্মদ শাহ, সম্রাট ৪, ২০
মেকলে ৩
মেঘনা নদী ৯২
মেছুয়া বাজার ১০৫
মেন্দিগঞ্জ খাল ৯২
মেদিয়া/ময়দা/মায়দা ৬
মেলাংমহল ৬
মোগল/মুঘল ১২
ম্যানগলস ১১৭
ম্যালকক ১১৭

যশোহর ১৯
যমুনা নদী ৮০, ৪১
যাচমুহরি ১

রঘুনাথ ১৭
রটিনগঞ্জ খাল ৯১
রডা ৮০
রবার্ট হিট কোলব্রুক ৮৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪
রস্ পি ১১৯
রসুম বা দস্তুর, নানকর ১৮
রাইটার্স বিল্ডিংস ৯
রাজস্ব জরীপ ৭

রাঙ্গা রোড ১৭৮
রাজমহল ১৬, ২৭
রাধাবাজার ৭৭
রামচাঁদ ৮৪
রামজীবন ১৭
রামভদ্র ৮৪
রায়গড় (গার্ডেনরীচ) ৮০
রায়মঙ্গল ১০৬, ১২৯
রেইলে ১১৮
রেগুলেশান নং৩/১৮২৮ খ্রী. ১১৭
রেনেল, জেমস ৭, ৮৭
রেন্ট অ্যাক্ট ১৮৫৯ খ্রী. ৯
রোকনপুর পরগনা ১৫, ২২
র‍্যালফ শেলডম ৮৬
র‍্যাডক্লিফ, সিরিল ১৮৫

ল্যটারি কমিটি ১২৬
লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার ৭৩, ৮৫, ১৩৫
লক্ষ্মীনারায়ণ ২০
লয়েড ১৩১
লাঙ্গল হিসাব ৪৭
লালকেল্লা ৪
লালবাজার ৭৭
লালমোহন বসু ১৫১
লালপুর/লালুয়া/নালুয়া ১৩০
লাহোর ৫৯

শশ' ১১৮
শায়েস্তা খাঁ ৭৭, ৮২
শালকিয়া ৮০
শাহজাহান, সম্রাট ৪, ১৬
শাহনগর ৬
শাহপুর ৬
শাহ আলম, সম্রাট ৭
শাহবাজ খান ৭০
শিকদার ৫৬, ৬৮
শিকদার-ই-শিকদারান ৫৬
শিবগঞ্জ ১৬
শিবনারায়ণ, কানুনগো ২০
শিবাদহ ২৬
শিয়ালদহ বা শৃগাল দ্বীপ ২৮ (শিবাদহ)
শিশা গাঙ্গুলী ৭৬
শেরশাহ, সম্রাট ২, ১২, ৫১
শুকসাগর ২৭
শোভাবাজার ১৭৭, ১৭৮
শ্রীরঙ্গপত্তন ১৬০
শ্রীহট্ট ১৯

স্যাক, জে এ, মেজর ১২৬
সগর ১২৮
স্কট ১১৬
সতী ২৮, ১১৩
স্বত্বলিপি ১২০
সদর ৬৭
সপ্তগ্রাম ৩, ১৯
সমতট ২৮
সমুদ্র মন্থন ২৫
সরকার ৩, ১২
সরাফ কুয়াইনি ৩৭
সরিফাবাদ ৭১
সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি ১৬০
সাকচি (F. A. Sachse) ১০
সাগর দ্বীপ ১৩২

সাগর দ্বীপ আইন ১১৯
সাঁতগাও সরকার ৩, ২৬, ৭১
সাঁতগাও (সপ্তগ্রাম) ৮০, ৯৭
সাতাল ৬
সাদুকপুর ৯২
সাদিক খান ৯৭
সাবর্ণ চৌধুরী/মজুমদার ৭৬
সার্ভে বিল্ডিং ১১, ১৮১
সারম্যান জন স্যার ১৩৬
সারহাদ ১৩৬
সারহুদ ৮৪
সিকাটাকা ১২
সিকান্দার লোদি ৪২
সিকান্দার গজ ৪২, ৫৪
সিদ্ধেশ্বরী দেবী ১৬
সিপাহসালার ৬৬
সিমস্, এফ ডব্লু ১২৬
সিরাজদ্দৌলা, নবাব ৫, ২১
সিলেট ৭১
সিসিলি দ্বীপ ৯৪
স্মিথ্, আর ৮, ১০৬, ১১০, ১২৬, ১৩১
ষ্টিফেনসন, এডওয়ার্ড ১৩৬
সুজা শাহ ৪, ১৬
স্টুয়ার্ট ৮
সুতানুটি ১২৫
সুদর্শন চক্র ২৮
সুন্দরবন ১৬, ৭৫, ১১২
সুন্দরবন জরীপ ১১, ১১২
সুদ্ধ নন্দী ১১৩
সুমেরু প্রদেশ ৯৪
সুলেইমান আবাদ ৭১
সুলিভান ১০
সুবাবাজার ১৭৭
সূর্যনারায়ণ ২১
সেক্সপীয়ার ১১৭
সেরিস্তা ১৩
সেন্ট জন চার্চ ১৩৬
সেন্ট হেলেনা দ্বীপ ১৬১
সোনার গাঁ ৭১
সোনা পাড়া ৯১

হজ (লেফট্যান্ট) ১৩১
হরিনারায়ন মিত্র ১৬, ১৭
হলায়ুধ ২৯
হালিশহর ২৮
হাভেলিশের ৩
হার্মাদ ১১৪
হায়াগুড়/হাতিয়াগড়/ হাতিঘর ৪, ৬
হায়দার আলি ১৬০
হিউয়েন সাঙ্ ২৮
হিজলী ৮, ১৯, ৮২
হিথ্ ক্যাপ্টেন ৮৩
হিন্দু পুরাণ ২৫
হিন্তালী ১৭৫
হিমাংশু অধিকারী ১৪৮
হিল সাহেব ১৪৭
হুগলি ১৯, ২৬, ৭৮
হুগলি নদী ১১৩
হুমায়ুন, বাদশা ১২
হেগিয়াগঞ্জ খাল ৯১
হেস্কেল সাহেব ১১৫
হেস্কেলগঞ্জ ১১৫

হেমচন্দ্র কর ১১১
হেসাম মিঃ ১২৬
হেস্টিংস ষ্ট্রীট ৮৩
(ড্যানিয়েল) হ্যামিলটন কো-অপারেটিভ ১২০
হোগলকুঁড়িয়া ১৭৫

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
২০	২৫	সম্রাট আলিবর্দী	নবাব আলিবর্দী
৩১	১৩	১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ	১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ
৩১	১৩-১৪	মুহম্মদঘুরির পরাজয়ের পরে	মুহম্মদ ঘুরীর হস্তে পৃথ্বিরাজের পরাজয়ের পরে
১০০	২৭	সেখানেই তাকে	সেখানেই লোকে তাকে
১১২	৪	স্বাপদের	সরিসৃপদের
১৬০	১৫	শ্রীরঙ্গপত্তমে	শ্রীরঙ্গপত্তনে

Photographs of the original grant of Jaigir to Lord Clive.
লর্ড ক্লাইভকে প্রদত্ত জমিদারি-পরওয়ানা

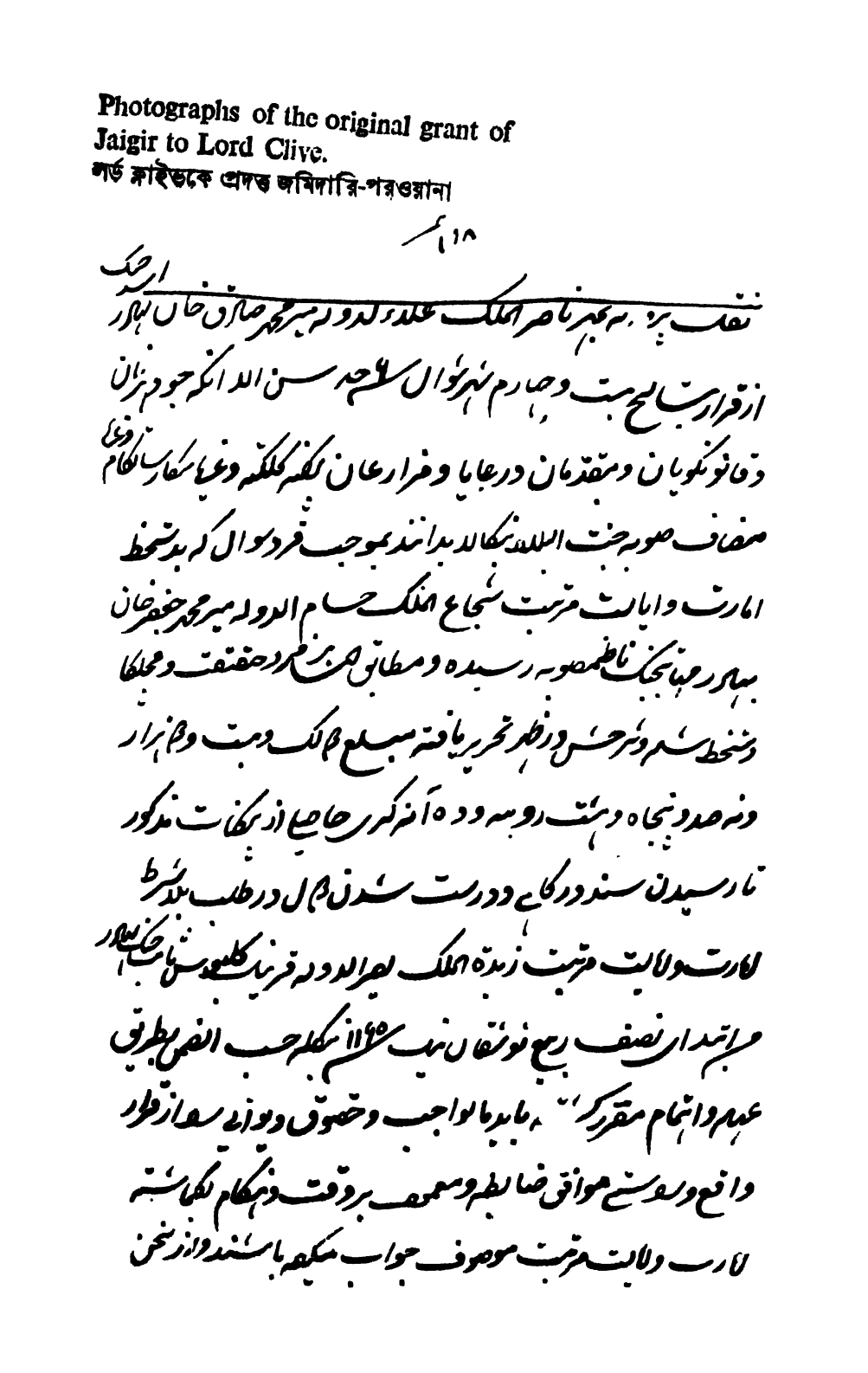

صلاح و صوابدید گماشته مرقوم بیرون نروند بسبب گماشته مذکور انکه

رعایا بسبب از حسن سلوک خود راضی و شاکر داشته در تکثیر زراعت و

افزونی محصول سعی فراوان بکار برند درین باب تاکید اکید دانسته حسب

المسطور بعمل ارند

متفرقه ضمیمه بموجب فرد تحقیق که بدستخط امارت و ایالت مرتبت شجاع الملک

حسام الدوله میر محمد جعفر خان بهادر مهابت جنگ ناظم صوبه رسیده و مطابق

ان بر فرد حقیقت و محلکار دستخط شده و از حسن درظهر تحریر یافته که کلکته

وغیره بکار سالکان وغیره مضاف صوبه جنت البلاد بنگاله از محال خالصه

برتبه واگذاشت جاگیر نظامت در وجه جاگیر بلا شرط امارت مرتبت

زبدة الملک نصرالدوله مهابت جنگ بهادر تا رسیدن سند درکاغذ

و درست شدن احداث مرام ابتدای نصف ربیع یوشقان ئیل ۱۱۶۵ بکل

بکنهار بکهید نصف ربیع مکمل بالطرفین و عمل و اهتمام مقرر گشته واگذاشت جاگیر

بموجب دستخط انکه از خالصه واگذاشت جاگیر

نظامت و جاگیر سند عهده بند امارت و ایالت مرتبت نصرالدوله

بموجب هر دو سوال انکه امارت ثابت جنگ بهادر و منصب

قرنب کلکوس

[illegible] مذکور

[illegible] و تمام والعه

شش [illegible] سوار [illegible] نمودند [illegible]

[illegible] با حقیقت [illegible] آمدن [illegible]

[illegible] از عهده [illegible] [illegible]

بعدم [illegible] [illegible] [illegible]

سر [illegible] حساب [illegible]

مبلغ [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

ده [illegible] [illegible]

فی الحال [illegible] [illegible]

ما [illegible] نصف ربع [illegible] پانزده [illegible]

و نصف [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

دار التحریر
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

صدر [illegible]
صدر اعظم
۱۲/۳/۱۰
[illegible] صاحب [illegible]

[illegible]
[illegible]
۱۰/۴/۱۰
[illegible]
نظامت

[illegible]
[illegible]
۱۱/۱۵/۱۰

[illegible]
[illegible]
۱۰/۱۲/۱۲

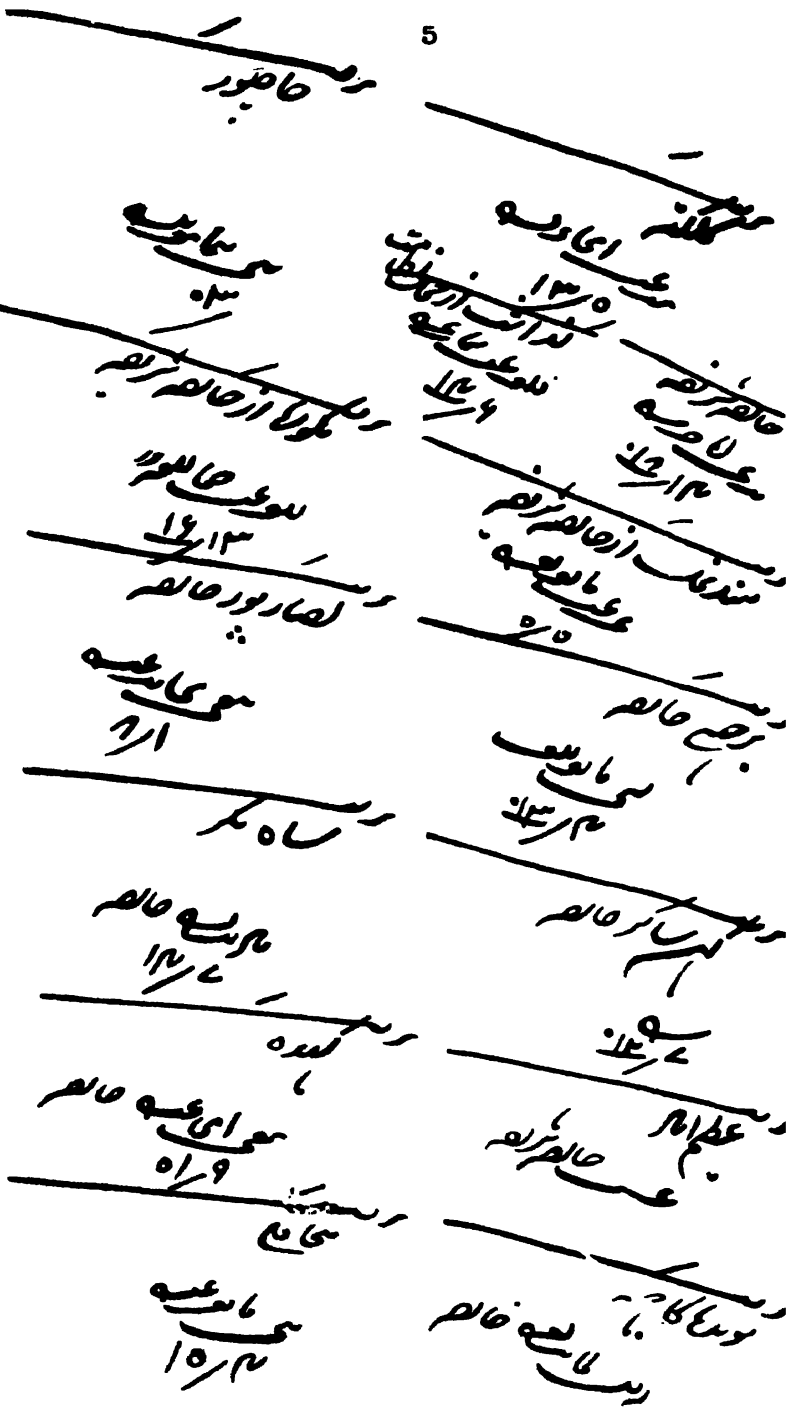

قریه ماهور

۱۰

قریه کهار حوران

۱۱۹

۳

قریه بابکان

۱۱

۱۵

قریه صوغ یک وموم

محمد ابن نور

۱۳

۰۵

کندار جار

۱۴

۱۴

قریه ساده نور

قریه اکبر نور

۰۳/۱۲

۰۱۵

محالات خالصه [illegible] و آلدانت رجابر

[illegible] وایالت مرتب

نظامت ودرطبق حد [illegible] ثابت حکم بهار تحویل گشته

وزیر الملک نصرالدوله ثابت [illegible] الماس والهور محیلکا و

وکیل لارت مرتب [illegible] حسب موافق

۱۱۶۵ بعلم

[illegible] ونبارت [illegible]

رسانیدن سند درکات ابتدای ربیع توسعان [illegible]

ضابطه نمود قرر سیر داف ابتدای [illegible] مرقش محیلکا و

سند تحویل بطرف عهده نماید و درباب مرقوم مقرر نمود

واصل سند عمل محالات مذکور [illegible]

[illegible] سرور

[illegible] دام

[illegible]

۱۲/۱۳ [illegible]

[illegible]

شرح دستخط اقدس
منظور در آمد تاریخ چهارم شوال ۶
شرح مچلکا از قرار تاریخ ... و ایالت و امارت فرزند
نسخه مجد انتساب ولیعهد امارت نایب جنگ بهادر چون مبلغ
زبدة الملک نصیر الدوله ... چهار هزار روپیه و یکدام کم
دو کرور و چهار لک و بیست و دو هزار
حاصل آن تعلقه از پنجاه ام لک ... وانه کمتر باشد
و نصف و پنجاه و بیست روپیه ... از کار سال الکام
بلاشرط از یک گیله کلکته و غیره ... و دو لال
در طلب ... خلیفه ... بموجب
و غیره ... صوبه ... فرزند شجاع الملک
به دستخط امارت و ایالت مرتبه جنگ ناظم صوبه
حسام الدوله میر محمد جعفر خان بهادر ... دستخط شده
رسید و مطابق آن برورد خفیف ... ۱۱۶۵ تحریر
منشی ... نصف ... از حضور پرنور و
تا حکم ... پروانه ... آن بعهده
درست شد

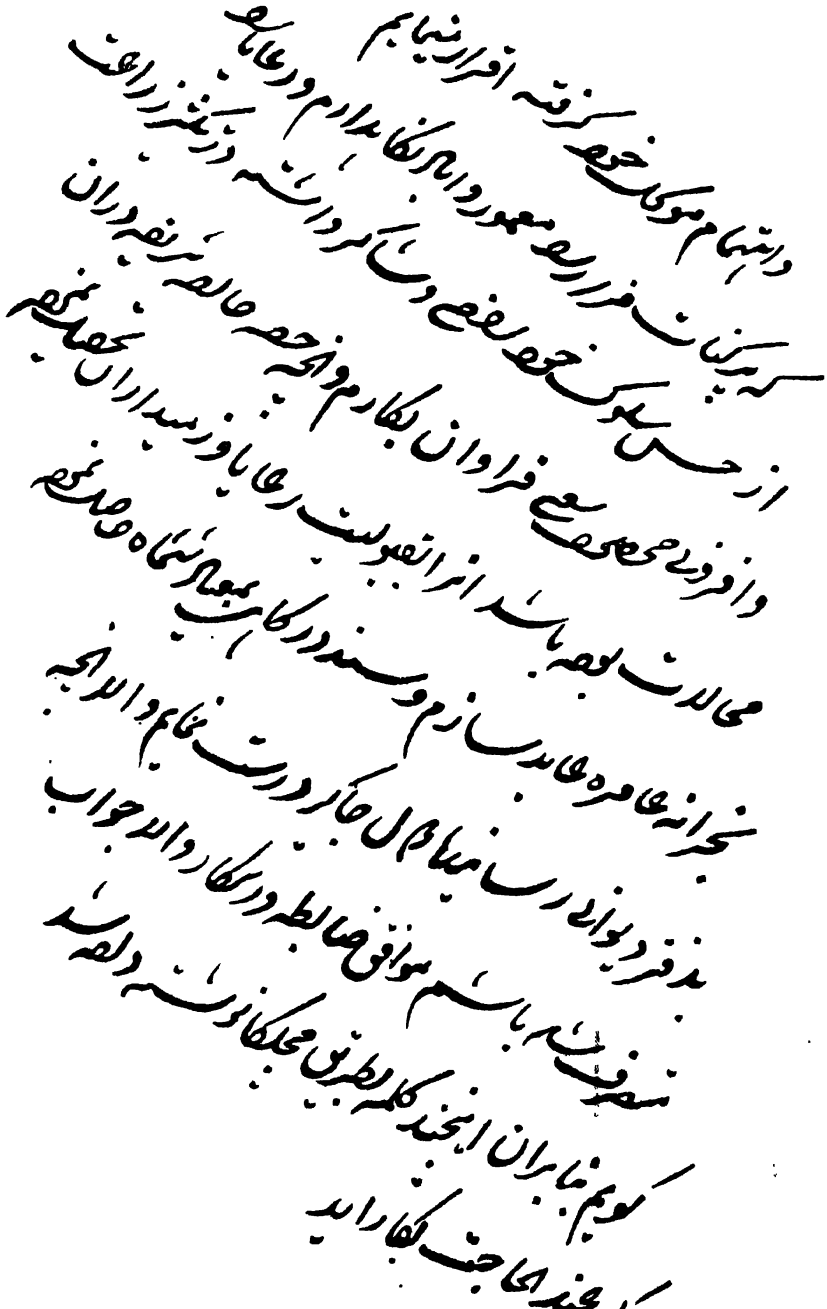

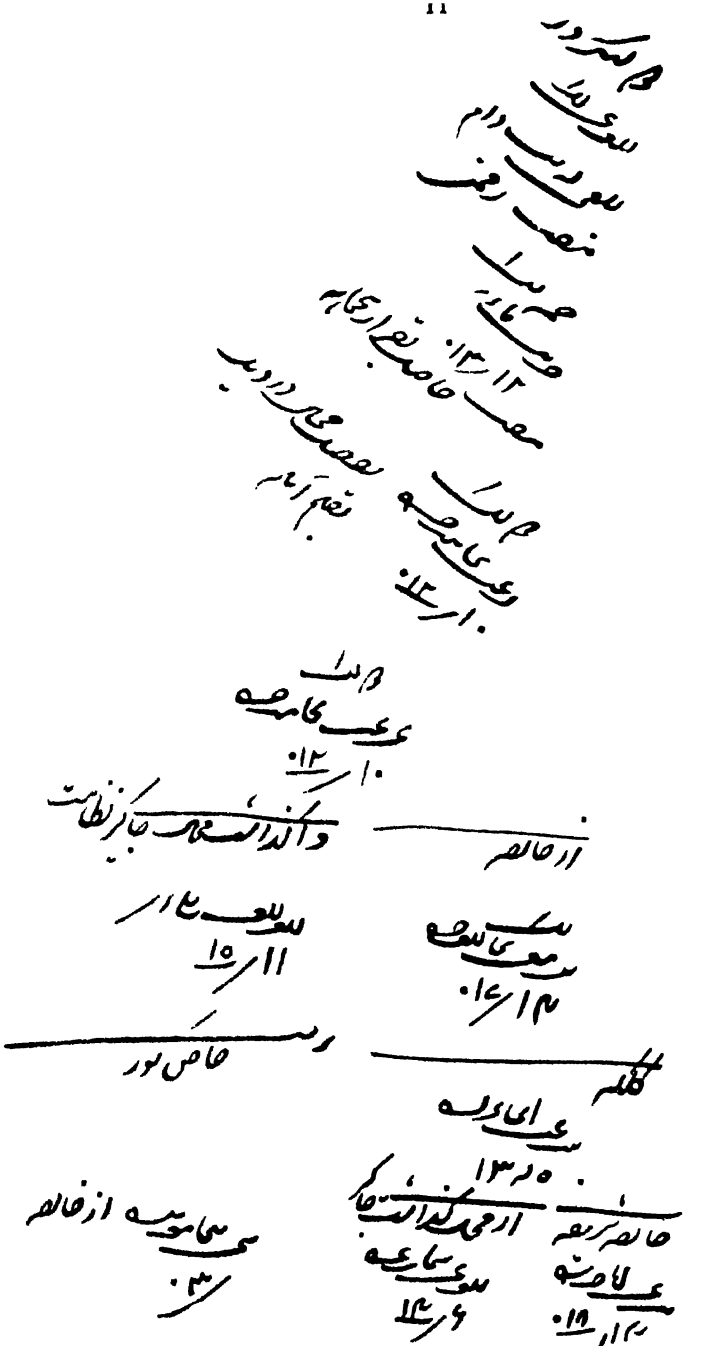

ده [illegible] مدیک
رعیت مالوجهه خالصه
۵ [illegible]

ده [illegible] ملوتا
[illegible] خالصه
۱۳ [illegible]

ده [illegible] رحیم [illegible]
سی مالوجهه خالصه
۱۳ [illegible]

ده [illegible] لصارلور
[illegible] مالوجهه خالصه
۸ [illegible]

ده [illegible] وکیل ساکر
[illegible]

ده [illegible] جمعی [illegible] وسوم
[illegible] خالصه
۱۳ [illegible]

ده [illegible] میاکده
رعیت مالوجهه زرعاکر
[illegible]

ده [illegible] میدا
[illegible] مالوجهه زرعاکر
۱۴ [illegible]

ده [illegible] عظیم آباد
[illegible] خالصه [illegible]

ده [illegible] شاه [illegible]
[illegible]
۱۴ [illegible]

ده [illegible] نوناکاجه
[illegible] مالوجهه خالصه
۱۰ [illegible]

ده [illegible] کهده
[illegible]
۱۵ [illegible]

ده [illegible] سی [illegible]
سی مالوجهه خالصه
۱۵ [illegible]

ده [illegible] رواب
[illegible] خالصه
۸ [illegible]

قسمت بابکان

قسمت ماهور

محمدامین پور

شاه پور

اکبرپور

قسمت ابواب فوجداری

امیراباد

قسمت بلبا...

۱۰

۱۱/۹

۱۵

۱۱/۱۲

۱۱/۱۴